আলোচনা-প্রসঙ্গে

তৃতীয় খণ্ড

সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস

আলোচনা-প্রসঙ্গে

(শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত কথোপকথন)

তৃতীয় খণ্ড

সঙ্কলয়িতা—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, এম-এ

প্রকাশক ঃ
শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাব্লিশিং হাউস্
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর (বিহার)

প্রথম প্রকাশ—১১০০
৪ঠা আশ্বিন—১৩৬৫
দ্বিতীয় প্রকাশ—২২০০
আষাঢ়—১৩৭৮
তৃতীয় সংস্করণ—২২০০
ভাদ্র—১৩৯১

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীকুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
সৎসঙ্গ প্রেস
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর (বিহার)

Alochana-Prasange
3rd Part, 3rd Edition
Compiled by Sri Prafulla Kumar Das, M. A.

নিবেদন

'আলোচনা-প্রসঙ্গে' তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হ'চ্ছে। এতে ১৯৪১ সালের ২৯শে ডিসেম্বর থেকে সুরু ক'রে ১৯৪২ সালের ২৬শে জুলাই পর্য্যন্ত এই কয়েক মাসের অন্তর্ব্বর্ত্তী কতকগুলি দিনের কথোপকথন লিপিবদ্ধ আছে। ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে কার্য্যব্যপদেশে বেশীর ভাগ সময় আমাকে বাংলার বিভিন্ন জিলায় ঘুরতে হয়, তখন থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ সঙ্গ-লাভের সুযোগ শীর্ণ হ'য়ে আসে। তাই দেখা যাবে, দীর্ঘ ৭।৮ মাস সময়ের মধ্যে মাত্র কয়েকটি দিনের আলোচনা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। আশ্রমে যে দিনগুলি থাকা পড়েছে, তখনও যে নিত্যদিনকার তাঁর অমিয়-মধুর আলোচনা চয়ন ক'রে রেখেছি, তা' নয়। যেদিন দেখেছি খুব জমাটি আলাপ-আলোচনা চলেছে, সেদিন খাতা-কলম নিয়ে বসেছি, নয়তো আলস্যবশে অনেকদিনের টুকরো-টুকরো আলোচনা বাদ দিয়ে গেছি।

এখন বুঝতে পারছি—তা' ঠিক হয়নি। কারণ, তাঁর প্রত্যেকটি কথা, আলাপ-ব্যবহার, চালচলন, ভাবভঙ্গীর মধ্যে রয়েছে অপরিসীম শিক্ষা ও আনন্দের উপাদান। সেগুলি ধ'রে না রাখা মানে নিজেরা বঞ্চিত হওয়া ও সমগ্র মনুষ্য-সমাজকে বঞ্চিত করা। আমি সেই অপরাধে অপরাধী।

যে-সময়কার আলোচনা এই খণ্ডে প্রকাশিত হ'চ্ছে, তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তীব্ররূপ ধারণ করেছে এবং বিশ্বপরিস্থিতি ও ভারতের পরিস্থিতি এক প্রলয়ংকর সংকট-আবর্ত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। তাই, তৎকালীন বিশেষ সমস্যাগুলির সমাধান সম্বন্ধেও শ্রীশ্রীঠাকুরের বাস্তব কর্ম্মপদ্ধতির ইঙ্গিত পুস্তকখানির নানাস্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে আছে। ঐ সব সাময়িক সমস্যার নিরাকরণকল্পে তিনি যে কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ করেছেন, তা'র মধ্যে সার্ব্বজনীন শাশ্বত সংগঠনের অমর বীজ সংহত হ'য়ে আছে। তাই, দেশে-বিদেশে সমাজ, রাষ্ট্র, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিক্ষেত্রে সংগঠন-কর্ম্মী যা'রা, তাদের এই পুস্তক বিশেষ মনোযোগ-সহকারে পাঠ করা প্রয়োজন।

তাঁর দিব্য-লীলা-লসিত দ্যুতিদীপ্ত, ভাস্বর জীবন এই পাপহত পৃথিবীর বুকে অতন্দ্র তপস্যায় তিলে-তিলে এক নবীন স্বর্গ রচনা ক'রে চলেছে। এই মহৎ সৃজনের দৈনন্দিন ধারা-বিবরণী দেব, তেমন সাধ্য আমার নেই। তবে বড় ভাল লাগে তাঁর রস-সরস, প্রেম-প্রাণ, স্বতঃউৎসারিত সহজ কর্ম্মলীলা। এ একটা উপভোগের বস্তু বটে! এ দেখে উপভোগ, শুনে উপভোগ, ক'রে উপভোগ, ব'লে উপভোগ, লিখে উপভোগ। তাই, আনন্দ ও আত্মপ্রস্তুতির গরজেই লিখি। লিখে কি এর কূল পাওয়া যায়, না লেখার ক্ষমতাই আমার আছে? তবু ফাঁকতালে অমৃত-সমুদ্রে যতটুকু অবগাহন ক'রে থাকা যায়, সেইটুকুই তো লাভ। আর, এ লাভের অংকে সকলেরই হিস্যে আছে। তাই, ত্রুটি-বিচ্যুতির হিসাব না ক'রে

অমৃতের সঞ্চয় অমৃত-পিপাসু নর-নারীর মধ্যে বণ্টন ক'রে দেওয়া হ'চ্ছে।

কথা তাঁর কথা নয়, এ হ'লো তাঁর অনুরাগ-উচ্ছল কর্ম্মিষ্ঠজীবনের অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা-ও-অনুভূতি-সমন্বিত অমোঘ বাণীমন্ত্র, যা' সত্তার গভীরে জাগিয়ে তোলে এক নূতন চেতনা, নূতন প্রেরণা, নূতন এষণা ; সংঘটিত ক'রে তোলে মানুষের জীবনে এক নব রূপান্তর। তাই, তাঁর সাত্বতবার্ত্তা যা'তে ঘরে-ঘরে ছড়িয়ে পড়ে, তা'র ব্যবস্থা করা কল্যাণকামী প্রতিটি নর-নারীর অবশ্যকর্ত্তব্য।

পুস্তকের মধ্যে ভ্রমপ্রমাদ যদি কিছু থাকে এবং পাঠকবর্গ দয়া ক'রে সেগুলি যদি আমাদের গোচরে এনে দেন, আমরা পরবর্ত্তী সংস্করণে সেগুলি সংশোধন ক'রে দিতে পারব। এ ব্যাপারে পাঠকবর্গে'র সহযোগিতা কামনা করি।

সৎসঙ্গ (দেওঘর)
৩রা ভাদ্র, ১৩৬৫ (ইং ১৯।৮।৫৮) **শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস**, এম-এ

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'আলোচনা-প্রসঙ্গে' তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'চ্ছে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় বইখানি আমাদের দেখে দেওয়ার সুযোগ না হওয়ায় প্রথম সংস্করণের মুদ্রণপ্রমাদের সঙ্গে দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রণপ্রমাদ মিলিত হয়ে ভুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এবার যাবতীয় ভুল ও অসঙ্গতি সংশোধন করে দেওয়া হ'লো। তবু এ কথা হলপ ক'রে বলা চলে না যে এই সংস্করণের মুদ্রণকালে আমাদের অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন ভ্রম অনুপ্রবেশ করেনি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে এই পুস্তকে প্রকাশিত বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গে'র নামের পার্শ্বে তাঁদের উপাধি বা উপনাম সংযোজন ক'রে দেওয়া হয়েছে। আমার লিখতে কষ্ট হয়। তাই এই ব্যাপারে শ্রীমতী চন্দ্রিমা চক্রবর্ত্তী ও শ্রীহেমসুন্দর সান্যাল আমাকে সাধ্যমতো সাহায্য করেছেন।

শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পুস্তকের বর্ণানুক্রমিক বিষয়-সূচী প্রণয়ন করে দিয়েছেন। শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র পাল ও শ্রীকুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের কর্ম্মতৎপরতায় পুস্তকের প্রকাশন ত্বরান্বিত হ'লো। পরম দয়াল সবার মঙ্গল করুন।

যাঁর সর্ব্বাত্মক পরিচালনায় সমগ্র কাজটি নিটোলভাবে নিষ্পন্ন হ'লো সেই পরমপূজ্যপাদ বড়দার শ্রীচরণে জানাই আমার কৃতজ্ঞ প্রণতি।

নিখিলনাথের শ্রীমুখনিঃসৃত এই শাশ্বত সুধানির্ঝরে অবগাহন ক'রে মানবসমাজ অমৃতায়িত হোক—তৎসকাশে এই-ই আমাদের আকুল প্রার্থনা।—বন্দে পুরুষোত্তমম্।

বিবেক-বিতান
সৎসঙ্গ, দেওঘর **শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস**
১লা ভাদ্র, ১৩৯১

বর্ণানুক্রমিক বিষয় সূচী

আলোচনা-প্রসঙ্গে

১৪ই পৌষ, সোমবার, ১৩৪৮ (ইং ২৯।১২।৪১)

পঞ্চদশ ঋত্বিক্-অধিবেশন, তাই বাইরে থেকে অনেকে আসছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মায়ের মতো উৎকণ্ঠা নিয়ে ভক্তগণের আগমন-প্রতীক্ষায় আছেন। প্রত্যেকটি মানুষই যেন তাঁর কাছে সাত রাজার ধন এক মাণিক। দেখামাত্র কত খুশি! শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে তাসুতে ব'সে আছেন। কাশীপুরের ওদিক থেকে বাস আসছে, বাসের যাত্রীদের 'বন্দে পুরুষোত্তমম্' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত। শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দ-সহকারে ব'লে উঠলেন, 'ঐ আসছে'। তিনি অধীর হ'য়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন—কা'রা এসেছে দেখবার জন্য। ভূষণদাকে বললেন—'তুই এখন ঐ দিকে যা, লোকজন সঙ্গে ক'রে নিয়ে ওদের মালপত্র নামায়ে গেষ্ট-হাউসে জায়গা-টায়গা ঠিক ক'রে দেগা যেয়ে।' ভূষণদা (চক্রবর্ত্তী) গেলেন। কিছু সময় বাদে একসঙ্গে অনেকে এলেন, তাঁদের অনেকের হাতে ফলমূল, তরিতরকারী, মিষ্টি, নতুন চাল, নতুন গুড় ইত্যাদি। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রীতিঘন মোহনমূর্ত্তি দেখে সকলের মন আনন্দে পরিপূর্ণ। সবাই প্রণাম করবার জন্য ব্যস্ত। তাঁর স্নেহ-কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো—'কি রে! আইছিস্?' 'অমুক কোথায়?' 'সে কখন আসবি?' 'আপনিও আইছেন? বেশ! বেশ!' প্রত্যেকে তা'র আনীত জিনিসপত্র দেখাচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে বলছেন—'যা! বাড়ীর ভিতর দিয়ে আয় গিয়ে।' বিভিন্ন এলাকার লোক এসেছেন, শ্রীশ্রীঠাকুর এক-একজনের কাছে সেই-সেই স্থানের অন্যান্যদের খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। যশোহরের সুরেনদার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সুবোধ আর কালিদাস ক'নে? তা'রা আসেনি?' সুরেনদা বললেন—'হ্যাঁ, তাঁ'রা এসেছেন; সুবোধদা কেষ্টদার বাড়ীতে, কালিদাসদা বঙ্কিমদার বাড়ীতে, একটু পরেই আসবেন।' এইভাবে বরিশাল, খুলনা, ফরিদপুর, ২৪ পরগণা, কলকাতা, নদীয়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের দাদাদের কাছ থেকে খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। দাদারা যেমন এসেছেন, তেমনি মায়েরাও এসেছেন শিশুসন্তানসহ। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রীতিভরে সবার দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন। তাঁ'র দৃষ্টি করুণায় ভরা, মুখখানি প্রস্ফুটিত শতদলের মতো অনির্ব্বচনীয় লাবণ্যে উদ্ভাসিত। তিনি বাঁধের ধারে তাসুতে তক্তপোষের উপর পাতা শুভ্র শয্যায়, শুভ্রবেশ প'রে বসেছেন। পরণে শান্তিপুরী

কালপেড়ে ধুতি, গায় আদ্দির হাফ পাঞ্জাবী ও আদ্দির চাদর। তক্তপোষটি বেশ বড়, তার উপর ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার শুভ্র শয্যা। তক্তপোষ-জোড়া বিরাট উঁচু সাদা নেটের মশারি ফ্রেমের সঙ্গে টানান, এখন পাশগুলি গুটিয়ে উপরে তুলে রাখা হয়েছে। তাসুর মধ্যে বাহুল্য কিছু নেই। পূবদিকে আছে একটি ঘড়ি, একখানি ক্যালেণ্ডার আছে ঘরে। শ্রীশ্রীঠাকুরের চশমা ও দু'-একখানি বই আছে বিছানার পাশে। নীচেয় গড়গড়া, তামাক, টিকে, সুপারীর কৌটা, জলের ঘটি, পিকদানি, দাঁতখোঁটা, শ্রীশ্রীঠাকুরের কালো চটিজুতো, ইত্যাদি। তাসুটি সম্পূর্ণ টিনের—উপরে ও চারপাশে সর্ব্বত্রই টিন, ভিতটি সানের, ভিত তেমন উঁচু নয়। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বড়-বড় দরজা আছে, আর পূব ও পশ্চিম দিকে আছে জানালা। চতুর্দ্দিকে খোলা, দক্ষিণ দিকে শিশিরস্নাত বিরাট পদ্মার চর, বাঁধের ধারে পূবদিক-বরাবর একখানি কাঠের ঘর, একটু ফাঁকে নিভৃতনিবাস, তার ওদিকে একটা টিনের ছাপরা। উত্তর দিকে সৎসঙ্গ প্রাঙ্গণ, এই প্রাঙ্গণের মধ্যে কয়েকটি বকুল গাছ, তার পূব দিকে হুজুর-মহারাজের মন্দির, তার পাশে সোনালগাছ ও নিমগাছ। মন্দিরের উত্তর দিক্ জুড়ে শ্রীশ্রীবড়মার ঘর, তার সামনের দিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের পিতৃদেবের কুটির, তার উত্তর-পশ্চিম দিকে বিরাট দ্বিতল অট্টালিকা মাতৃমন্দির, পিতৃদেবের কুটিরের সোজাসুজি পশ্চিম দিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের মাতৃদেবীর কুটির, তার একটু এদিকে কাজল ভাইয়ের খড়ের ঘর, তার পাশে কলতলা, কলতলার পাশে সুশীলদার ঘর। লোকসমাগম সত্ত্বেও আশ্রম-প্রাঙ্গণ বেশ নিরিবিলি, কেবল মাঝে-মাঝে এদিক্-ওদিক্ থেকে 'জয়গুরু' ও প্রীতি-সম্ভাষণাদি শোনা যাচ্ছে। পাখীর কাকলি, উঠান ঝাড় দেওয়ার শব্দ ও কল থেকে জল তোলার শব্দ ছাড়া অন্য কোন হৈ-হল্লা নেই। কেষ্টদার বাড়ীর ওদিক্ থেকে একটা ভাল ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। সেই সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের তাম্রকূট সেবনের মধুর গন্ধ মিলিত হ'য়ে একটা আমেজ সৃষ্টি করেছে। একটু একটু ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে উত্তর দিক্ থেকে, অবশ্য তা' খুব কন্‌কনে নয়। এখন কেবল সূর্য্য উঠছে, রোদ এসে পড়েছে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিছানায়, গায়ের উপরে। তাঁর সোনার অঙ্গে সোনালী আলো এসে মিশেছে, বড়ই মনোরম লাগছে তাঁকে। কেবলই দেখতে ইচ্ছে করছে। তাঁকে দেখলেই ভাল লাগে, যত দেখা যায়, তত দেখতে ইচ্ছে করে। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে মানুষের যতটা ভাল না লাগে, তার চাইতে বেশী ভাল লাগে তাঁকে দেখে। তিনি যে আমাদের সব চাইতে আপন, নিজের থেকেও আপন, তা' তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালে বিশেষ ক'রে বোঝা যায়। তাঁর চোখ, মুখ, নাক, কান, চেহারা তারস্বরে ঘোষণা করে—তিনি আমদের যা'-কিছুর আধার, যা'-কিছুর আশ্রয়, আমাদের অন্তর-পুরুষের ব্যক্ত-প্রতীক তিনিই। তাই, তাঁর সঙ্গে মিলন-মুহূর্ত্ত মানুষের পরম সুখলগ্ন, শুভলগ্ন। এই শুভ সংযোগের জন্য মানুষ যুগ-যুগ জন্ম-জন্মান্তর

তপস্যা করে। নানা দিক-দেশ হ'তে আগত অগণিত লোকের এখন সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। সবাই প্রাণ ভ'রে দেখছেন তাঁকে বাইরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে।

তোর মাথা কামানো কেন রে?—২৪ পরগণার একটি ছিপছিপে শ্যামবর্ণ ১৫।১৬ বৎসর বয়স্ক ছেলেকে লক্ষ্য ক'রে হঠাৎ ব'লে উঠলেন ঠাকুর।

আমার বাবা মারা গেছেন।

কী হইছিল রে?

জ্বর, কাশি আরো অন্যান্য উপসর্গ ছিল।

তা'তেই মারা গেল? ভাল ক'রে চিকিৎসা করাসনি?

হ্যাঁ। চিকিৎসা সাধ্যমতো করা হয়েছিল, কিন্তু বাঁচান গেল না। তবে বাবার মৃত্যুসময়ের দৃশ্য অভাবনীয়।

কি রকম?

আপনার অজানা তো কিছুই নয়। আপনিই তো গিয়েছিলেন তখন।

কয় কী রে ডাকাত?

হ্যাঁ। বাবা সকালেই আমাকে ডেকে বললেন—দ্যাখ্ খোকা! আমার ডাক এসে গেছে, আজই আমাকে যেতে হবে। আমার যাবার সময় তোরা কান্নাকাটি না ক'রে আমার কাছে ভাল ক'রে নাম করিস্। যাবার বেলায় নাম শুনতে-শুনতে যেন যেতে পারি, আর ঠাকুরের ফটোটা আমার চোখের সামনে রাখিস্—দয়ালকে দেখতে-দেখতে চ'লে যাব দয়ালের কাছে। তোকে আমি বিষয়-আশয় কিছুই দিয়ে যেতে পারলাম না, কিন্তু তোকে আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন দিয়ে যাচ্ছি—আর তা' হ'চ্ছে আমার ঠাকুর। ঠাকুরকে ভুলবি না, যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি ঠিকমতো করবি, দেখবি জীবনে এর চাইতে বড় সম্পদ্ আর কিছু নেই। এই বলার পর বাবার অবস্থা ক্রমশঃ নিস্তব্ধ হ'তে লাগলো। বাবা যা' বলেছেন, সে-সব কথা মাকে না ব'লে আমি কাছাকাছির আরো দু'-একজন সৎসঙ্গীকে নিয়ে বাবার বিছানায় ব'সে উচ্চৈঃস্বরে নাম করতে লাগলাম, আর আপনার ফটোটা বাবা দেখতে পান এমন জায়গায় রেখে দিলাম। বাবা দুই-একবার চোখ মেলে ফটোর দিক্ চেয়ে দেখছিলেন। আর মনে হ'লো, ভিতরে-ভিতরে নাম করার চেষ্টা করছিলেন। পরে শ্বাসকষ্ট সুরু হ'লো, তবু মাঝে-মাঝে অতিকষ্টে ফটো দেখছেন। আমরা নাম করছি। আমার তখন ভিতর থেকে কান্না ঠেলে আসছে, কিন্তু বাবার কথা স্মরণ ক'রে কাঁদতে পারছি না, নাম করছি। (ছেলেটির চোখ অশ্রুসিক্ত ও কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হ'য়ে উঠলো।) মা এমন সময় এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন, আমি মাকেও নাম করতে বললাম। মা একটু সময় পরে নিজেকে সামলে নিয়ে আমাদের সঙ্গে নাম করতে লাগলেন। বাবা তখন বলছেন—'ঐ দ্যাখ্, সোনার রথে ক'রে ঠাকুর আমায় নিতে এসেছেন। দ্যাখ্! ঠাকুরের আমার কী অপরূপ রূপ!' রোগ-যন্ত্রণার কোন চিহ্ন নেই মুখে। সত্যিই যেন তিনি আপনাকে

দেখছেন। মুখখানি হাসি-হাসি। তিনবার দয়াল-দয়াল ব'লে হাত জোড় ক'রে নমস্কার করলেন, তারপর তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। তখন বেলা এগারটা আন্দাজ হবে।............বাবার কথা মনে প'ড়ে যখনই মন খারাপ হয় তখনই ভাবি, তাঁকে দেখতে পাই না-পাই তিনি আপনার কাছেই শান্তিতে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর বাবা ছিল পুণ্যাত্মা, তাই অমনতর মৃত্যু হয়েছে। সত্যিকার ইষ্টপ্রাণ যে, মরণকালেও তার ইষ্টের স্মরণ-মনন অব্যাহত থাকে। তবু মৃত্যু মানুষের পক্ষে বড় বেদনাদায়ক। মৃত্যুর মধ্য-দিয়ে মানুষকে চিরতরে হারাতে হয়। তার অস্তিত্ব থাকলেও তার সঙ্গে আমাদের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না। এইটেই বড় মর্ম্মান্তিক। তাই মানুষ অমৃত-অমৃত ক'রে পাগল হয়। মৃত্যুকে কেমন ক'রে নিকেশ ক'রে সে অমর হবে, তাই তার কল্পনা। মৃত্যুর কাছে বরাবর মার খেয়েও সে পরাজয় স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। মরছে, তবু বলছে 'অমৃত' 'অমৃত'। মানুষের জীবন এমনই চীজ যে তাকে অমৃতকে পেতেই হবে। ও না-পাওয়া পর্য্যন্ত সে ক্ষান্ত হবে না। তাই, স্মৃতিবাহী চেতনা যদি আমরা লাভ করতে পারি, তবে মরণকে অনেকখানি অতিক্রম করা হ'লো বলা চলতে পারে।

এর মধ্যে আরো অনেকে এসে প্রণাম করলেন। কেউ-কেউ আবার অন্যদিকে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—চল্! ঐ দিকে যাই।—এই ব'লে মাতৃ-মন্দিরের উত্তর দিকে বাবলা-তলায় এসে একখানি বেঞ্চে রোদপিঠ ক'রে বসলেন। সঙ্গে-সঙ্গে সবাই পিছনে-পিছনে আসলেন। তাঁর সঙ্গে একত্র চলার বিরাট আনন্দ আছে, সেই আনন্দ সবার চোখে-মুখে। শ্রীশ্রীঠাকুর এসে বসার পর সবাই তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালেন। সামনে খানিকটা জায়গা ফাঁক রেখে অনেকে বসলেন। সবাই আগ্রহ-উন্মুখ—শ্রীশ্রীঠাকুর কী বলেন—শুনবেন, কী করেন—দেখবেন।

রমেশ (দাস, পূর্ব্বোক্ত ভাইটি) এইবার জিজ্ঞাসা করলেন—আমি এখন কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই পড়িস না?

রমেশ—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবে পড়াশুনো করবি। সংসার চলার মতো মোটামুটি সংস্থান আছে তো?

রমেশ—বছরের খানটা হয়, অতি কষ্টে চলতে পারে, আরো কিছু সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোদের ঐ দিকে আরো সৎসঙ্গী আছে না? তা'রা আসেনি?

রমেশ—আছে, তাদের মধ্যে কয়েকজন এসেছে। তা'রা এখন গেস্ট-হাউসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফাঁকমতো তাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে আমার কাছে একবার আসিস,

আমি তোর মোকাবিলায় তাদের ক'য়ে দেবোনে। আর, তোর ক্ষমতায় যতখানি কুলোয়, তাদেরও দেখবি কিন্তু। মানুষের কাছ থেকে শুধু যদি নিস আর তাদের জন্য কিছু যদি না করিস, তাহ'লে তারা বেশীদিন তোকে টানতে চাইবে না।

রমেশ—আমার আর করার মতো সামর্থ্য কী আছে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঢের আছে। সব সময় তাদের খোঁজখবর নিবি। শাকটা, পাতাটা, মুলোটা, কচুটা, যা' পারিস হাতে ক'রে তাই দিবি। তাদের সুখ্যাতি করবি। তারা আনন্দ পায় এমনতর ব্যবহার করবি। পারলে তাদের বাড়ীর ছোট ছেলেপেলেদের একটু-একটু পড়িয়ে দিবি। ইচ্ছা থাকলে কত রকম করা যায়। আর যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি কখনও ছাড়বি না। তোর বাবা একেবারে মোক্ষম কথা ব'লে গেছে। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি যে নিয়মিত করে তার চেহারার মধ্যে একটা দ্যুতি দেখা যায়। সে-দ্যুতি ব'লে দেয় যে, সে পরমপিতার আওতায় আছে, তাই, শয়তান বা গ্রহ তাকে বড় একটা ঘায়েল করতে পারে না।

বিপিনদা (সেন)—ঠাকুর! যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি করে এমন লোককেও তো দুর্ভোগ কম ভুগতে দেখি না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুর্ভোগ সকলের জীবনেই আসে, কিন্তু তখন যদি বুদ্ধিভ্রংশ হয়, তাহ'লে আরো সর্ব্বনাশ। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি যে করে, তার মগজটা অনেকখানি ঠিক থাকে। তাই, বিপদ-আপদ আরো ঘোরালো হ'য়ে উঠতে পারে না। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি করা, ইষ্টীচলনে চলা মানে, দুর্ভোগকে অতিক্রম করার পথে চলা। দুর্ভোগ মানুষের জীবনে আসবে না, সে কি হয়? তার অতীত কর্ম্মফল আছে, অজ্ঞতা আছে, প্রবৃত্তি-চলন আছে, পরিবেশের সঙ্গে যোগসূত্র আছে—এই সব নানান ছিদ্রের মধ্য-দিয়ে দুঃখ চুইয়ে আসে। দুঃখ চুইয়ে আসার ছিদ্রগুলি বন্ধ করার জন্যই যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি। ইহকালের-পরকালের, আপনার-পরের, এককথায় সবার সব-কালের মঙ্গলের জন্য পালনীয় এই যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি। এই ত্রয়ীর একটাকেও যদি ক্ষুণ্ণ করেন, তাহ'লে ততটুকু সাম্য-হারা হ'য়ে পড়বেন।

বিপিনদা—আমরা যদি যজন ও ইষ্টভৃতি ভাল ক'রে করি, আর যাজন নিয়মিত করি, তাহ'লে কি দোষ হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাজন না করলে ইষ্ট-উপভোগই স্থবির হ'য়ে ওঠে। যজন যাজনকে সাহায্য করে, যাজন যজনকে সাহায্য করে। একটার অভাবে আর একটা খাটো পড়ে। আর, যাজনের ভিতর-দিয়ে পরিবেশকে যদি ধর্ম্মমুখী ক'রে না তোল, তোমার ধর্ম্মও টিকবে না। পরিবেশ আমাদের জীবনের একটা প্রধান অঙ্গ। এই পরিবেশ সম্বন্ধে আমরা যে-দিন থেকে উদাসীন হয়েছি, সেই দিন থেকেই আমরা অনেকখানি ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়েছি। তাই, আমরা আজ মনে করি, ব্যক্তিগতভাবে জপধ্যান করলেই ধর্ম্ম করা হ'লো, তার সঙ্গে সমাজ, রাষ্ট্র বা

বিশ্বের সঙ্গে আবার সম্পর্ক কী? কিন্তু সর্ব্বতোভাবে বাঁচাবাড়াই যদি ধর্ম্ম হয়, তবে সে-ধর্ম্ম পরিবেশকে বাদ দিয়ে কিছুতেই হবে না। আর, ধর্ম্মের সঙ্গে মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন জীবনবৃদ্ধির যদি কোন সম্পর্ক না থাকে, তবে সে-ধর্ম্মের সঙ্গে মানুষের কোন সম্পর্ক নেই।

কলকাতা থেকে জগৎদা (চক্রবর্ত্তী) বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় একখানা বই নিয়ে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বইখানি দেখেই খুশি হ'য়ে বললেন—দে তো দেখি!

রেণুমা (রায়) গিয়ে চশমাটা নিয়ে আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর চশমা প'রে বইটির পাতা উল্টে-উল্টে দেখতে লাগলেন। পরে কেষ্টদার কাছে দিয়ে আসতে বললেন। বললেন—কেষ্টদাকে বলবি প'ড়ে আমার কাছে যেন গল্প করে। অবশ্য এখন নয়—conference (অধিবেশন)-এর পর।

সুবোধদা (সেন) ও কালিদাসদা (মজুমদার)-কে দেখে উল্লসিত হ'য়ে বললেন—আইছিস্? তোদের কথা ভাবতিছিলাম। যা! কেষ্টদার কাছে শোন গিয়ে, অনেক কাজের কথা আছে। কেষ্টদা যা' বুদ্ধি করিছে, ঐভাবে যদি করা যায়, খুব ভাল হবে মনে হয়। তোমাদের কিছু-কিছু কর্ম্মী অন্য জেলার জন্য দেওয়া লাগবিনি। কেষ্টদার ইচ্ছা, এবার বাংলার সব জেলায় কর্ম্মী পাঠায়।

সুবোধদা—আমাদেরই তো আরো কর্ম্মী দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—বেশ কইছ। তোমরা মুরুব্বি যারা আছ তারা যদি যোগান না দেও, তাহ'লে হবে কী ক'রে?......যা'! কেষ্টদার কাছে শোন গিয়ে, তারপর যুক্তিবুদ্ধি ক'রে যা' ভাল হয় করিস।

সুবোধদা—বাংলার সব জেলায় কর্ম্মী পাঠান হবে এ তো খুব আনন্দের কথা। বিশেষ ক'রে এটা যখন আপনার অভিপ্রেত, যেমন ক'রে হোক করতেই হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমাদের যে-সব জেলা থেকে কর্ম্মী কিছু-কিছু ছাড়বে, সেখানে আবার লক্ষ্য রাখতে হবে, তারা আসার দরুণ কাজ যেন hampered (ব্যাহত) না হয়। স্থানীয় wholetime worker (পূর্ণকালীন কর্ম্মী) বাড়িয়েই হোক বা নিজেরা বেশী ক'রে খেটেই হোক, সেটা make up (পরিপূরণ) করা লাগবে। কালিদাস তো লা'ঠেল আছে মন্দ না, ও এই কামে লা'গে গেলি হয়। ওদিকে আছে জাতকাঠ—বামুনের ছাওয়াল, দেখতি গোসাঁই ঠাকুরের মতো লাগে, গোঁফে তাও দিয়ে যেয়ে একজায়গায় দাঁড়ালি মানুষ কর্ত্তা-কর্ত্তা ব'লে পা'র ধুলি না নিয়ে পারবে না। (তাঁর চোখ, মুখ, কণ্ঠস্বর ও হাতনাড়ার ভঙ্গীতে কথাগুলি জীয়ন্ত ছবি নিয়ে ফুটে উঠলো।)

উপস্থিত সকলেই বেশ পুলকিত হ'লেন। অনেকের মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

সুবোধদা (সহাস্যে)—ও তো একরকম wholetime (পূর্ণকালিক)

হ'য়েই আছে। আর, আপনি যা' বলেছেন—সত্যিই ওর আশপাশের বহু গ্রামের লোক, বিশেষতঃ পারশব মোড়লরা ওকে সোনা-কর্ত্তা ব'লে বিশেষ সম্মান করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—মাল জোটাইছ ভাল। এখন ভাল ক'রে রপ্ত ক'রে নেও।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার ওখান থেকে উঠে অতিথিশালার দিকে বেড়াতে বেরুলেন। পেছনে চলেছে শত-শত লোক। দয়াল আনন্দ-মসগুল হ'য়ে গল্প করতে-করতে এগিয়ে চলেছেন। সবারই দৃষ্টি তাঁর দিকে নিবদ্ধ।

যেতে-যেতে রবীনদা (দত্ত) নামক একটি দাদা বলছেন—ঠাকুর! অনেকদিন থেকে ভাবছি, বিড়ি খাওয়াটা ছেড়ে দেব, আগের থেকে কিছু কমিয়েছি, কিন্তু একেবারে ছাড়তে পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছাড়বি তো ঝম্ ক'রে ছেড়ে দিবি। ওইরকম কুঁথে-কুঁথে ছাড়া হয় নাকি? কি জানি একটা ছড়া আছে তো?

একটি দাদা—"একটু ক'রে ধীর চলনে
হয় না অভ্যাস এস্তামাল,
অমনতর চললে বাড়েই
ব্যর্থ বেফাঁস কুজঞ্জাল।
যা' করবি তুই বুঝলি মনে
এক ঝাঁকিতে কর্ তাহা,
সমানে চল্ সেই চলনে
এমন চলাই ঠিক রাহা।"

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। ওইভাবেই করতে হয়। কাটি তো এককোপে। রামকৃষ্ণ-কথামৃতে একটা সুন্দর গল্প আছে ব'লে শুনেছি। একজনের স্ত্রী তার স্বামীকে বলছে—অমুক খুব বৈরাগ্যবান্, সন্ন্যাসী হ'বে ব'লে দিনক্ষণ দেখেছে, গেরুয়া ছুপিয়ে রেখেছে। তাই শুনে পুরুষটা বললো—ও কখনো সন্ন্যাসী হ'তে পারবে না, ওইভাবে গৃহত্যাগ করা যায় না। স্ত্রী বললো—তবে কিভাবে? পুরুষটা তখনই গামছা কাঁধে বেরিয়ে পড়লো, আর ফিরলো না।

রোদ লাগছে মনে ক'রে একজন শ্রীশ্রীঠাকুরের মাথায় ছাতা ধরলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—রোদই ভাল লাগছে, আর যদি ধরিসই তবে এমন ক'রে ধর্ যা'তে মাথায় রোদ না লাগে, অথচ গায় রোদ লাগে।

দাদাটি সেইভাবে ছাতা ধরলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর রহস্য ক'রে বললেন-ভাগ্যিস্ তুই আমার কথাটা বুঝলি। কারও-কারও সেবার আগ্রহ এতটা উৎকট থাকে যে, আমার অসুবিধার কথাটা আর বোঝে না। শীতের দিনে হয়তো হাওয়া করতে সুরু ক'রে দিল, বারণ করলে আরো জোরে-জোরে হাওয়া করে। তারা সেবা করে পুণ্যলোভে, আমার

সুখসুবিধার দিকে চেয়ে নয়।

সকলের হাস্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর আপনমনে বলছেন—এইসব লোভের বালাই নিয়ে মানুষ যতদিন চলে, ততদিন কিন্তু অনুরাগের আনাচে-কানাচেও যায়নি। আর, অনুরাগহারা কসরতে মানুষের জীবন কখনও সহজ হয় না। আবার, সহজ না হ'তে পারলে মানুষ অন্যকে প্রভাবিত করতে পারে না, যাজনজৈত্র হ'তে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথা বলতে-বলতে অতিথিশালার সামনে এসে পড়েছেন। অতিথিশালার দেওয়াল ও মেঝে পাকা, উপরে টিন, চতুর্দ্দিক বেষ্টন ক'রে ঘর, মাঝখানে খানিকটা খোলা জায়গা।

একদল ঠাকুরকে দেখামাত্র 'বন্দে পুরুষোত্তমম্' ধ্বনি দিয়ে উঠলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন, তাই লক্ষ্য ক'রে অন্য সবাই তাদের থামিয়ে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে একখানা চেয়ার এনে দেওয়া হ'লো, তিনি সেই চেয়ারে বসলেন। মাথায় ছাতা ধরা হ'লো। প্রসন্নতা ও প্রশান্তিতে ভরা মুখখানিকে তাঁর পূর্ণিমার চাঁদের মতো দেখাচ্ছে। চতুর্দ্দিকে মুগ্ধ মানুষের মেলা। ব'সে খোঁজ নিলেন—কত লোক এসেছে।

ভূষণদা (চক্রবর্ত্তী)—এখানে কয়েক শ' আছেন, তা' ছাড়া ঋত্বিক্‌দের বাড়ীতে-বাড়ীতে গিয়ে অনেকে উঠেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ইচ্ছা ক'রে, প্রত্যেক ঋত্বিকের বাড়ীতে ছোটখাট এক-একটা আনন্দবাজার চলে। বাড়ীতে থাকলে যজমানগুলিকে ভাল ক'রে সেবা দেওয়া যায়, আর খাওয়া-শোওয়া, ওঠা-বসা, যাজন ও আলাপ-আলোচনার ভিতর-দিয়ে অনেক কথা মাথায় গেঁথে দেওয়া যায়। এদের জন্য আলাদা ঘর রাখা ভাল, বিছানা-পত্র রাখা ভাল, বাসন রাখা ভাল। প্রত্যেকের স্বাস্থ্যের দিকে চেয়েই তেমনতর ব্যবস্থা রাখা দরকার। এইভাবে যজমানদের বাড়ীতে রাখা সব দিক দিয়েই ভাল। তবে তাদের মধ্যে যা'তে কুনোমি না আসে, সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ঋত্বিক্‌রা মনে করবে, সৎসঙ্গীমাত্রই ইষ্টের সম্পদ্, প্রত্যেকের জন্য তার করণীয় আছে। ফলকথা, কি ঋত্বিক্, কি অঋত্বিক্ , সমগ্র সৎসঙ্গী-মণ্ডলীর মধ্যে হৃদ্যতা ও পারস্পরিকতা যত বাড়ে, ততই একটা পারিবারিক সংহতির মতো সৃষ্টি হয়, তা'তে প্রত্যেকে উপকৃত হয়। ঋত্বিক্‌দের বাড়ীতে-বাড়ীতে অনেক লোক থাকলেও, ঋত্বিক্‌দেরই উচিত অন্যান্য ঋত্বিক্ ও সৎসঙ্গী-দের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ক'রে দেওয়া। পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভিতর-দিয়ে ভালই হয়। তবে লক্ষ্য রাখতে হয়—কাঁচা মাথা তালবেতাল যাজনের পাল্লায় না পড়ে।

বিপিনদা—'আমার যজমান' 'আমার যজমান' এমন বোধ বেশী থাকা কি ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যদি ঠাকুরের হই, তবে আমার যজমান ভাবায় দোষ নেই। আর আমি যদি ঠাকুরের না হই, তবে আমার যজমান ভাবায় অসুবিধা আছে।

দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত)—কি রকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যদি ঠাকুরের হই তখন আমার বুদ্ধি থাকে, আমার সব-কিছুকে আমি কিভাবে ঠাকুরের ক'রে তুলতে পারি। আর আমি যদি ঠাকুরের না হ'য়ে আমার প্রবৃত্তির হই, তখন আমার বুদ্ধি হয়, আমার যা'-কিছুকে কেমন ক'রে ঐ প্রবৃত্তির অনুচর্য্যী ক'রে তুলতে পারি। তা'তে সবারই কর্ম্ম নিকেশ।

শ্রীশ্রীঠাকুর ব্রজেনদাকে (চট্টোপাধ্যায়) ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রজেনদা! আজ কী আয়োজন?

ব্রজেনদা—আজ আলুকপির ডালনা ও ডাল হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুশি হ'য়ে বললেন—এত লোকের জন্য আলুকপির ব্যবস্থা ক'রে ফেলিছেন, আপনার তো ক্ষ্যামতা কম না।

ব্রজেনদা—আপনার দয়ায় জুটে গেছে।

বিপিনদা (উল্লসিত ভঙ্গীতে)—এবার কেষ্টদা গিয়ে ফরিদপুর টাউন হলে ভাল ক'রে মিটিং ক'রে আসায় আমাদের মুখরক্ষা হয়েছে। গত মিটিংয়ের সময় ঐভাবে বাধা পাওয়ায় আমার মনটা খুব দমে গিয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর কোন উৎসাহ দেখালেন না, একটু কঠোরভাবে বললেন—কেষ্টদাকে না নিয়ে আপনারা নিজেরা-নিজেরাই যদি পারতেন, সেই ভাল ছিল। আর, মন দমে যাবি কেন? আর, এল, মুখার্জ্জীর রায়ের পরেও নাকি অনেকের মন দমে গিয়েছিল। এটা আমার কাছে খুব insulting (অপমানজনক) মনে হয়। Conviction (প্রত্যয়) থাকলে, মানুষ opposition (বিরোধিতা)-র সামনে হৃদ্য বীর্য্যে গ'র্জ্জে ওঠে, সবাইকে বুঝিয়ে সশ্রদ্ধ ক'রে তুলে ছেড়ে দেয়। আমরা যা' করছি, তার মধ্যে চোরায়ে-ছাপায়ে করবার কিছু তো নেই, বাঁচতে গেলে যা' যা' লাগে, তাই করছি, করতে বলছি সকলকে। আমরা অনেক সময় নিজে থেকে মুখ খুলে সব কথা বলি না, তাই পরমপিতা এক-একটা কায়দা-কৌশলের ভিতর-দিয়ে সাধারণের মনে নানা প্রশ্ন জাগিয়ে দেন। ঐ প্রশ্নগুলির আমরা যদি ভাল ক'রে সমাধান দিতে পারি—যুক্তি-বিচার, বিশ্বাস ও আবেগ নিয়ে, তা'তে আমাদের কাজের পক্ষে সুবিধা হয়। শুধু মিঠে বুলি বলাই যাজন নয়, পরাক্রম চাই, প্রত্যয় চাই, তেজ চাই। কিশোরী-ওদের এই জিনিসটা খুব ছিল, গোড়ার আমলে অনন্ত, কিশোরী, গোসাঁই, নফর—এরা কি কম কাজ করেছে? আপনার সামনে আপনার আদর্শ ও কৃষ্টি সম্বন্ধে যদি কেউ পাতলা রকমে যথেচ্ছ মন্তব্য বা ব্যবহার করতে সাহস পায়, তার মানে আপনার মধ্যে বিশেষ কোন দৈন্য লুকিয়ে আছে, যা' তাকে অমনভাবে উৎসাহিত করে। বুকে বল যদি না বাড়ে,

জায়গামত রুখে যদি দাঁড়াতে না পারেন—ভক্তি-বিশ্বাসের সম্পদ নিয়ে,—তাহ'লে ক্লীবত্ব কিন্তু ঘুচবে না। আর, ক্লীবত্ব যতদিন না যাবে, ততদিন কিছু সৃষ্টি করতে পারবেন না। আপনাদের কোন প্রভাব হবে না, শক্তি হবে না, জাতির স্থায়ী কল্যাণ কিছু ক'রে যেতে পারবেন না। ফাঁকি দিয়ে কিছু হয় না। মনে রাখবেন, চরিত্র-বলই সবচেয়ে বড় কথা।

বিপিনদা—অনেক লোক এমন বেয়াড়া আছে যে যুক্তিবিচার, বিজ্ঞানের ধার ধারে না, নিন্দা-ঠাট্টা করতে পারলেই যেন খুশি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, আপনাদের ব্যক্তিত্বের দ্যুতি কম। আপনাদের দেখে যে-মানুষ যতই বেয়াড়া হোক, তার একটা সম্ভ্রম হবে না কেন, সমীহ হবে না কেন? আমি বলি না যে আপনারা মানুষের সঙ্গে লাঠালাঠি করেন। আপনাদের মধ্যে এমন একটা সৎ-নিষ্ঠ হৃদ্য বীর্য্যবত্তা ও পরাক্রম দানা-বেঁধে ওঠা চাই, যার হাপ মানুষের গায়ে লেগে তাদের ছ্যাবলামিকে অনেকখানি সংযত ক'রে তোলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাগুলি বলছেন খুব আবেগের সঙ্গে। তাঁর চোখ-মুখ লাল হ'য়ে উঠেছে। এরপর একবার তামাক খেলেন। 'কিরে, কী খবর?'—গ্রামের মুসলমান গন্ধ সরকারকে দেখে স্নিগ্ধ কণ্ঠে শুধোলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

গন্ধ—ভাল।

পরক্ষণেই 'চল্ যাই' ব'লে উঠে পড়লেন। পিছনে আবার সেই আনন্দ-মধুলুব্ধ মানুষের দল। তাদের চোখে-মুখে এক পরমা তৃপ্তির আবেশ।

১৫ই পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৪৮ (ইং ৩০।১২।৪১)

ঋত্বিক্-অধিবেশন চলেছে, অগণিত লোকের ভিড়, সবাই হাসিখুশি। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে মাতৃ-মন্দিরের সামনের বারান্দায় এসে বসেছেন দক্ষিণাস্য হ'য়ে। একে-একে অনেকে এসে প্রণাম করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর খুশিমনে তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন। ঋত্বিক্‌দের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবেগভরে বলছেন—ঋত্বিক্‌দের বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ। মানুষের জীবনের সব দিক নিয়ে তোমাদের কারবার। একটা মানুষ কিংবা একটা পরিবারও যেন কোন দিক দিয়ে হীন না থাকে, অসমর্থ না থাকে, তাই তোমাদের দেখতে হবে। প্রত্যেকটা মানুষের পিছনে তোমরা লেগে থাকবে, এবং ফন্দী-ফিকির করবে, কিভাবে তাকে বড় ক'রে তুলতে পার। তার ঘর-গৃহস্থালী, বাগান, ক্ষেত, গরু-বাছুর, আয়-উপার্জ্জন, খাওয়া-পরা, বিয়ে-থাওয়া, আমোদ-আহ্লাদ থেকে সুরু ক'রে শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনা, সদাচার ও ব্রহ্মজ্ঞান পর্য্যন্ত কোন দিকটাই যেন তোমাদের নজর না এড়ায়। আমার দেখতে ইচ্ছা করে

যে তোমাদের স্পর্শে ঘরে-ঘরে মানুষ দেবতা হ'য়ে উঠছে।

যোগেশদা (চক্রবর্ত্তী)—মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য আমরা কী করতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে আছে তার যোগ্যতা। প্রত্যেকের যোগ্যতা যা'তে বাড়ে, তাই দেখতে হবে। মানুষ যত সুনিয়ন্ত্রিত হয়, সুকেন্দ্রিক সেবার আকূতি তার মধ্যে যত বাড়ে, ততই তার যোগ্যতা বেড়ে ওঠে। আর, এই করতে গেলে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতির ধান্ধা তার মাথায় ঢুকিয়ে দিতে হবে। শুধু পেটের ধান্ধা নিয়ে থাকলে তার যোগ্যতা বাড়বে না। আর, ঋত্বিক্‌রা হাতে-কলমে দেখিয়ে দেবে, কেমন ক'রে মানুষ আয়-উপার্জ্জন বাড়াতে পারে। ধরেন, একজন কৃষি করে, কৃষিটা আরো লাভজনকভাবে করতে পারে কী ক'রে সে-সম্বন্ধে তাকে শিক্ষিত ক'রে তুলতে হবে। ফসল বাড়াবার জন্য কী সার দিতে হবে, নূতন কী-কী ফসল হ'তে পারে তার জমিতে, যে-জমিতে বছরে একটা কি দুটো ফসল ফলায়, সেখানে আরো পারে কি না, এই সব ধরিয়ে দিতে হয়। আর, কৃষিজাত দ্রব্যের উপর দাঁড়িয়ে কুটির-শিল্প কী-কী করতে পারে, তা'ও দেখাতে হয়। ছোটখাট যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে হয়। নিজেরই অনেক ভাবা লাগে, দেখা লাগে, শোনা লাগে, পড়া লাগে, করা লাগে। যে-জিনিস তারা তৈরী করলো তা' বিক্রীর ব্যবস্থা ক'রে দিতে হয়। সস্তায় সুন্দর-ভাবে যেন করতে পারে। নইলে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না। অনেকখানি খাটতে হবে এর পিছনে। নইলে উপরসা-উপরসা দুটো সৎকথা শুনিয়ে চ'লে আসলাম, তা'তে চলবে না। আর, সৎসঙ্গীদের মধ্যে যা'তে পারস্পরিকতা বাড়ে, প্রত্যেকে যা'তে প্রত্যেকের পিছনে এসে দাঁড়ায় তা' করতে হবে। প্রত্যেকের প্রত্যেকের প্রতি যদি সক্রিয় দরদ থাকে, তাহ'লে কারও অবস্থা হীন থাকে না। এতে গরীব-ধনী সবাই উপকৃত হয়। একজনের যদি অজস্র টাকা থাকে, কিন্তু তার পিছনে যদি মানুষ না থাকে, তাহ'লে সেও কিন্তু নিঃস্ব। তাই মানুষ আহরণের প্রয়োজনের বিষয়ে সকলকেই সজাগ ক'রে দিতে হয়। আর, আপনারা যে দীক্ষাদি দিচ্ছেন, এর মধ্যে একটা balance (সাম্য) চাই, দীক্ষিতের মধ্যে অযোগ্যের সংখ্যাই যদি ষোল আনা হয়, তাহ'লে তাদের নিয়ে পারবেন কি ক'রে? যোগ্যতর লোকের সংখ্যা বাড়াতে হয়, তখন তাদের সহায়তায় অযোগ্যদেরও যোগ্য ক'রে তুলতে পারেন, এবং পারস্পারিকতার ভিতর-দিয়ে প্রত্যেককেই বাড়িয়ে তুলতে পারেন। আবার, উচ্চতর বর্ণে অর্থাৎ enlightened stable বর্ণের মধ্যে যা'তে দীক্ষিতের সংখ্যা বাড়ে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়, নইলে আন্দোলনের গতি ঢিলে হ'য়ে পড়ে। আপনাদের নিজেদের উৎকর্ষের জন্যও শ্রেষ্ঠসাজী হওয়া প্রয়োজন। অনেক-কিছু দিক্ ভেবে চলা লাগে। কেবলই যদি মামুলী লোক দীক্ষিত করতে থাকেন, তাহ'লে আপনাদের এ জিনিস যতই

সারী ও সাচ্চা হো'ক না কেন, সমাজে মর্য্যাদাশীল সুপ্রতিষ্ঠিত যারা, তারা এই আওতায় আসতে সঙ্কোচ বোধ করবে। যদিও এটা দুর্ব্বলতা, তাহ'লেও এ দুর্ব্বলতা মানুষের আছে। ফলকথা, এতে মানুষকে বঞ্চিত করা হবে। আর, শুধু কী এই? ধরেন, আজ আপনার মেয়ের বিয়ের জন্য যদি একটা কুলীন সৎসঙ্গী ছেলে খোঁজেন, তা' পাওয়া দুষ্কর, অথচ একটা অদীক্ষিত ছেলের হাতে আপনার মেয়েকে দিতে হয়তো আপনার প্রাণ চায় না, জানেন, মেয়েটা যেভাবে লালিত-পালিত তা'তে বাইরে পড়লে তার কষ্ট হবে। তাই, সমাজের সব স্তরের মধ্যে যদি এটা চারিয়ে দিতে না পারেন, তাহ'লে মুশকিল।

করুণাদা (মুখোপাধ্যায়)—সৎসঙ্গের মধ্যে কোথায় কোন্ উপযুক্ত ছেলে আছে, তাও তো আমরা সব সময় খবর পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাইতো আমি বলি, বিবাহের উপযুক্ত ছেলে ও মেয়েদের বর্ণ বংশ, গোত্র, নাম, ধাম, জন্মকুণ্ডলী ইত্যাদি সম্বলিত একটা তালিকা এখানে তৈরী করা ভাল। তা'ছাড়া ভাল-ভাল চাকুরিয়া, ব্যবসাদার,জমিদার, জোতদার, কনট্রাক্টর, শিল্পপতি ও বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী ও গুণীলোক যারা আছে, তাদেরও নাম, ধাম, ঠিকানাসহ তালিকা প্রস্তুত করা দরকার। এদের ভিতর-দিয়ে আমরা অনেককে দাঁড় করিয়ে দিতে পারি ও অনেককে বিশেষ-বিশেষ বিষয়ে শিক্ষিত ক'রে তুলতে পারি, আবার এখানকার জন্য যে-সব মানুষ প্রয়োজন তা'ও পেতে পারি।

এমন সময় প্যারীদা (নন্দী) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ছেলেটার জ্বর কেমন রে?

প্যারীদা—আজ অনেক কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—যাক, বাঁচলাম। আমার যে কী উৎকণ্ঠায় দিন কাটে।

পরক্ষণে ভগীরথদা (সরকার)-কে জিজ্ঞাসা করলেন—ওষুধের অর্ডার দিছিস নাকি?

ভগীরথদা—দেবো। ব্যস্ততার মধ্যে দিতে পারিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর (রাগত কণ্ঠে)—ঐ তো তোদের দোষ। যখনকার যেটা তখনই যদি সেটা না করিস, তাহ'লে কিন্তু পরে পস্তাতে হবে। কাজে গড়িমসি করার অভ্যাসটাই ভাল না। আজই দিবি।

ভগীরথদা—হ্যাঁ, আজ দেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখনই যা, লিখে ফেল গিয়ে।

প্যারীদার দিকে চেয়ে বললেন—তুইও খোঁজ নিবি যা'তে আজ চিঠি যায়। ডাকের আগে আমাকে খবর দিবি যে চিঠি গেছে।

প্যারীদা—আচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইবার একটু সুপারি দাও।

প্যারীদা সুপারি দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসন্ন বদনে সুপারি চিবোতে-চিবোতে সবার দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন, অধরে প্রাণকাড়া মধুর হাসি, নয়নে স্নেহপ্রীতির অমৃতনির্ঝর। সকলেই আনন্দরসে পরিপ্লুত।

কতকগুলি পায়রা রোদের মধ্যে আনন্দে গলা ফুলিয়ে বকবকম্ বকবকম্ করছে। শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু সময় সস্নেহে ঐ দিকে চেয়ে রইলেন।

কলকাতা থেকে একটি ভাই এসেছেন। তিনি তাঁর কবিতার খাতা বের ক'রে বললেন—আমার লেখা কয়েকটা কবিতা প'ড়ে শোনাব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, পড়।

ভাইটি পর-পর কয়েকটা কবিতা প'ড়ে শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শোনার পর বললেন—বেশ হইছে। আরো লেখার তালে থাক। ছন্দের দিকে একটু নজর দিও। সাম্য সম্বন্ধে যা' লিখেছ, ওখানে ভাবের মধ্যে কিন্তু একটু গোল আছে। সব একাকার হ'য়ে গেলে কিন্তু সাম্য হয় না। প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য আলাদা, বৈশিষ্ট্যকে মুছে ফেলে কারও লাভ নেই। আমগাছকে দিয়ে খেজুর গাছের কাজ পাবে না, খেজুর গাছকে দিয়ে আমগাছের কাজ পাবে না। আম, জাম, খেজুর, তাল—প্রত্যেকটা তাই থেকে যদি আরো ভাল হয়, তা'তেই আমাদের লাভ। কোনটার অভাবে আমাদের কষ্ট পেতে হয় না। মানুষের বেলায়ও ঐ কথা। তাই, কারও বৈশিষ্ট্যকে উড়িয়ে দেওয়া বা নাকচ করা ভাল না। সব সময় লক্ষ্য রাখবে, তুমি যা' লেখ, যা' বল, যা' কর, তা' যেন মানুষের সত্তাপোষণী হয়। ভগবান যে ক্ষমতা দিয়েছেন, তার সদ্ব্যয় করবে। কত প্রতিভাবান লোক আছে, তারা আবোলতাবোল জিনিস পরিবেষণ করে, তা'তে লোকের উপকারের থেকে অপকার বেশী হয়। সেই জন্য যাই কর, ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টিতে সুনিষ্ঠ হ'য়ে করবে, তবেই তা' সফল হবে। যা' সত্য, শিব, সুন্দর তাই-ই দুনিয়ায় টিকে থাকে। তার পরিবেষণেই প্রতিভা সার্থক হয়। সত্য মানে কিন্তু সত্তাপোষণী, শিব মানে মঙ্গলকর, সুন্দর মানে আদরণীয়। এই তিনের অন্বয়েই শিল্প সার্থক হয়, শুধু শিল্প কেন, সব কিছুই। Cultural conquest (কৃষ্টিগত পরাভব)-এর পাল্লায় প'ড়ে যদি উল্টোকথা চমকপ্রদ ক'রে লেখ, তা'তে সাময়িক বাহবা পেতে পার, কিন্তু ওতে কারও বাস্তবে লাভ নেই। আমি কই—তুমি এমন লেখা লেখ, যা'তে মানুষের প্রাণ স্বস্তি ও তৃপ্তিতে মধু-মধু ক'রে ওঠে।

উক্ত ভাই বললেন—আমি আপনার বইটইগুলি ভাল ক'রে প'ড়ে নেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পড়বে, যতীনদা (দাস) ইত্যাদির সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপ-আলোচনা করবে। সব জিনিসটা এমন ক'রে হজম ক'রে ফেলবে, যা'তে যে-কোন

কূট প্রশ্নেরই সমাধান দিতে পার। যজন, যাজন খুব করলে, ওতে মাথা সাফ হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—এখন ক'টা বাজে রে?

হীরালালদা (চক্রবর্ত্তী)—সাড়ে আটটা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইবার তোরা মিটিং-এ যাবি না?

অনেকে একযোগে বললেন—হ্যাঁ। তাঁদের মধ্যে অনেকে উঠে পড়লেন। এমন সময় আশ্রমের মেথর দুলাল এসে বাইরে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠাকুর-বাবা! হামার ভাল জামাকাপড় নাই। শীতে বড় কষ্ট হ'চ্ছে।'

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক'টাকা লাগবে?

দুলাল—৫।৬ টাকা।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্তোষদার (রায়) দিকে চেয়ে বললেন—দশটা টাকা ওকে দিতে পারবি?

সন্তোষদা বললেন—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে ওকে দে। দুলালের দিকে চেয়ে বললেন—বেশী টাকা দেওয়া হ'চ্ছে ব'লে মদটদ খাবি না তো?

দুলাল—টাকা হাতে পেলেই তো হামার মদ খেতে ইচ্ছা করে। খাব না, এ-কথা কি ক'রে বলি?

সকলের হাস্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, এ টাকা জামাকাপড়ের জন্য খরচ করবি। তোদের যা'-যা' লাগে কিনে নিবি। বুঝিস না, তোরা শীতে কষ্ট পেলে আমারও কষ্ট লাগে? আর, দরকারী জামাকাপড় কেনার পর যদি কিছু বাঁচে, তা' দিয়ে একটু-আধটু মদ খেতে পারিস। আর, যদি বুঝিস, টাকা হাতে পড়লে সব টাকা মদে উড়িয়ে দিবি, তাহ'লে নিস না। ও বাজার থেকে জিনিস কিনে এনে দিক।

দুলাল—না বাবা! ওনার যেতে হবে না। আমি আগে ভাল-ভাল জামাকাপড় কিনব। তারপর যদি বাঁচে তখন শীতের দিনে একটু খাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—তাই ভাল.........ওসব মাল বেশী কখনও খাবি না।

দুলাল টাকা নিয়ে চ'লে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওকে যদি মদ খাওয়া একেবারে ছেড়ে দিতে বলা হয়, তাহ'লে এখন পারবেও না, বরং মুষড়ে পড়বে। তাই গীতায় আছে, 'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ'। প্রত্যেকটা মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করার একটা বিশিষ্ট রীতি আছে।

একটি দাদা বললেন—আমার একটু প্রাইভেট আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর অন্য সবাইকে স'রে যেতে বললেন। দাদাটি তাঁর কতকগুলি দুষ্কর্ম্মের কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সব কথা শুনে অভয় দিয়ে বললেন—আর অমন কাম করিস না,

আর একটা শিশু চান্দ্রায়ণ ক'রে ফেলিস। কেষ্টদার কাছে সব শুনে নিস।

উক্ত দাদা—বারবার মনে অনুতাপ আসে, সঙ্কল্পও করি, কিন্তু কার্য্যকালে ঠিক থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (রূঢ় কণ্ঠে)—ও অনুতাপও নয়, সঙ্কল্পও নয়, ও একরকমের ন্যাকামী। সত্যিকার অনুতপ্ত হ'লে কি মানুষ এক ভুল বারবার করে? মানুষ যেমন ইচ্ছা ক'রে ভুল পথে পা দেয়, তেমনি ইচ্ছাশক্তির বলেই তা' থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। এখনও বুঝতে পারছ না যে নিজের কতখানি সর্ব্বনাশ করছ, তা' বুঝলে ও-পথ আর মাড়াতে না। নিজ মুখে যাকে ঘৃণ্য ব'লে বলছিস, তাই-ই আবার আঁকড়ে ধ'রে আছিস, এটা কি সত্যিই তোর ব্যক্তিত্বের পক্ষে অমর্য্যাদাকর নয়? ঐ সব আত্মপ্রবঞ্চনা ছেড়ে দে, সোজা হ'য়ে দাঁড়া। মানুষের মতো চল্। যদি সত্যিই অনুতাপ এসে থাকে, যা' বললাম তাই কর্। আর, যদি মনে-মনে ধারণা থাকে, যা' অন্যায় করেছি, তার জন্য এখানকার মতো একবার প্রায়শ্চিত্ত করি, পরে আবার যদি অন্যায় করি প্রায়শ্চিত্ত ক'রে শুদ্ধ হব, তাহ'লে অমন প্রায়শ্চিত্ত না করা ভাল। প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে কোন 'যদি' থাকবে না। অমনতর অকাম আর করবই না—এই হ'লো সোজা কথা। মনে যদি অতোখানি রোখ থাকে, তবে লেগে যা।

দাদাটি বিনীত কণ্ঠে বললেন—আপনি দয়া করবেন, আর যেন আমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি না হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর (দরদের সঙ্গে)—পরমপিতার দয়া আছেই। দুর্ব্বলতার প্রতি মমতাসম্পন্ন হোস না, তাকে পুষে রাখিস না, নির্ম্মমভাবে তাকে পরিহার ক'রে চলিস, তাহ'লে ভাবনা নেই। দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে মানুষের মনের জোর ক'মে যায়, তার চরিত্রে কোন জেল্লা থাকে না। নিজেই তো বুঝিস, কিসে কী হয়, তবু কেন বেকুবের মতো চলিস? তোদের এমনতর ঢিলে রকমে চলতে দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। আমি কতো আশা ক'রে ব'সে আছি, তোরা পবিত্র হ'বি, মানুষের মতো মানুষ হ'বি, তোদের আওতায় এসে কতো মানুষ সৎ হ'য়ে যাবে। তোরা কী আমার সেই আশা ও কলপনাকে ভেস্তে দিবি?

এইবার দাদাটি হাউ-হাউ ক'রে কাঁদতে-কাঁদতে বললেন—না ঠাকুর! আপনার যা'তে কষ্ট হয়, তা' আমি কিছুতেই করব না, আর কখনও করব না। আমি প্রায়শ্চিত্ত ক'রে শুদ্ধ হব। আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন আপনার মনোমতো হ'য়ে চলতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর করুণাস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে দাদাটির দিকে চেয়ে রইলেন, পরে বললেন—যা, কেষ্টদার কাছে সব বল্ গিয়ে।

দাদাটি প্রণাম ক'রে ধীরে-ধীরে উঠে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তরুমাকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন—এর মধ্যে

বেরোইছিস যে? তোর শরীর ঠিক হইছে?

তরুমা—এখনও সর্দ্দি আছে, গা'টাও ব্যথা আছে, আপনাকে না দেখলে ভাল লাগে না, তাই একবার আসলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জ্বরটর নেই তো?

তরুমা—আছে অল্প।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অল্প কত?

তরুমা—৯৯।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা-যা! পালা এখান থেকে! ঘরে চ'লে যা! জ্বর নিয়ে ঘোরাফেরা করিস না। ওষুধ-টষুধ ঠিকমতো খাতিছিস তো?

তরুমা—হ্যাঁ।.........অসুখে প'ড়ে থাকলে নিজেকে যেন অপরাধী মনে হয়, আপনার কাজকর্ম্ম কিছু করতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ রকম মনে হওয়াই তো ভাল। তা'তে খুঁজেপেতে বের করবি, কেমন ক'রে তাড়াতাড়ি সুস্থ হ'য়ে উঠতি পারিস, আর ভবিষ্যতেও অসুস্থ হ'য়ে না পড়িস।

ধীরে-ধীরে লোকজন জড় হ'তে লাগলেন।

কলকাতা থেকে মদনদা (দাস) একটা ভাল ক্যালেণ্ডার নিয়ে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেখে খুশি হ'য়ে বললেন—বা! বেশ তো! তোর পছন্দই আলাদা। যা, ক্যালেণ্ডারটা মণিকে দে।

মণিদা (ছোড়দা) তখন ঘরে ছিলেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোর কাছে রেখে দে। পরে মণির হাতেই দিস।

শ্রীশ্রীঠাকুর আসামের সতীশদার (চৌধুরী) কাছে হাতী ধরার গল্প শুনছিলেন। এমন সময় নদীয়ার দুজন কংগ্রেসকর্ম্মী আসলেন। একখানা বেঞ্চ এনে দেওয়া হ'লো। প্রণাম ক'রে তাঁরা ঐ বেঞ্চে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনারা কখন আইছেন?

একজন উত্তর করলেন—আমরা কাল এসেছি পাবনায়। সেখান থেকে এলাম। আপনার নাম শুনেছি, কিন্তু সাক্ষাৎলাভের সুযোগ হয়নি, তাই আসলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাক, আইছেন, তাই দেখা হ'য়ে গেল, খুব ভাল হ'লো। এখানে থাকলি যে আরো স্ফূর্ত্তি হ'তো।

উক্ত ভদ্রলোক—আমরা কংগ্রেসের কাজ উপলক্ষে এসেছি, ওখানেই আমাদের থাকা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' বেশ। ফুরসুতমতো যখন পারেন আসেন যেন।

—চেষ্টা করব।...............আমাদের কয়েকটা প্রশ্ন আছে, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

—বলেন।

—রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ না ক'রে আমরা দেশের উন্নতির জন্য যাই করতে যাই না কেন, তা' কি ফলপ্রসূ হ'তে পারে? পরাধীন জাতির প্রথম প্রচেষ্টাই তো হওয়া উচিত পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়া।

—পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়াই তো চাই।

—কিন্তু তাহ'লে আপনারা ধর্ম্ম-আন্দোলন নিয়ে আছেন কেন?

—আমারও তো মনে প্রশ্ন জাগে ধর্ম্ম-আন্দোলন বাদ দিয়ে পরাধীনতার নিরসন আদৌ হ'তে পারে কিনা। এই কথাটা কি ভেবে দেখেছেন, আমরা পরাধীন হলাম কেন ও কী ক'রে?

—সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চক্রান্তে।

—সে চক্রান্ত যদি থেকেই থাকে, তা' আমাদের উপর কার্য্যকরী হ'লো কেন? আমরা তা' এড়াতে পারলাম না কেন?

—আমাদের মধ্যে ঐক্যের অভাব ছিল।

—ঐক্যের অভাব হ'লো কেন?

—প্রত্যেকে স্বার্থপর ও স্ব-স্ব প্রধান হ'য়ে উঠেছিল।

—তা' হ'লো কেন?

—এটা জাতীয় চরিত্রের দুর্ব্বলতা।

—তাহ'লে তো আপনি নিজেই বলছেন, জাতীয় চরিত্রের দুর্ব্বলতাই আমাদের পরাধীনতার কারণ। এখন সেই কারণের যদি নিরাকরণ না করেন, তাহ'লে কি রোগ সারবে? এইখানেই প্রয়োজন ধর্ম্মের, আদর্শের, কৃষ্টির। মানুষের দুর্ব্বলতা মানে প্রবৃত্তিমুখিনতা। প্রবৃত্তিমুখিনতা থেকে মানুষ রেহাই পেতে পারে না, যদি সে ইষ্ট ও কৃষ্টিমুখী না হয়। এই জন্যই আছে আচার্য্যের কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণ ক'রে, তা' অনুসরণ ও অনুশীলন ক'রে চলার পদ্ধতি। আচার্য্য মানে, যিনি আচরণ ক'রে জীবনবৃদ্ধির বিধিকে নিজের জীবনে জেনেছেন, মূর্ত্ত ক'রে তুলেছেন। ধর্ম্ম মানে, যে-অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে বাঁচা-বাড়া অবাধ হ'য়ে চলতে থাকে—ধারণে, পোষণে। আর, ঐ আচার্য্যানুরাগ ও আচার্য্যানুসরণই ধর্ম্মের মেরুদণ্ড। তিনি প্রত্যেককে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী পরিচালনা করেন, তাই প্রত্যেকেই পরিপূরিত হয় তাঁকে দিয়ে। এমন একজনকে কেন্দ্র ক'রেই মানুষ ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে ওঠে, তখন তাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি ও সহযোগিতা সহজ হ'য়ে ওঠে, পরস্পর পরস্পরের স্বার্থে স্বার্থান্বিত হয়, পরস্পর পরস্পরের সেবা করে, এর ভিতর-দিয়েই জাতি সবল, সংহত ও ঐশ্বর্য্যশালী হ'য়ে ওঠে। এই হ'লো ধর্ম্মের রূপ। এমনতর যারা তাদের আর পরাধীন বা পরমুখাপেক্ষী থাকতে হয় না। বাঁচা-বাড়ার জন্য যা' প্রয়োজন,

তা' তখন তারা নিজেরাই সরবরাহ করতে পারে, সৃষ্টি করতে পারে। বাইরের আগন্তুক শক্তির তখন কোন উপযোগিতা থাকে না, তাই তারা খ'সে পড়তে বাধ্য হয়। তাই আমার মনে হয়, এই ভিতের উপর দাঁড়িয়ে যদি আমরা না চলি, সংগঠিত ও সংস্কৃত না হই, তবে যতই হুজুগ করি না কেন, তা'তে আমাদের সত্যিকার লাভ কিছু হবে না। ইংরেজদের দোষ না দিয়ে আমাদের চিন্তা ক'রে দেখা ভাল, তাদের কী গুণের দরুন তারা আমাদের উপর প্রভুত্ব করতে পারছে, আর আমাদের কী দোষের দরুন এত বড় একটা বিরাট দেশ এমনতর অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে।

সুধীরদাকে (দাস) দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কাজের কতদূর রে?

সুধীরদা—হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাড়াতাড়ি সেরে ফেল্!

সুধীরদা সম্মতি জানিয়ে বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক চাইলেন।

হরিপদদা (সাহা) তামাক সেজে দিলেন।

ভদ্রলোকটি বললেন—রাজনীতির মধ্যেও তো নেতাকে মান্য করা আছে। নেতার প্রভাবেও তো জাতি অনেকখানি গঠিত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যিনিই নেতা হউন না কেন—দেখতে হবে, তিনি কারও দ্বারা নীত কিনা। কোন নীতির দ্বারা নীত হ'লে চলবে না, কোন মানুষের দ্বারা নীত হওয়া চাই, যার মধ্যে ঐ নীতি মূর্ত্ত। ফলকথা, জীবন্ত আদর্শানুসরণ ছাড়া মানুষের প্রবৃত্তিগুলি সুনিয়ন্ত্রিত হয় না। যে নিজে সুনিয়ন্ত্রিত নয়, সে অন্যকে নিয়ন্ত্রিত করবে কি ক'রে? বিপুল পারিপার্শ্বিকের মধ্যে প'ড়ে সে নিজেও বিধ্বস্ত হ'য়ে উঠবে, অন্যকেও বিধ্বস্ত ক'রে তুলবে। যে নিজে একায়িত হয়নি, সে দশকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে তুলবে কি ক'রে? তখন দেখা যাবে, দলে-দলে নেতায়-নেতায় কোন্দলই বেড়ে উঠবে। তাই, আদর্শনীতিকে বাদ দিয়ে নেতৃত্ব বা রাজনীতি কখনও সার্থক হ'তে পারে না। প্রকৃত আদর্শপরায়ণ নেতা যিনি তাঁর ঝোঁকই হয়, মানুষের অন্তরে আদর্শের প্রতিষ্ঠা ক'রে, পোষণে, পূরণে, সেবায় নিরন্তর তাকে বাঁচা-বাড়ার পথে সমুন্নত ক'রে তোলা। ওই-ই হয় তাঁর ধান্ধা, তাঁর নেশা, তাঁর স্বার্থ। তাই আমি বলি, রাজনীতির মূলে হ'লো ধর্ম্মনীতি।

ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন—ধর্ম্মের অবতারণা করতে গেলে তো বিভেদ আরো বেড়ে যাবে? সম্প্রদায়, আদর্শ, গুরু ও ধর্ম্মমতের কি অন্ত আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম মানে বাঁচা-বাড়ার নীতি। এই নীতি বিভিন্ন অবতার-মহাপুরুষদের মধ্য-দিয়ে মূর্ত্ত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কিন্তু কোন বিরোধ নেই। তাই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের কোন কারণ নাই, কারণ, সবই একপন্থী।

বর্ত্তমানে এমন যদি কোন আদর্শ থাকেন, যাঁর মধ্যে সবারই বৈশিষ্ট্যসম্মত পরিপূরণ আছে, তাহ'লে তাঁর ছত্রছায়াতলেই সবাই মিলিত হ'তে পারেন—স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে।

কংগ্রেসী দাদা হেসে বললেন—এর মধ্যে একটা বিরাট 'যদি' রয়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সোজা হ'য়ে ব'সে হাতে একটা তুড়ি মেরে সমস্যাটাকে হালকা ক'রে দিয়ে বললেন)—অমনতর আদর্শ-পুরুষ পরমপিতারই অবদান। পরমপিতা কখনই তাঁর অবদানে কার্পণ্য করেন না, এখন আমরা তাঁকে বিমুখ না করলেই হয়।

দাদাটি বললেন—আমি ভগবদ্‌বিশ্বাসী, আমিও বিশ্বাস করি, ভগবানের দয়ায় অসম্ভব সম্ভব হ'তে পারে। ধর্ম্মের যেমনতর ব্যাখ্যা আপনি দিলেন, ঐ যদি ধর্ম্ম হয়, তবে সে ধর্ম্মে কা'রও আপত্তি থাকতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবে ভগবানের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকলে হবে না। হনুমানের মতো খাটা লাগবে তাঁর জন্য। ভক্তি মানুষকে পঙ্গু করে না, পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘন করিয়ে ছাড়ে।

কংগ্রেসী দাদা—আপনার অমূল্য উপদেশে অত্যন্ত উপকৃত হলাম। সুযোগ পেলে আবার আসব। এখন উঠতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতবার সুযোগ পান, ততবারই আসবেন। ওঁকেও নিয়ে আসবেন। আমার লোভ বড় বেশী, অল্পেতে আশ মেটে না। কেউ এসে তাড়াতাড়ি চ'লে গেলি মনে হয় খালাম বটে, ক্ষিদে মিটলো না। খাই-খাই ভাব লেগে থাকে।

দুজনেই শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় অভিভূত হ'য়ে পড়লেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরও ২।১ মিনিট পরে ওখান থেকে উঠে পড়লেন। সঙ্গে বহু লোক।

রাস্তায় একটা ফড়িংকে ডানাভাঙ্গা অবস্থায় দেখে অস্থির হ'য়ে ব'লে উঠলেন—কে মাড়ায়ে চ'লে গেছে রে! এটাকে ডিস্‌পেন্সারীতে নিয়ে যা তো। বাঁচায়ে তোলা চাই।

রমেশদা (দত্ত) তাড়াতাড়ি ওটাকে নিয়ে গেলেন ডিস্‌পেন্সারীতে। শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যথাতুর দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

১৬ই পৌষ, বুধবার, ১৩৪৮ (ইং ৩১।১২।৪১)

বেলা আন্দাজ সাড়ে-আটটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর সৎসঙ্গ-প্রাঙ্গণে বাবলাতলায় একখানি বেঞ্চের উপর এসে বসেছেন। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য, সবারই দৃষ্টি তাঁর প্রতি নিবদ্ধ। শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যবদনে সবার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন।

একটি দাদা বললেন—আপনি বলেন মানুষকে বড় ক'রে বড় হবার কথা,

কিন্তু আমাদের অফিসে দেখতে পাই, প্রত্যেকে অন্যকে দাবিয়ে বড় হ'তে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যোগ্যতা যদি না থাকে, তবে দাবিয়ে বড় হওয়া যায় না। মানুষই তোমার স্বার্থ, তোমার সম্পদ্, তাদের খাটো করলে তুমিই তো খাটো হ'য়ে পড়বে। তোমার বড়ত্ব দাঁড়াবে কিসের উপর? বরং মানুষকে এমন ক'রে সেবা দাও, এমন ক'রে মানুষের ভাল কর, যা'তে তোমার উন্নতিটা তারা নিজের স্বার্থ ব'লে বিবেচনা করে। মানুষকে যদি আপন ক'রে তুলতে পার এবং তোমার যোগ্যতা যদি থাকে, তাহ'লে তোমার উন্নতির জন্য আর ভাবতে হবে না।

উক্ত দাদা—যারা খোসামুদে, বড়বাবুকে যারা খুশি রাখতে পারে, তাদেরই তো দেখি উন্নতি হয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড়বাবুকে খুশি রাখাটা তো খারাপ কথা নয়। শুধু বড়বাবু কেন, উপরে-নীচেয় এবং সমস্তরের সহকর্ম্মী যারা আছে, সকলের সঙ্গেই এমন ব্যবহার নিয়ে চলা ভাল, যা'তে প্রত্যেকেই আপ্যায়িত হয়, সন্তুষ্ট হয়, তৃপ্ত হয়, খুশি থাকে। এর জন্য খোশামোদ করার দরকার করে না, তবে সবারই গুণগ্রাহী হ'তে হয়। এতে নিজের চরিত্রের উন্নতি হয়। মানুষকে আপন করতে পারা মানুষের একটা বড় গুণ। চাকরী, ব্যবসা, যাজন যাই কর, এটা সব জায়গায় লাগে। আর, মানুষকে আপন করতে গিয়ে তোমার আদর্শকে বিসর্জ্জন দিলে কিন্তু চলবে না। আদর্শ হলেন মঙ্গলনিদান। তুমি যত আদর্শনিষ্ঠ থাকবে, ততই তুমি মঙ্গলের অধিকারী হবে, আর অন্যকেও যত আদর্শে অনুপ্রাণিত ক'রে তুলতে পারবে, ততই তাদের মঙ্গল হবে। তোমাকে দিয়ে মানুষ যদি মঙ্গলের অধিকারী না হয়, তা' হ'লে কিন্তু কোন জারিজুরি খাটবে না। তুমি যতই মিষ্টি ব্যবহার কর না কেন, তোমার ব্যক্তিত্বের কোন দাম থাকবে না তাদের কাছে। তাই বলি, ভালই যদি চাও, নিজে ইষ্টের পথে চল ও অন্যকেও ইষ্টের পথ ধরাও। নইলে, গোঁজামিল দিয়ে কোন লাভ হবে না। আর, মনে রেখো, দুটো টাকা পেলে তোমার কিছু পাওয়া হ'লো না, যদি কিনা তোমার চরিত্র উন্নত না হয়, তোমার যোগ্যতা না বাড়ে এবং মানুষ তোমাকে দিয়ে উপকৃত না হয়। পরিবেশ-শুদ্ধ মনুষ্যত্বে, চরিত্রে, বোধে, যোগ্যতায় যতখানি বেড়ে উঠলে, ততটুকুই তুমি বড় হ'লে। তোমার এই বড়ত্ব আবার সন্তান-সন্ততির ভিতরও চারিয়ে যাবে। ফাঁকির কারবার টেকসই হয় না।

উক্ত দাদা—আমি একটু উচিত-বক্তা আছি, তাই আমার সঙ্গে কারও তেমন বনে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উচিত কথা মানে কী জান তো? উচিত কথা মানে সেই কথা যা'তে পরস্পরের মধ্যে মিল হয়। উচিত-বক্তা যদি হ'তে পারতে, তাহ'লে মানুষের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ার কথা নয়। মানুষের দোষ দেখিয়ে কথা কওয়া কিন্তু উচিত কথা নয়। গোড়াতেই মানুষের অহংকে যদি আহত ক'রে তোল,

প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাস সর্ব্বজীবের অশেষ কল্যাণনিষ্যন্দী। তাই তাঁর কাছে এসে মানুষ পায় শান্তি, পায় স্বস্তি, তৃপ্তির পরমাশ্রয় খুঁজে পায় তাঁর ভিতর। মানুষের প্রাণ তাই আকুলি-বিকুলি করে তাঁর স্পর্শলাভের জন্য। এমনই আকৃতি নিয়ে অগণিত ভক্তবৃন্দ তাঁর চরণতলে এসে বসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে আশ্রম-প্রাঙ্গণে বাবলাতলায় একখানি বেঞ্চে ব'সে আছেন। মধুর হাস্যে সবার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন। পশুপতিদা (দত্ত) কাল রাত্রে আলগা জায়গায় শুয়েছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বলছেন—আপনার ঐ সুটকি শরীর, দেখেন যেন ঠাণ্ডা না লাগে।

পশুপতিদা—আমার অভ্যাস আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে ভাল। শরীরটাকে যত সহনপটু ক'রে তোলা যায়,প্রকৃতির সঙ্গে যত খাপ খাইয়ে নেওয়া যায় ততই ভাল।

পশুপতিদা—আগে আমার শরীরের জন্য খুব চিন্তা হ'তো, এখন আর তেমন হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শরীরের সম্বন্ধে খব চিন্তা হওয়া একটা অসুস্থতার লক্ষণ। আমাদের চোখটা যে আছে সে-সম্বন্ধে সাধারণতঃ আমরা খুব সচেতন থাকি না, কিন্তু চোখে যখন একটা কুটো পড়ে কিংবা অন্য কোন কারণে যখন চোখে অসুবিধা হয় তখনই আমরা চোখটার বিষয়ে খুব সজাগ হ'য়ে উঠি। তার মানে চোখের স্বস্থতা তখন ব্যাহত হয়েছে। শরীর-সম্বন্ধেও ঐ কথা।

যতীনদা (দাস)—মনটা যদি শরীরমুখী হ'য়ে পড়ে সে-অবস্থায় করণীয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শরীর অসুস্থ হ'লে মনটা আপনা থেকেই শরীরমুখী হ'য়ে পড়ে। তবে একটা কথা হ'চ্ছে এই যে, স্বস্ত্যয়নীর বিধানের মধ্যে যেমন আছে শরীরটাকে ইষ্টপূজার যন্ত্র-স্বরূপ বিবেচনা ক'রে সুস্থ ও সহনপটু রাখবার কথা, ঐ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলতে হয়। তা'তে শরীরটা মুখ্য হয় না, মুখ্য হয় ইষ্টের কাজ। ঐ মনোভাব নিয়ে আমরা যাই করি না কেন, তা'তে অভিভূতির থেকে রেহাই পাই, নচেৎ আমাদের নিস্তার নাই। স্বস্ত্যয়নী এমন মাল, এ যদি কেউ ঠিকভাবে করে, তার উন্নতি হ'তে বাধ্য। শুধু তার উন্নতি হয় না, তার আশপাশের লোকও ঐ আবহাওয়ায় প'ড়ে উন্নত হ'য়ে ওঠে।

ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়)—আমরা এত লোক তো স্বস্ত্যয়নী করছি, কিন্তু আপনি যেমন বলেন তেমন তো উন্নতি দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বস্ত্যয়নী করা মানে স্বস্ত্যয়নীর সব-কটা নীতি পালন ক'রে চলা। তা' করলে তার ফল হাতে-হাতে পাওয়া যায়। তার মনের ভূমিই বদলে যায়, অবস্থা তার যেমনই হো'ক, তাকেই সে শুভে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোলে। মানুষের সব-কিছুর মূলে আছে তার চরিত্র, অভ্যাস, ব্যবহার, ইচ্ছা ও আকুলতা। স্বস্ত্যয়নী-ব্রতে এই সবগুলির গায় হাত পড়ে। এগুলি যদি বদলে

বাঁচতে-বাড়তে যা'-যা' লাগে, তার কোনটাই তার অজানা থাকবে না। সে হবে কার্য্যকরী জ্ঞানের একটা জীয়ন্ত ভাণ্ডার। আলাপে-আলোচনায়, কথায়-বার্ত্তায়, কাজে-কর্ম্মে সর্ব্বত্র সে একটা উৎকর্ষের হাওয়া চারিয়ে দেবে। তার লক্ষ্য থাকবে, একটা মানুষও যেন অজ্ঞ না থাকে, দরিদ্র না থাকে, অসুস্থ না থাকে, অপারগ না থাকে, রিপুপরবশ না থাকে। ঋত্বিকের মতো ঋত্বিক্ সব হ'লে দেখতে-দেখতে ভারত আবার দেবজাতি হ'য়ে উঠবে, দেবভূমি ব'লে সারা পৃথিবীর লোক আবার ভারতকে নতি জানাবে। আর, আপনাদের কাজ শুধু ভারতে নয়। সারা পৃথিবীতে আপনাদের ছড়িয়ে পড়তে হবে। তাইতো কেবল কই, মানুষ জোগাড় করার কথা। আপনারা মানুষই জোগাড় করতে পারেন না। যেমনতর ৩০০ মানুষ জোগাড় করার কথা বলেছি অমনতর ৩০০ মানুষ জোগাড় করেন। দেখেন যেন কী কাণ্ড হয়! আর যত কাজই করেন, বিশেষ ক'রে লক্ষ্য রাখবেন, সর্ব্বত্র বিয়ে-থাওয়াগুলি যেন ঠিকমতো হয়। প্রতিলোম যেন কিছুতেই না ঘটতে পারে। ওর মতো সর্ব্বনেশে ব্যাপার আর নেই। ওতে সন্তান বিশ্বাসঘাতক হবেই কি হবে। সবর্ণ ও অনুলোম বিয়ের ব্যাপারেও যেমন-যেমন বলেছি, শাস্ত্রে যেমন আছে, তেমনই বিধিমাফিক হওয়া চাই। আগে কত ভাল-ভাল ঘটক ছিল, তারা প্রত্যেক বংশ-সম্বন্ধে কত খোঁজ-খবর রাখতো, তারা যোগাযোগ-গুলি করার সময় ব'লে দিতে পারতো, ক'টি সন্তান হবে, তার মধ্যে ছেলে বা ক'টি, মেয়ে বা ক'টি, এবং কে কেমন হবে। সে-সব এখন রূপকথার মতো মনে হয়। তেমনতর ঘটক পেলে তাদের খুঁজে বের করা লাগে। ভাল বিয়ে যদি না হয় তবে ভাল সন্তান হবে না। আর, ভাল সন্তান যদি না জন্মে দেশে, তবে কিছুই করতে পারবেন না।

মনোরঞ্জনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়)—সাধারণতঃ দেখা যায় যে পিতামাতা যেখানে ইষ্টপ্রাণ, সেখানে ছেলেপেলেগুলি ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হবারই কথা। উভয়ে যদি ইষ্টপ্রাণ হয়, তবে উভয়ের মধ্যে সঙ্গতি থাকে অনেকখানি। পুরুষের ইষ্টপ্রাণতায় তার অন্তর্নিহিত শক্তি অনেকখানি মুখর হ'য়ে ওঠে, আবার ইষ্টপ্রাণতার ফলে স্ত্রীর স্বামীভক্তিও বেড়ে যায়, ঐ সক্রিয় ভক্তির ফলে সে স্বামীর অনেকখানিই সন্তানে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পারে। আবার, এমনতর সন্তানের পিতৃভক্ত, মাতৃভক্ত ও গুরুভক্ত হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। তারা সংযমী হয় সহজেই। বাপের কাছে যদি প্রবৃত্তি বড় না হ'য়ে পিতামাতা ও ইষ্ট বড় হন এবং মা'র কাছে যদি প্রবৃত্তি বড় না হ'য়ে স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী ও ইষ্ট বড় হন, তবে তাদের থেকে উদ্ভূত যে সন্তান, সে-সন্তানেরও ঐ ধাঁজ হবে। আর, ঐটেই হ'লো বড় হওয়া ও ভাল হওয়ার মূল বীজ। তাদের শরীরও পটু হবে, বুদ্ধিবৃত্তিও প্রখর হবে। এরা হবে সমাজের সম্পদ্। এমনতর মানুষ যত বেশী জন্মাবে, ততই জাতির মঙ্গল। আর

আমাদের যে দশবিধ-সংস্কার আছে, সেগুলিও ভাল ক'রে প্রবর্ত্তন করতে হয়।

যোগেনদা (হালদার)—উপনয়ন-সংস্কারের যে কতখানি সুফল, তা' উপনয়ন গ্রহণ করার আগে বুঝতে পারতাম না, ৩৬ দিন প্রাজাপত্য ক'রে উপনয়ন নিয়ে বুঝতে পেরেছি এর মূল্য কতখানি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকটা সংস্কার সম্বন্ধেই ঐ কথা। যথাযথভাবে করলে তখন বোঝা যায়, কোন্‌টার প্রভাব কতখানি। এই সব আচার-আচরণগুলির ভিতর-দিয়ে যেতে হয়, তা' না হ'লে অনেকগুলি জিনিস মরচে প'ড়ে থাকে। পূর্ব্বপুরুষের সঙ্গে যে আমাদের একটা যোগসূত্র আছে, সেটা গভীরভাবে বোধ করতে গেলে, তাদের অনুসৃত ধারাগুলি বজায় রাখতে হয়। আর, আমাদের শাস্ত্রীয় বিধানগুলির যে একটা বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য্য আছে, তা' সবার সামনে তুলে ধরতে হয়। এ-সব নিয়ে আলাপ, আলোচনা, যাজন তো প্রায় নিভেই গেছে। বারবার মানুষের কাছে না বললে, তাদের সামনে ক'রে না দেখালে মানুষ বুঝতে পারে না। সেইজন্য আপনাদের একই সঙ্গে আচারবান ও যাজনশীল হওয়া লাগে। শুধু মুখে যদি বলেন আর নিজেরা যদি না করেন, তাহ'লে কিন্তু আপনাদের কথার কোন দাম থাকবে না। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী, সদাচার, পারিপার্শ্বিকের সেবা, বর্ণাশ্রম, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, ইষ্টানুগ দাম্পত্যজীবন, দশবিধ-সংস্কার ইত্যাদি যে-সব জিনিসগুলি আপনারা চারাতে চান, সেগুলি আপনারা নিজেরাও সম্ভবমতো অনুশীলন করবেন। অনুশীলনের সঙ্গে-সঙ্গে যদি বলেন, তাহ'লে সে-বলা কার্য্যকরী হবে। মোটকথা, এই ধান্ধা আপনাদের পেয়ে বসা চাই। পোষাকী রকমে করলে হবে না। সময় কম, গলদ জমেছে বহুদিনের, ক্ষেত্র বিরাট, কর্ম্মীসংখ্যা নগণ্য—তাই আপনাদের প্রত্যেকের এখন এমনভাবে খাটা লাগবে, যা'তে এক-একজন হাজার মানুষের কাজ করতে পারেন। আর, প্রত্যেকেই উৎসাহ-উদ্দীপনার এমন এক-একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণি হ'য়ে উঠুন—যা'তে আপনাদের আওতায় এসে অতিবড় নিথর মানুষও রেহাই না পায়। আপনাদের কাছে আসলেই মানুষ যেন সৎসঙ্কল্পে পাগল হ'য়ে ওঠে। এইভাবে গুণিত হ'য়ে চলুন, আর বাছা-বাছা লোক দেখে কর্ম্মী সংগ্রহ করুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর একবার তামাক খেলেন।

গ্রামের একটি মুসলমান ভাই এসে বললো—ঠাকুর, আমার ছেলেটির বসন্ত হইছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—টিকে দিছিলি?

উক্ত মুসলমান ভাই—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ডাক্তার (কিশোরীদা)-কে নিয়ে দেখা। আর, খুব সাবধানে মশারির তলে রাখিস! রোগ যেন না ছড়ায়। আর বাড়ীর আর সব্বাইকে টিকে নেবার ব্যবস্থা ক'রে দে।

উক্ত মুসলমান ভাই—মশারি তো একখানা আছে মাত্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন কিশোরীদাকে একখানা মশারি দেবার ব্যবস্থা করতে বললেন। পরক্ষণে প্যারীদাকে ডেকে বললেন—তাড়াতাড়ি লিম্প আনিয়ে সব্বাইকে টিকে দেবার ব্যবস্থা কর। একটি প্রাণীও যেন বাকী না থাকে।

প্যারীদা—আচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর উঠে একবার বাড়ীর ভিতর শ্রীশ্রীবড়মার কাছে গিয়ে বসলেন।

সেখান থেকে পরে আবার খেপুদার বারান্দায় এসে বসলেন। আবার লোকের ভীড় জমে উঠলো। গোসাঁইদা এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন--গোসাঁইদা, কেমন আছেন?

গোসাঁইদা—ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বসেন দেখি, গল্প করি।

গোসাঁইদা বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—আগের সেই পাগলা যুগের কথা আপনার সব মনে আছে?

গোসাঁইদা—মনে আছে বইকি? এখনও সেই সব দিনের কথা গল্প করতে বসলে নিজেকে ভুলে যাই। শরীরের মধ্যে কেমন যেন একটা শক্তি জেগে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-সব গল্প করা ভাল। নূতন যারা আসছে, তারা অনেকেই তো জানে না। আপনি, কিশোরী ওদের কাছে গল্প ক'রে শোনাবেন।......... আপনি বক্তৃতা করতে পারেন না?

গোসাঁইদা—বক্তৃতা-হিসাবে বক্তৃতা আসে না। তবে কথায়-কথায় কথা উঠে গেলে ভিতর থেকে যেন অনর্গল বেরুতে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-ও তো একরকমের বক্তৃতা। ব'সে ব'সেও বক্তৃতা হয়।......... তবে ঐ যে বললেন, কথা উঠে গেলে অনর্গল বেরোতে থাকে। আড্ডা ক'রে ব'সে ঐ ভাবের মজলিশী গল্প যদি করেন, খুব ভাল হয়। সে-আমলের আপনারা সেজেগুজে যাজন করা যাকে বলে তা' করেননি, কিন্তু তখন আপনারা অল্প ক'জনে মিলে যাজন যা' করেছেন, তার তুলনা হয় না। আপনাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার কথাই যদি বলেন, তা'তে অনেকের চোখ খুলে যাবে। ঐরকম একটা মত্ত নেশা না থাকলে কি যাজন হয়? তখন আপনারা যেখানে যেতেন, সেখানেই মানুষকে পাগল ক'রে তুলতেন। আপনি ও কিশোরী কাশীতে যেয়ে কী কাণ্ডটা করলেন?

গোসাঁইদা—তখন আপনার দয়ায় একটা আত্মহারা রকম ছিল। কিশোরী তো প্রেমোন্মাদ হ'য়ে থাকতো, বিশ্বনাথের মন্দিরে যেয়ে এমন অপূর্ব্ব ভাবাবেশে হুঙ্কার দিয়ে নাচতে লাগল যে পাণ্ডারা পর্য্যন্ত স্তুতি করতে লাগলো। ঐ-সব

দিনের গল্প করতে গেলেও আবার সেই ভাবটা যেন জেগে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর- জাগবেই তো। মাল যে সব ভিতরে মজুত আছে। এখন আবার সবাইকে নাচায়ে তোলেন। ঝাঁকি দিলেই হয়। তখন আপনারা নেশা-খোরের মতো এই নিয়ে বেহুঁশ হ'য়ে থাকতেন। ঘর, সংসার, টাকা, পয়সা, নাম-যশ- কোন পিছটানেরই বালাই ছিল না। অমনতর তীব্র, তরতরে আবেগ থাকলেই মানুষকে তাড়াতাড়ি মতিয়ে তোলা যায়। আপনাদের ঐ আস্বাদ জানা আছে, তাই বললেই ভিতরটা সাড়া দিয়ে ওঠে। অনেকে ঠাওরই করতে পারে না ব্যাপারটা কী! প্রাণটাকে আলগা রেখে বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে। তা'তে কি আর বোধের দরজা খোলে?..............আর আপনি যে আজকাল পৌরোহিত্য করছেন, এ খুব ভাল। কয়েকজন ব্রাহ্মণ ঋত্বিক্‌কে পৌরোহিত্যের ক্রিয়া-কর্ম্মগুলি শিখিয়ে দেন। কোন্ অনুষ্ঠান, কেন করা হয়, তার তাৎপর্য্য তাদের ধরিয়ে দেবেন। যজমানদের কাছেও ক্রিয়াকর্ম্ম-ব্যপদেশে সংক্ষেপে ওগুলি বলতে হয়। ঐ বলার ভিতর-দিয়ে মানুষের আগ্রহ ও বোধ বাড়ে। তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা-সমন্বিত ক্রিয়াকর্ম্ম-পদ্ধতি একখানা নিজে যদি লিখতে পারেন, কিংবা কাউকে দিয়ে লেখাতে পারেন, তাহ'লে ভাল হয়।

গোসাঁইদা—আমি নিজেই যে সব জানি না, তবে আপনার দয়ায় অনেকখানি ধারণা ক'রে নিতে পারি, কোন্‌টা কেন করা হয়। আর, কাজকর্ম্মের সময় আমি সেগুলি কিছু-কিছু বলিও। শেখাবার কথা বলছেন, কিন্তু তেমন আগ্রহশীল লোকই তো কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পৌরোহিত্য করবার সময় লক্ষ্য রাখতে হয়, কোন অনুষ্ঠানকে যেন অযথা দীর্ঘ করা না হয়। দীক্ষাদানের ব্যাপারেও ঐ কথা। একটা সম্বেগের সঙ্গে মুখ্য করণীয় যা' তা' বাদ না দিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে কাজ সমাধা ক'রে ফেলতে হয়। শিথিল, মন্থর গতিতে দীর্ঘ সময় ধ'রে করলে মানুষের আগ্রহও শিথিল হ'য়ে ওঠে। তা'তে মাথায় ভাল ক'রে গাঁথে না। এক বিষয়ে দীর্ঘ সময় তীব্র মনোযোগ দেবার মতো ক্ষমতাও মানুষের কম। আর, যাদের শেখাবেন, তাদের আগ্রহও যেমন থাকা চাই, সংস্কৃত জ্ঞানও কিছু থাকা চাই। মন্ত্রের অর্থগুলি যদি ভাল ক'রে না বোঝে, উচ্চারণ যদি শুদ্ধ না হয়, তাহ'লে ব্যাপারটা প্রাণহীন হ'য়ে ওঠে। শুধু এই জন্য নয়, প্রত্যেক হিন্দু সন্তানেরই সংস্কৃতটা ভাল ক'রে শেখা দরকার, তা' না হ'লে আমাদের নিজেদের তফিলে কী মাল আছে, সে-সম্বন্ধে কোন ধারণা হয় না। বেদ থেকে আরম্ভ ক'রে যে-কোন সংস্কৃত গ্রন্থে কী আছে নিজে প'ড়ে বুঝতে পারে, এতখানি জ্ঞান থাকা চাই, নচেৎ টীকাটিপ্পনির মাধ্যমে যদি বুঝতে চায়, তাহ'লে অনেক গোল ঢুকে যাবে।

গোসাঁইদা—টীকাটিপ্পনি ছাড়া বোঝাও মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর মধ্যে অনেক অবান্তর জিনিস ঢুকে গেছে। তাই ব্যাকরণ

ও ভাষাটা এতখানি আয়ত্ত করা চাই, যা'তে মূল প'ড়ে মানে বুঝতে পারে। আপনার হরি চেষ্টা করলে পারে।

গোসাঁইদা—ধরিয়ে দেওয়ার মতো লোক দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে আপনি, পঞ্চাননদা বা কেষ্টদা পারেন।

গোসাঁইদা—আমি অনেক ভুলেটুলে গেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্তোত্র-টোত্র যে রকম বানান, তা' দেখে তো তা' মনে হয় না।

গোসাঁইদা—ও আমি ভেবেচিন্তে লিখি না। ভিতরে একটা ভাব আসলে, আপনার কথা স্মরণ ক'রে কলম ধরি, যা' আসার এসে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবমুগ্ধ অন্তরে ললিতমধুর ভঙ্গীতে সকলের মর্ম্মকন্দর আড়োলিত ক'রে তান তুললেন—

'মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং,
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবম্।'

তারপর একটুক্ষণ চুপচাপ কাটলো।

বহিরাগত একটি মা বললেন—আমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছি অদীক্ষিত পরিবারে, সেখানে তারা মাছ খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে, তাই, মেয়ে সেখানে যেতে চায় না, আমি এখন কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—উপযুক্ত ঘরে যদি মেয়ে দিয়ে থাকিস, তাহ'লে পাঠাবি না কেন? তারা তাদের বুঝমতো মাছ খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে, কিন্তু তোর মেয়ে যদি তাদের সেবাযত্ন ভাল ক'রে করে এবং আবদার ক'রে তাদের মত নিয়ে নিরামিষ খায়, তাহ'লে কি আটকায় নাকি? বরং তোর মেয়ে যদি তেমন হয়, তার-দৌলতে তার শ্বশুরবাড়ীর সবাই সৎসঙ্গী হ'য়ে যেতে পারে। অতোটুকু না পারলে তোর শিক্ষার বাহাদুরী কোথায়? তোর মেয়ে যখন, ঠিক পারবে।

মা-টি খুশি হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলেন। একটু বাদে শ্রীশ্রীঠাকুর স্নানে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে মাতৃমন্দিরের উত্তর দিকে বকুলতলায় বেঞ্চে এসে বসেছেন, একটু উত্তরে বাবলা গাছ, তার পাশে ফিলান্থ্রপি অফিসের কাঠের ঘর, তার পূর্বদিকে কিশোরীদার ঘর, পশ্চিমদিকে ডিস্পেন্সারী, পোষ্ট অফিস ইত্যাদি, মাঝখানে প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের কোথাও-কোথাও চাপ-চাপ দূর্ব্বাঘাস, কোথাও-কোথাও একেবারে পরিষ্কার। বাবলা গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে বেলা-শেষের রোদ খাবলা-খাবলা ছড়িয়ে পড়েছে। শীতের দিন, সেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রোদের মধ্যে অনেকে এসে বসেছেন। ভক্তবৃন্দ যাঁরা বাইরে থেকে অল্প কয়েক-দিনের জন্য অধিবেশন-উপলক্ষে এসেছেন, তাঁদের অনেকেই এই ক'টি দিনের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে চেষ্টা করছেন। ঋত্বিক্-অধিবেশনের ফাঁকে-ফাঁকে তাঁরা যতটা বেশী সময় পারেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে তাঁর সঙ্গসুখ উপভোগে

অভিবাহিত করেন। খুলনা, যশোহর, বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, রাজসাহী, রংপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, চব্বিশ পরগণা, কলকাতা, আসাম ইত্যাদি নানাজায়গা-থেকে অনেকে এসেছেন। বিভিন্ন স্থানের বহু লোক একত্র ব'সে আছেন। সকলে ভাই-ভাই, পিতার চরণতলে সমবেত হ'তে পেরে সকলের মহা আনন্দ। আগ্রহাকুল সন্তানদের পেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরও মহ উল্লসিত, অফুরন্ত আনন্দ-উদ্দীপনায় ভরপুর ক'রে তুলেছেন সকলকে। এই আনন্দের সঞ্চয় নিয়ে ক'দিন পরে যে-যার ঘরে ফিরে যাবে, তাদের ঘর-সংসার, পরিবার-পরিবেশকে ক'রে তুলবে আনন্দময়। এই আনন্দের হাটে যোগ দিতে পারা কতই না ভাগ্যের কথা।

প্রমথদা (দে) বললেন—গাড়ীতে আসবার সময়, একজন মাতাল আমাদের কামরায় বড় হল্লা করছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর (হেসে বললেন)— শালা মাতালের কাণ্ডই আলাদা।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ভঙ্গী ক'রে দেখাতে লাগলেন—মাতালরা মদ খেয়ে কেমন-ভাবে কথা বলে, কেমন কায়দা করে ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন ও হাসছেন, হাসতে-হাসতে তাঁর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে-সঙ্গে সবাই হো-হো ক'রে হাসছেন। হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর গম্ভীর হ'য়ে উঠলেন, সমবেদনার সুরে বলতে লাগলেন, অনেকে মদ খায় জীবনের দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলে থাকবার জন্য। কিন্তু মদ খাবার পর সাময়িক উত্তেজনা যেমন আসে, তারপরেই আসে ঘোরতর অবসাদ। সেই অবসাদ কাটাবার জন্য আবার মদ খায়। এইভাবে শরীর-মনকে জীর্ণ ক'রে তোলে। এই চক্রের থেকে বেরুতেও পারে না। মনে-মনে শুভ-সঙ্কল্প আসলেও ঝোঁক যখন চাপে, তখন আর সামলাতে পারে না। কিন্তু ঝোঁকটা যখন আসে তখনই যদি ঐ সম্বেগ নিয়ে অন্য কোন কাজে নিজেকে ব্যাপৃত করে, তাহ'লে কিছুদিন এভাবে করতে-করতে ঐটে আয়ত্তে আসে। প্রথমে আমি এটা ঠিক পেলাম রসগোল্লা খাওয়ার ব্যাপারে। রসগোল্লর পরে আমার অত্যন্ত লোভ ছিল। অনেক সময় ধার ক'রে রসগোল্লা খেতাম। একবার বেশ কয়েক টাকা বাকী পড়লো। দোকানদার পরিষ্কার জানিয়ে দিল—'ভাল কথায় যদি টাকা না দেন, তাহ'লে যে-কোন ভাবে টাকা আদায় করব। ভদ্রলোকের ছেলে! আপনার লজ্জা করে না, বাকী ক'রে রসগোল্লা খান, পয়সা দেবার নাম নেই?' তখন মনে এত গ্লানি হ'লো যে, টাকাটা কোনভাবে শোধ দিয়ে দিলাম। আর, মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলাম—আর এভাবে রসগোল্লা খাব না। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করলে কী হবে? আবার রসগোল্লা খাবার লোভ আমাকে পেয়ে বসলো। মনে-মনে ভাবতে লাগলাম—যাক্, আজ খাই, একদিন খেলে আর কী হবে? এই ব'লে গুড়িগুড়ি ক'রে রসগোল্লার দোকানের দিকে এগুতে লাগলাম। তখনই আবার মনে হ'লো, লোভ তো আমাকে টেনে

নিয়ে যাচ্ছে। লোভের কাছে তো আমি হেরে যাচ্ছি। এই ব'লে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দাঁড়িয়ে থেকে মনে হ'লো কে যেন আমাকে হিড়হিড় ক'রে রসগোল্লার দোকানের দিকে টানছে। তখন সোজা মাটিতে শুয়ে পড়লাম। শুয়েও মনে হ'তে লাগলো, আমি নিজেকে সামলাতে পারব না, আমাকে টেনে নিয়ে যাবেই। তখন অড়হর ক্ষেতে ঢুকে দুই হাত দিয়ে অড়হর গাছগুলি জড়ায়ে ধ'রে প'ড়ে থাকলাম। ভিতরে তখন দারুণ তোলপাড় করছে। মন একবার বলছে, 'যা না! রসগোল্লা খেলে কী হবে? ওটা তো এমন অখাদ্য কিছু নয়। আর বেশী বাকী না পড়লেই হ'লো, সময়মতো যদি শোধ দিয়ে দিস কিংবা বাকী না করিস তাহ'লে ক্ষতি কী?' পরক্ষণেই বলছে—'না! লোভকে প্রশ্রয় দিলে আরো পেয়ে বসবে, যাওয়া হবে না।' এইভাবে প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। তারপর দেখলাম—রসগোল্লা খাবার ঝোঁকটা যেন ক'মে গেল। ধীরে-ধীরে বাড়ী ফিরে আসলাম। দ্বিতীয় দিন ঐ সময় মা'র কাছে মার খেয়ে কেটে গেল। তৃতীয় দিন আবার যাব-যাব মন করতেই হেম চৌধুরীর সঙ্গে ইচ্ছে ক'রে ঝগড়া বাধিয়ে দিলাম। সে ঝগড়া করবে না, কিন্তু আমার যে ঝগড়া না করলেই নয়, আমার যে সময়টা কাটিয়ে দেওয়া চাই। তারপর মনে করলাম, অড়হর ক্ষেতে শোবারই বা কী দরকার? খামকা ঝগড়া করবারই বা কী দরকার? ব্যাপার তো হ'লো ঝোঁকটা যখন চাপে, তখন অন্যভাবে ব্যস্ত হ'য়ে সময়টা কাটিয়ে দেওয়া। তাই, রোজ বুদ্ধি ক'রে সময়টা এক-একভাবে কাজে ব্যস্ত হ'য়ে কাটিয়ে দিতে লাগলাম। ক্রমে-ক্রমে রসগোল্লার লোভ আমার আয়ত্তে আসলো। কিন্তু তা' সত্ত্বেও পুরো তিন বছরের মধ্যে আর রসগোল্লা খাইনি। যে-কোন প্রবৃত্তিকেই এইভাবে বশে আনা যায়। প্রবৃত্তির খেয়াল যেই চাপে, সেই মুহূর্ত্তেই অন্য কোন প্রীতিকর সৎকাজে আত্মনিয়োগ ক'রে শরীর-মনকে ও-থেকে দূরে রেখে দিতে হয়, তাহ'লে আস্তে-আস্তে ওটা তখনকার মতো উবে যায়। যখন-যখন ঐ আবেগ পেয়ে বসতে চায়, তখন-তখনই ঐ রকম করতে হয়। বার-বার এই রকম করতে-করতে প্রবৃত্তির বন্ধন ঢিলে হ'য়ে পড়ে। ছোট্ট একটু জিনিস, এইটে তোমরা যদি কাজে লাগাও এবং অন্যকেও কৌশলটা শিখিয়ে দাও, তাহ'লে দেখবে প্রবৃত্তি-জয় কতো সহজ। আমি অনেককে এ-কথা বলেছি, অনেক মাতাল, অনেক দুশ্চরিত্র এই সামান্য তুকটা প্রয়োগ ক'রে ভাল হ'য়ে গেছে। তবে ইচ্ছা ও অনুশীলন একসঙ্গে দু'টি জিনিস থাকা চাই।

এরপর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও খেপুদা (চক্রবর্ত্তী) একত্র এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে নিভৃতে অনেক সময় ধ'রে কথা বললেন।

১৭ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৮ (ইং ১।১।৪২)

শ্রীবিগ্রহ-পুরুষোত্তম-তনু দুনিয়ার সব চাইতে আকর্ষণের বস্তু। তাঁর

তাহ'লে সে কিন্তু আর তোমার কথা নিতে পারবে না। তাই, মানুষের প্রতি স্বার্থান্বিত হ'য়ে যথাসম্ভব হৃদ্যভাবে তার ভুলটা তাকে ধরিয়ে দেবে, যা'তে সে অনুতপ্ত হ'য়ে তা' শোধরাতে চেষ্টা করে। এতে দেখবে মানুষকে কত আপন ক'রে পাবে। আর, যে-কথা দশজনের সামনে বললে সে চ'টে যাবে, সে-কথা তাকে গোপনে ডেকে যদি বল, তাহ'লে সে হয়তো নিজেই নিজের দোষ স্বীকার করবে। মানুষ নিয়ে চলতে, মানুষের ভাল করতে অনেকখানি বোধ, বিবেচনা, সহ্য, ধৈর্য্য, প্রীতি থাকা চাই। নইলে মানুষ উপায় করা যায় না। মানুষ উপায় করতে যে পারে, টাকা উপায় করা তার কাছে কিছুই না।

ভূপেশদা (দত্ত) আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কি রে, কী খবর?

ভূপেশদা—গাড়ীর একটা part (অংশ) খারাপ হ'য়ে গেছে, সেইজন্য একবার কলকাতায় যেতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে ঠিক করা যায় না?

ভূপেশদা—এখানে ঠিক করবার মতো নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দরকার হ'লে যাও। আমার ইচ্ছা করে, তোমরা এমনভাবে তৈরী হও, যা'তে যা'-কিছু দরকার এখানেই ক'রে নিতে পার।

ভূপেশদা—অনেক জিনিস আছে, যা' এখানে করতে গেলে কলকাতার থেকে খরচ অনেক বেশী প'ড়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গোড়ায় খরচ কিছু বেশী পড়তে পারে, কিন্তু তোমরা যখন অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করবে, তখন আর বেশী খরচ পড়বে না। অভিজ্ঞতাটাই মস্ত লাভ। কিছু পারব না বা পারি না, এ-কথা ভাবতে আমার ভাল লাগে না। এখানে যে-সব কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে, টাকার দিকে চেয়ে করা হয়নি। এর মূল উদ্দেশ্য শিক্ষা। সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা, সর্ব্বতোমুখী প্রয়োজন-পূরণের যোগ্যতা যদি না হয়, তবে জাত বড় হ'তে পারে না।

যতীনদা (দাস)—বাইরে বিভিন্ন জায়গায় আমরা যে কাজ করছি, সেখানেও কি তাহ'লে নানারকম কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান তৈরী করা দরকার?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে যেগুলি হয়েছে, প্রয়োজনবশে গজিয়ে উঠেছে, বাইরেও তেমনি হবে। এখন বিশেষ ক'রে নজর দেন লোক-সংগ্রহের দিকে। তাদের মধ্যে যা'তে পারস্পরিকতা বাড়ে সেদিকে লক্ষ্য দেন। আর, আমার ইচ্ছা করে যে প্রত্যেক ঋত্বিকের সঙ্গে অধ্বর্য্যু, যাজক ছাড়া উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, মেকানিক, কৃষি-অভিজ্ঞ, কুটিরশিল্প-অভিজ্ঞ লোক থাকবে। তারা প্রয়োজনমতো যেখানে যা' করবার করবে। যজমানদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিভা ও যোগ্যতা-সম্পন্ন লোক যারা আছে, তাদেরও ভাল ক'রে শিক্ষিত ক'রে তুলতে হবে, লাভজনকভাবে কাজে লাগাতে হবে। এমনি ক'রেই প্রয়োজনমতো নানাস্থানে কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠবে। ঋত্বিকের নিজের সব বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা চাই। মানুষের

যায়, তার অবস্থাও বদলাতে বাধ্য।

কেদারদা (ভট্টাচার্য্য)—স্বস্ত্যয়নী করা সত্ত্বেও মানুষের যখন নানা বিপদ আসে, তখন মনটা দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে, ভাবে, এ ক'রে লাভ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা গ্রহের হাতেই আছি, যখন সেগুলির প্রতিকূল প্রভাব থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাই, তখন ওগুলিও অনেক সময় তাদের প্রতাপ দেখাতে ছাড়ে না। কিন্তু তখন যদি স্বস্ত্যয়নী ছেড়ে দিই, তাহ'লে পুরোপুরিই ওদের কবলে প'ড়ে যাব, ওরাই আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে, এইভাবে জাহান্নমের পথই পরিষ্কার হবে। তাই বিপদ-আপদ যাই আসুক, স্বস্ত্যয়নী আরো কঠোরভাবে আঁকড়ে ধরতে হয়। এ ছাড়া পরিত্রাণের পথ নেই। এ যেন দেবাসুরের সংগ্রাম। স্বস্ত্যয়নী হ'লো দৈবী জীবনের পথে অভিযান। কঠোর সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে হয় এ পথে। নিষ্ঠার সঙ্গে ধ'রে থাকলে জয় অনিবার্য্য। আর, আপনারা লক্ষ্য ক'রে দেখবেন, জীবনে যারাই সত্যিকার বড় হয়েছে, তাদের চরিত্রে স্বস্ত্যয়নীর নীতি কিছু-না-কিছু মূর্ত্ত আছেই। এই পাঁচটি নীতি যদি কারও চরিত্রে মূর্ত্ত হয়, তাহ'লে সে একটা দিক্‌পাল হ'য়ে উঠবেই—তা' সে একটা চাষাভূষোই হোক বা মুটে-মজুরই হোক। তাই নিত্য বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে হয়, ঐ পাঁচটি নীতি কোন্‌টা কেমন পরিপালিত হ'চ্ছে। যেটার পরিপালনে শৈথিল্য হ'চ্ছে, সেটা ভাল ক'রে করতে হয়, তাহ'লে দুর্দ্দৈব আমাদের জীবনে প্রবেশ করার কোন রন্ধ্র পায় না। আর, এর সঙ্গে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতিও ঠিকমতো করতে হয়।

কেদারদা—জাতির অর্থনৈতিক উন্নতি কি স্বস্ত্যয়নীর উপরই নির্ভর করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অর্থনৈতিক উন্নতি কেন, সর্ব্ববিধ উন্নতিই নির্ভর করে স্বস্ত্যয়নীর উপর। স্বস্ত্যয়নী সবকিছুই গজিয়ে তোলে। তাই স্বস্ত্যয়নী যত বেশীর মধ্যে চারিয়ে দিতে পারবেন, ততই ভাল। স্বস্ত্যয়নী-ব্রতধারী মানে আমি বুঝি—সে ঈশ্বরের মানুষ, ধর্ম্মের মানুষ, কৃষ্টির মানুষ—বাস্তব আচরণে, তাই তার স্পর্শে অন্যেরাও উৎসমুখী হ'য়ে ওঠে, জীবনবৃদ্ধিমুখী হ'য়ে ওঠে। তার সব করা, বলা, ভাবাগুলি হ'য়ে ওঠে একমুখী, এর মধ্য-দিয়ে সংহত ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হয়, প্রজ্ঞা ফুটে ওঠে। কিছু লোক এমনতর হ'য়ে উঠলে, তারাই দেশ ও দুনিয়ার হাওয়া বদলে দিতে পারে।

মন্মথদাকে (দে) দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মন্মথদা, বসেন। এবার নাকি খুব ভাল কাম হইছে আপনার, গল্প করেন শুনি।

মন্মথদা প্রণাম ক'রে বসলেন। বললেন—আমি নিজে তো বড় বেরোতে পারি না, তবে আমার সহকর্ম্মী যাঁরা আছেন, তাঁরা খুব খেটেছেন। তাঁদের যেমন direction (নির্দ্দেশ) দিয়েছি, সেইভাবে চলেছেন, ভাল-ভাল দীক্ষা অনেকগুলি হয়েছে, আরো বিভিন্ন জায়গা থেকে ঋত্বিক চেয়ে পাঠাচ্ছে।

সামনের টার্ম্মে আরো ভাল কাজ হবে আশা করা যায়। আমি নিজে ঘুরতে পারি না এই যা' দুঃখ, তবে আমার দাদারা খুব ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাহুত ঠিক থাকলে, সব ঠিক হ'য়ে ওঠে। দেখেন আপনারা কতটুকু করিছেন, তা'তেই চারিদিকে কেমন সাড়া প'ড়ে গেছে। তেমন ক'রে লাগলে তো কথাই ছিল না। তাই কই, এতদিন ওকালতি তো করলেন, এইবার পরমপিতার ওকালতি একবার ভাল ক'রে ক'রে দেখেন।

মন্মথদা—ঘুরতে পারলে কাজ হয়, কিন্তু বেশী সময় দিতে পারি না, এই যা' অসুবিধা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার কাজ নিয়ে যদি থাকেন, কোনটাই আটকায় না। নারায়ণের সেবা নিয়ে থাকলে, লক্ষ্মী তার পাছে-পাছে ঘোরেন। প্রথমটা কিছু কষ্ট হ'তে পারে, কিন্তু যজমানগুলিকে যদি তাজা ক'রে তুলতে পারেন, তাহ'লে আর ভাবনা থাকে না। আপাততঃ ঋত্বিকতাকে মুখ্য ক'রে ওকালতি ফাঁকে-ফাঁকে করলে হয়। জোর দিয়ে এই কাজ করতে পারলে পরে আর ওকালতি করবার দরকার হবে না।

মন্মথদা—যাজন নিয়ে থাকতেই প্রাণ চায়, ওতেই সবচাইতে বেশী আনন্দ পাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাজনের মতো জিনিস নেই। যাজনের সময় কত কথা যে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, নিজেই ভেবে অবাক্ হ'য়ে যেতে হয়। ভাবমুখী হ'য়ে থাকলে পরমপিতা রাশ ঠেলে দেন। ভিতরে যা'-কিছু জমায়েৎ আছে ফুটে-ফুটে ওঠে, বিন্যস্ত হ'য়ে বের হয়। 'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং, যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবম্।' যাজনের সময় মনে হয়, ভগবান্ আমার বুকে এসে বাসা বেঁধেছেন, তিনিই আমাকে দিয়ে তাঁর কথা কইয়ে নিচ্ছেন। প্রকৃত যাজনে যাজক ও যাজিত উভয়েই উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে, উল্লসিত হ'য়ে ওঠে, উপভোগ-উচ্ছল হ'য়ে ওঠে। মনে হয়, জীবনে এত সুখও ছিল! 'হায় সে কী সুখ! হাতে লয়ে জয়তুরী, জনতার মাঝে ঝাঁপায়ে পড়িতে, রাজ্য ও রাজা ভাঙ্গিতে গড়িতে, অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া হানিতে তীক্ষ্ম ছুরি।' মানুষকে ইষ্টমুখী ক'রে তোলায়, তার অসৎ যা'-কিছুকে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে তোলায়, মোড় ফিরিয়ে দেওয়ায় যে কী আনন্দ তা' ব'লে শেষ করা যায় না। এতে যেন আমিই পেলাম আমার জীবনকে আরো ক'রে। যাজন যেমন করবেন, বক্তৃতাও তেমনি অভ্যাস করবেন। আপনি বক্তৃতা তো খুব ভাল করেন শুনেছি। বক্তৃতা করার সময় শ্রোতাদের মুখের দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখতে হয়। তাদের ধারণা কী, সমস্যা কী, চাহিদা কী, সংস্কার কী, জ্ঞানের পরিধি কতখানি ইত্যাদি আঁচ ক'রে নিয়ে বক্তৃতার মধ্যে নানারকমের ঢেউ তুলতে হয়, যা'তে প্রত্যেকের মন ব'লে ওঠে এই জিনিসই তো আমার চাই। যাজন বা বক্তৃতা

এমন হবে যে তা'তে দীক্ষার কথা বলব না, অথচ মানুষ দীক্ষার জন্য পাগল হ'য়ে উঠবে। তার যেন তখনই দীক্ষা না পেলে চলছে না—এমনতর হওয়া চাই। মানুষকে শুধু আবেগোদ্দীপ্ত ক'রে তুললেই হবে না, তদনুযায়ী কর্ম্মপ্রবণ ক'রে তুলতে হবে। তাকে বিহিত কর্ম্মে নিরত ক'রে তুলে তা'তে কৃতী ক'রে তুলতে হবে। ক্রমান্বয়ী প্রেরণায় ইষ্টানুগ কর্ম্মনিরত রেখে মানুষগুলিকে বাড়িয়ে তুলতে হবে। কেউ যেন ঢ'লে পড়ার অবকাশ না পায়, চেতিয়ে উদ্বর্দ্ধনমুখর রাখতে হবে সকলকে।

মন্মথদা—মানুষের ভিতরে যদি জিনিস না থাকে, তবে বাইরের চেষ্টায় কতক্ষণ চেতিয়ে রাখা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যে যেমনই হো'ক, ভালবাসার টান প্রত্যেকেরই তার মতো ক'রে আছে। ইষ্টকে অবলম্বন ক'রে সেইটের সদ্ব্যবহার যা'তে করে, সেই প্রেরণা ও দৃষ্টান্তই জোগাতে হবে। করতে-করতে কার কোন্ সময় খুলে যায়, কিছুই বলা যায় না। পিম্পুলিয়া হরিদাসের কথা শুনেছি, তার অন্তর শুষ্ক ও ভাবভক্তিহীন ব'লে চোখে ঝাল লাগিয়ে কাঁদত, এই কাঁদতে-কাঁদতে তার ভিতর সত্যিকার ভাব-ভক্তি জেগে উঠলো, তখন ঈশ্বরের কথা স্মরণ ক'রে স্বতঃই সে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করতো। মানুষের সম্বল হ'লো তার শ্রদ্ধা, ভালবাসা, সেইটেকে যত উস্‌কে তোলা যায় ততই মঙ্গল। আপনারা যে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতির কথা এত ক'ন, সেও তো ঐ ইষ্টানুরাগের অনুশীলনের জন্য। ইষ্টানুরাগ থাকলে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি আপনিই করা আসে। আবার যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি করতে-করতেও ইষ্টানুরাগ ফুটে ওঠে। তাই, যা' করণীয় মানুষকে তা' করার তালে ফেলে দিতে হয়, তখন ভিতরটাও সেইভাবে গ'ড়ে উঠতে থাকে। আমি একবার একটা খেজুর গাছে উঠেছিলাম পাখীর ছানা ধরতে, গাছে উঠে গর্ত্তে হাত দিয়ে হাত বের ক'রে দেখি, ইয়া মোটা কাল মিচমিচে একটা সাপ, তখন আলগোছে ওটা গর্ত্তের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম, নেমে একটা দৌড় মারলাম, খানিক দূর দৌড়ে এসে দেখি, ভয়ে আমার হাত-পা অবশ হ'য়ে এসেছে, আমি যেন আর চলতে পারছি না। এর আগ পর্য্যন্ত আমি কিন্তু ভয় ব'লে বোধ করিনি। দৌড়ে আসার পরই ভয়টা যেন পেয়ে বসলো। আর একবার রাস্তায় একটা সাপ ফণা তুলে ছিল, তার উপর দিয়ে লাফ দিয়ে পার হ'য়ে খানিকটা দৌড়ে এসে ভয়ে জড়সড় হ'য়ে পড়লাম। যখন লাফ দিয়ে পার হয়েছি, তখন কিন্তু ভয় করেনি। বার-বার এইরকম দেখে আমার ধারণা হয়েছে যে, করা-অনুযায়ী ভাব আমাদের ভিতর সৃষ্টি হয়। তাই, করাটার উপর আমি এতখানি জোর দিই। ভিতরে ইচ্ছা নিয়ে করা, বলা, ভাবাটাকে যদি মক্‌স ক'রেও চালান যায়, অন্তররাজ্যের বিন্যাসও কতকটা তেমনতর হ'য়ে ওঠে। তবে জন্মগত বৈশিষ্ট্য যে একটা মূল কথা, সে-বিষয়ে কোন

সন্দেহ নেই।

বিদ্যামার সঙ্গে মণ্টুন এসে দাঁড়িয়েছে, শ্রীশ্রীঠাকুর সোহাগের সুরে বললেন —মণ্টুন সোনা! মণ্টুন সোনা!

মণ্টুনের মুখখানা আনন্দে ডগমগ হ'য়ে উঠলো।

বিদ্যামা বললেন—তরুদির শরীর খারাপ, এখন আমার পাছ ছাড়তে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—দৌরাত্ম্য করার জায়গা পালি কেউ ছাড়ে?.........

পরক্ষণেই বললেন—ও বোধহয় শ্রীশদার থেকে লম্বা হবে।

বিদ্যামা—তা' হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের ভরসা অশেষ। বাপ-বড়বাপের কত জিনিস যে আমাদের ভিতর লুকায়ে থাকে তার ইয়ত্তা নেই। আমি যদি কোন দিক দিয়ে বেশ্যাও হই, আমার বিয়ে যদি ঠিকমতো হয়, আমার পিতৃপুরুষাগত সম্পদ্ আমার সন্তানদের ভিতর-দিয়েও প্রকাশ হ'তে পারে। তাই, উপযুক্ত বিয়ে ও কুলাচারের ভিত-দিয়ে বংশধারা ঠিক রাখা বড় দরকার।

কথায়-কথায় যাত্রার কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—থিয়েটার কন, সিনেমা কন, ভাল যাত্রার কাছে আর সব আলুনি লাগে। ছেলেবেলা থেকেই যাত্রাটা আমার খুব ভাল লাগে। আর, যাত্রা লোক-শিক্ষার পক্ষেও বিশেষ উপযোগী। আমার ইচ্ছা করে, আপনারা ভাল-ভাল যাত্রার বই লেখেন, তার মধ্য-দিয়ে আমাদের আর্য্যকৃষ্টির গৌরবগাথা প্রচারিত হো'ক। নিজেদের মতো ক'রে যাত্রার দল করাও ভাল। আদর্শ ও কৃষ্টির প্রতি যাদের অনুরাগ আছে, তারা যদি আবার ভাল অভিনেতা হয় এবং বইগুলি যদি আদর্শমূলক হয়, তবে তাদের অভিনয়ে আদর্শ সঞ্চারিত হবে বেশী ক'রে। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে, কৃষ্টি-সম্বন্ধে বহু কিম্ভূতকিমাকার ধারণা লোকের মধ্যে চারিয়ে গেছে, অবান্তর ধারণা বহু বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে, সেগুলির নিরসন ক'রে নির্ভেজাল জিনিসটির প্রতিষ্ঠা করতে হবে। খাঁটি জিনিসটি বার-বার লোকের চোখের সামনে তুলে ধরা চাই, কানের কাছে ঢাক পিটিয়ে বলা চাই। নইলে, বহু মানুষ আসল-নকলের ভেদ বুঝতে পারে না। চিন্তার রাজ্যে মানুষ যদি কতকগুলি জঞ্জাল পুরে রাখে, তাদের চলনাও এলোমেলো হ'য়ে ওঠে। তাই, মানুষের মাথা সাফ করার জন্য অনেক খাটুনি আছে। এদিক দিয়ে যাত্রাকে অনেকখানি কাজে লাগান যায়। শুধু যাত্রা কেন, থিয়েটার, নাটক, নভেল, সিনেমা, কথকতা সবগুলিকেই ঢেলে সাজাতে হয়। আর, শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করা লাগে। মানুষ যা'তে চরিত্রবান হয়, চৌকস হয়, জীবনীয় ও জ্ঞাতব্য যা'-কিছুর অনুশীলনে, গবেষণায় ও চর্চ্চায় যা'তে সারা দেশ উদ্দাম হ'য়ে ওঠে, তার ব্যবস্থা করা লাগে। আর, আপনারা ঋত্বিক্‌রাই হবেন তার

প্রবর্ত্তক। যেখানে যাবেন জড়তা বা অজ্ঞতাকে কিছুতেই টিকতে দেবেন না। আলাপে, আলোচনায়, আচরণে ক্রমাগত দেখাতে থাকবেন, শেখাতে থাকবেন—বাঁচা-বাড়ার জন্য কী-কী জানা লাগে, কী-কী করা লাগে, কেমনভাবে চলা লাগে, সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের পূর্ব্ব গৌরব যা' সেগুলি সম্বন্ধে সকলকে ওয়াকিবহাল ক'রে তুলবেন। প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধা ছাড়া মানুষ কখনও বড় হ'তে পারে না। আজকাল কত বাদের আমদানী হ'চ্ছে, আর আমাদের দেশের যুবকরা তা'তেই ঢ'লে পড়ছে, কিন্তু আমাদের যে কী সম্পদ্ ছিল, তা' তারা ভেবে দেখে না। সে-কথা তাদের শোনায়ই বা কে, শেখায়ই বা কে? আমাদের ভাণ্ডারে কী ছিল তা' উদ্ঘাটিত করা লাগবে, সবার গোচরে আনা লাগবে। এত বড় একটা বিরাট জাত আত্মবিস্মৃত হ'য়ে মেকুরের মতো হ'য়ে আছে, এদের জাগান, এদের বাঁচান।

সকলেই স্তম্ভিত হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি শুনছেন, এমন সময় শ্রীশদা (রায়চৌধুরী) ও বঙ্কিমদা (রায়) আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের সঙ্গে নূতন দালানের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহের বিষয় আলোচনা করলেন।

ওরা চ'লে যাবার পর একটি দাদা আর একজনকে দেখিয়ে বললেন—আপনি যাত্রার কথা বলছিলেন, এই দাদা এক সময়ে যাত্রার দলে ছিলেন এবং খুব ভাল পাঠ করতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজকাল করিস না?

উক্ত দাদা—অনেক দিন করি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করাই তো ভাল। মুখস্থ থাকলে কর্ তো দেখি, শুনি।

দাদাটি প্রথমে আমতা-আমতা করতে লাগলেন।

সকলে চেপে ধরলেন, 'ঠাকুর বলছেন যখন করেন না? এতে লজ্জার কী?'

তখন দাদাটি দাঁড়িয়ে অঙ্গভঙ্গী সহকারে উচ্চৈঃস্বরে ভীমের পাঠ ক'রে শোনালেন।

দেখতে-দেখতে আরো বহু লোক এসে জড় হলেন।

অভিনয় শেষে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভগবান যে ক্ষমতা দিয়েছেন, তার সদ্ব্যবহার করতে হয়। প্রত্যেকটা ক্ষমতাই তাঁর কাজে লাগান যায়, তা' দিয়ে লোকের ভাল করা যায়, তাই কোন ক্ষমতাকেই অনভ্যাসে নষ্ট হ'তে দিতে নেই। আমরা অনেকেই অল্প বয়সে বুড়ো মেরে যাই। উৎসাহ, উদ্যম, স্ফূর্ত্তি ক'মে যায়, মর্কট-বৈরাগ্য এসে ঘিরে ধরে, আর ভাবি, আমরা খুব ধর্ম্মের পথে এগোচ্ছি, তা' কিন্তু নয়। ধর্ম্মের সঙ্গে-সঙ্গে আছে উৎসাহ, উদ্দীপনা, আনন্দ, কর্ম্ম, নিত্য নূতন অধিগমন। নিত্য বেদাভ্যাস বলে, তার মানে নিত্য নূতন জানার অভ্যাস। ধর্ম্ম মানুষের জীবনকে রেখে দেয় চির নবীন, চির তরুণ, এই তারুণ্য ও স্ফূর্ত্তিকে খতম হ'তে দিতে নেই। তা' দিলে জীবনে জরা নেমে আসে।

প্রফুল্ল (দাস)—অনেককে তো দেখা যায় বহু বয়স পর্য্যন্ত তারা উদ্দাম প্রবৃত্তি-উপভোগ ও স্ফূর্ত্তি নিয়ে চলে, অথচ কোন আদর্শের ধার ধারে না, তাহ'লে কি তাদের ধার্ম্মিক বলা ঠিক হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদর্শহারা অনিয়ন্ত্রিত জীবনে যে স্ফূর্ত্তি তার দুষ্ট প্রতিক্রিয়া আসবেই, সে আজই হোক আর কালই হোক। কিন্তু আদর্শকে কেন্দ্র ক'রে মানুষের জীবনে যে উৎসাহ, উদ্দীপনা, আনন্দ তা' ক্রমাগত বেড়েই চলে। অবশ্য, শরীরটাকে তাজা রাখা ধর্ম্মের একটা অঙ্গ। শরীর ভাল না থাকায় মানুষ অনেক সময় নিস্তেজ ও নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়ে। কিন্তু ইষ্টানুরাগ এমন একটা জিনিস, যা' ব্যাধি ও জরাকে অনেকখানি প্রতিহত ক'রে রাখে। আমরা যে ব্যাধি ও জরাগ্রস্ত হই, সে তাদের আমন্ত্রণ করি ব'লে। আমরা যদি তাদের আমল না দিই, সর্ব্বদাই যদি ইষ্টনেশায় মাতাল হ'য়ে থাকি, স্বাস্থ্য ও সদাচারের নিয়মগুলি আমরা যদি নিখুঁতভাবে পালন ক'রে চলি, তবে ব্যাধি ও জরা আমাদের সহজে আক্রমণ করতে পারে না। এতে আয়ু পর্য্যন্ত বেড়ে যায়। ফলকথা, জন্মগত সম্ভাব্যতার মধ্যে সব দিক দিয়ে ভাল যতখানি হওয়া সম্ভব তাই হয়।

আশ্রমের একটি মা বাড়ীতে খুব রাগ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসেছেন নালিশ করতে, এসে এত লোকের মধ্যেই বললেন—ঠাকুর! আমার একটা প্রাইভেট আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—তুই আগে আমাকে ১০ (দশটা টাকা) এনে দে, তারপর প্রাইভেট পরে শনুবোনে। দে, এক্ষুণি দে, এক দৌড়ে নিয়ে আয়, দেরী হয় না যেন।

মা'টি বললেন—জোগাড় করতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি দেওয়া তো সম্ভব হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই ধ'রেই নিচ্ছিস যে তাড়াতাড়ি পারবি না। আমি যেখানে বলছি তাড়াতাড়ি দেবার কথা, সেখানে তার উল্টো চিন্তাকে প্রশ্রয় দেবার এখ্তিয়ার কোথায় তোর? তুই যদি দিতে চাস, তাহ'লে আমার সুবিধা যা'তে হয়, সেইভাবেই তো দিবি, আর চিন্তা যা' করবি, তার অনুকূলেই করবি তো? ঐ চিন্তা ও সংকল্প তোর মধ্যে এমন সম্বেগ, ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধির সৃষ্টি করবে, যা'তে সহমায় কার্য্যসিদ্ধি হ'য়ে যাবে। যা! এখনই বেরিয়ে পড়!

মা'টি রওনা হলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাড়া দিয়ে বললেন—বুকে বল ক'রে নিয়ে জোর পায়ে হাঁট।

একটি দাদা দুটি ওলকপি নিয়ে আসলেন। এরপর বিভিন্ন স্থানের নানা-প্রকার খাদ্যদ্রব্যের কথা উঠলো। কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর মজঃফরপুরের যতীনদাকে (মুখোপাধ্যায়) বললেন—আপনি কচুর সিঙ্গাড়ি খাইছেন?

যতীনদা—না'।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখনই যজ্ঞেশ্বরকে ডাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কচুর সিঙ্গাড়ি খাওয়াবার ব্যবস্থা করতে পারিস?

যজ্ঞেশ্বর—আজকাল তো কচু পাওয়া যায় না, আর ঘরেও নেই। যাক্ তবু মা'র কাছে শুনে আসি।

শ্রীশ্রীবড়মার কাছ থেকে শুনে এসে যজ্ঞেশ্বর বললো—কিছুদিন আগে পর্য্যন্তও ছিল, এখন আর নেই। পাওয়ারও সম্ভাবনা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর মজিরদ্দিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—শোলাকচু জোগাড় ক'রে দিবির পারিস?

মজিরদ্দি—এখন তো পাওয়া যাবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বর্ষাকালে বা পুজোর সময় যদি আসেন, আর আমার মনে যদি থাকে, দেখি যদি আপনাকে কচুর সিঙ্গাড়ি খাওয়াবার ব্যবস্থা করতে পারি, একটা খাওয়ার মতো জিনিস বটে।

পরক্ষণে শ্রীশ্রীঠাকুর সুধামাকে ডেকে বললেন—যখনই সুবিধা পাও, যতীনদাকে একবার কচুর সিঙ্গাড়ি ক'রে খাইয়ে দিও। মনে থাকে যেন।

সুধামা সানন্দে সম্মতি জানিয়ে বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার ওখান থেকে উঠে খেপুদার বারান্দায় এসে বসলেন। সেখানেও অনেকে এসে হাজির হলেন। নানারকম কথাবার্ত্তা চলতে লাগল।

ত্রৈলোক্যদা (চক্রবর্ত্তী)—অবতার-মহাপুরুষ যখন আসেন তখন সমাজে প্রতিষ্ঠাবান যাঁরা, সৎ ও সাধুলোক ব'লে পরিচিত যাঁরা, তাঁরা অনেকেই তো তাঁকে ধরেন না, এর কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' যারা প্রতিষ্ঠা নিয়ে খুশি থাকে, সৎ ও সাধুলোক ব'লে খ্যাতিলাভ ক'রে যাদের প্রাণের ক্ষুধা মিটে যায়, তাদের আর অবতার-মহাপুরুষের দরকার কী? তাঁকে পেতে অনেকখানি সুকৃতি লাগে। অগণ্য, নগণ্য হ'য়েও তাঁকে মানুষ পেতে পারে, আবার মহা-অগ্রগণ্য হ'য়েও অনেকে তাঁকে পাবার সৌভাগ্য লাভ করে না। হীনম্মন্য অহং তাঁকে ধরার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। দুইরকম আমি আছে, এক ছোট আমি আর বড় আমি। ছোট আমি নিজের অহমিকা নিয়ে মত্ত হয়, আর বড় আমি ইষ্ট, কৃষ্টি ও পিতৃপুরুষের মহান্ ঐতিহ্যে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করে ও তার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে চলতে চায়। বড় আমি যাদের, তারাই অবতার-মহাপুরুষকে নিষ্ঠাসহকারে ধ'রে থাকে প্রায়শঃ। তারা যদি অতি সাধারণও হয়, তারাই একদিন দুনিয়ায় অসাধারণ হ'য়ে ওঠে। যীশুখ্রীষ্টের ১২ জন জেলেমালো শিষ্য সারা দুনিয়া কাঁপিয়ে দিল। তৎকালীন কত খ্যাতিমান লোককে মানুষ ভুলে গেছে। কিন্তু ভুলতে পারেনি এ'দের। অন্যান্য

অবতার-মহাপুরুষদের পার্ষদদের সম্বন্ধেও এ-কথা খাটে। মানুষ চায় বাঁচতে, বাড়তে, অমৃতত্বের অধিকারী হ'তে। এই চাহিদা যাকে দিয়ে যতখানি পূরণ হয়, সেই তার কাছে তত প্রিয় ও পূজ্য হ'য়ে ওঠে। ঐ চাহিদার খোরাক নিয়ে আসেন অবতার-মহাপুরুষরা, তাই সেই খাদ্য যারা পরিবেষণ করে দুনিয়ায় তারা অমর হ'য়ে থাকে। আবার, ঐ সত্যিকার ক্ষুধাসম্পন্ন যারা, তারা তাঁর কাছে এসে কেমন ক'রে যেন জুটে যায়। 'তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে কেউ তো জানে না।' তাঁর ডাক কেমন ক'রে যেন তাদের কানে পে'ছে যায়। তারা তাঁ'তে আত্মোৎসর্গ না ক'রে স্বস্তি পায় না।

হীরালালদা (চক্রবর্ত্তী) আজ চ'লে যাবেন, তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি নিতে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা। স্ফূর্ত্তিসে কাম-টাম ক'রো, আর শরীর ঠিক রেখে চ'লো। কেষ্টদার সঙ্গে ভাল ক'রে কথাবার্ত্তা কইছ তো?

হীরালালদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেভাবে শুনে গেলে ঐভাবে জোর push (ঠেলা) দাও, আর কেষ্টদার সঙ্গে সব সময় চিঠিপত্রে যোগাযোগ রেখ। আর, হরিপদর কাছে শুনে যাও, কিছু পাঠান লাগবে নাকি।

হীরালালদা—কেষ্টদা ব'লে দিয়েছেন, আপনার জন্য মাঝে-মাঝে আপেল পাঠাতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লেও হরিপদ বা কালিদাসীর কাছে শুনে যেও।

হীরালালদা—আচ্ছা।

ক্ষেত্রদা (বন্দ্যোপাধ্যায়)—ঠাকুর! আপনার এখানে এসে শুনেমিলে কাজের যা' পরিকল্পনা মাথায় আঁটি, প্রায়ই তা' ক'রে উঠতে পারি না, এর কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারণ কী, তা' তুমি নিজেই যদি খুঁজে বের কর, তাহ'লেই সব থেকে ভাল হয়। প্রায়ই দেখা যায়, আমরা ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য বৃহত্তর স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটাই। তা'ছাড়া আমরা সবটা দিক নিয়ে ভাল ক'রে ধ্যান করি না এবং যেমন-যেমন প্রস্তুত হওয়ার তা'ও হই না। একটা কাজ করতে step by step (ধাপের পর ধাপ) কী-কী করা লাগবে, তার মধ্যে কতটা বা কতটুকু আমার আয়ত্তে আছে এবং আর কিসের ব্যবস্থা করা লাগবে, এর অন্তরায় কী হ'তে পারে, এবং তার প্রতিকারই বা কোন্ পথে করতে হবে সব ভেবে নিয়ে যথাসম্ভব প্রস্তুত হ'তে হয়। আর, ক্রমাগতি নিয়ে কাজের পথে চলতে হয়। কয়েকদিন হয়তো হুড়মুড় ক'রে খুব কাজ করলাম, তারপর ঢিল মারলাম বা ছেড়ে দিলাম, তা'তে হবে না। আর, চাই মানুষকে অনুপ্রাণিত ক'রে তোমার কাজের সহায়ক ক'রে তোলা। নিজের কয়েকজন assistant (সহকারী) সৃষ্টি করাই চাই। সঙ্গে-সঙ্গে চাই অর্জ্জনপটুত্ব। যে-কাজ করবে, তার জন্য মানুষ, টাকাপয়সা,

লওয়াজিমা যা'-কিছু লাগে, তা' সংগ্রহ করার দায়িত্ব কিন্তু তোমাকেই নিতে হবে। অন্য কাউকে দায়ী করেছ বা অন্য কারও উপর নির্ভরশীল হয়েছ কি কাজ পণ্ড হবার সম্ভাবনাই বেশী। অন্যের সহযোগিতা তোমার দরকার হবে, কিন্তু সে-সহযোগিতা আহরণের দায়িত্বও কিন্তু তোমার। আর, কাজ হাসিল করতে যত কষ্টই হোক, সে-কষ্টটাও তোমার কাছে উপভোগ্য হওয়া চাই। করার পথে ভুলভ্রান্তি যাই হো'ক, বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে নিজেকে শুধরে নেবে, ভুলত্রুটি হ'তেই পারে, কিন্তু তা'তে ঘাবড়ে যেও না। এইভাবে যদি চল, তোমার অসাধ্য কিছুই নেই।

২০শে পৌষ, রবিবার, ১৩৪৮ (ইং ৪।১।৪২)

জীবনের লক্ষণ সত্তাপোষণী অনুসন্ধিৎসা, তাই জীবনস্বরূপ যিনি তাঁর মধ্যে দেখতে পাই অন্তহীন অনুসন্ধিৎসা। শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বাঁধের ধারে তাসুতে ব'সে আছেন, অনেকেই উপস্থিত আছেন। হারান (দাস) ব'লে একটি ছেলে বলল—আমার বাবা ভূতের ওঝা। তিনি অনেক কিছু জানেন এবং ভূতকে দিয়ে অনেক কিছু করিয়ে নেন। ভূতে দুরারোগ্য রোগীর জন্য ওষুধ পর্য্যন্ত এনে দেয় এবং তা'তে তারা আরাম হয়।

ভূতের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে ছেলেটি অনেক কথা বলল। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রশ্ন ক'রে-ক'রে পরম কৌতূহলভরে ভূতের গল্প শুনতে লাগলেন, পরে বললেন—তোর বাপকে নিয়ে আয়, অমন কত মানুষ খুঁজি, কার মধ্যে কী আছে কে জানে?

প্যারীদা (নন্দী)—আপনি কি এসব বিশ্বাস করেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অবিশ্বাস করার মতো উপযুক্ত কারণ খুঁজে না পাওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বাস করাই তো যুক্তিযুক্ত। অন্ততঃ খোলা মন নিয়ে অনুসন্ধান করায় দোষ কী? মা বলতেন—'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই, মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন।' দুনিয়ায় কত রকমের অস্তিত্ব আছে, সব কি আমরা জানি? আর জানি না ব'লেই কি উড়িয়ে দেব? বরং জেনে, অধিগত ক'রে সব-কিছুকে জীবনের পরিপোষক ক'রে তোলাই তো বুদ্ধিমানের কাজ। গোপাল চ'লে গেল, গোপাল নানারকম experiment (পরীক্ষা) সুরু করেছিল। আমার ইচ্ছা করে, মরার পর মানুষের কী অবস্থা হয়, কিভাবে থাকে, কী করে, সেটা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে দেখি ও দেখাই। আমি দেখতে পাব, তোমরা দেখতে পাবে না, এতে আমার সুখ হয় না। সেইজন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে দেখা ও দেখাবার কথা বলছি। অনন্ত মরার পর কতবার আমার কাছে এসেছে, কতবার তাকে দেখেছি, শুধু অনন্ত কেন আরো কতজন, কিন্তু আমি দেখলে তো তোদের দেখা হয় না। আমি ভাবি সকলে দেখুক, সকলে বুঝুক—যদি এর

বাস্তব সত্তাই থেকে থাকে।

অবিনাশদা (ভট্টাচার্য্য)—আপনি কি ভূত দেখেছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভূত কাকে কয় তা' তো জানি না। তবে প্রসন্ন সিংহের বাড়ীর ওদিকে একটা সড়াগাছ ছিল, সেই সড়াগাছের ওখানে ভূতের ভয় ছিল ব'লে শুনেছি। একদিন দিনের বেলায় তিনটে-চারটের সময় আমরা কয়েকজন ছেলেপেলে মিলে ঐ সড়াগাছটাকে খুব লাঠিপেটা করলাম, হঠাৎ উপর থেকে এক চাঙ্গাড় ঢিল এসে পড়ল। একটু পরে অন্য দিক থেকে আর একটা ঢিল এসে পড়ল গায়ের কাছে, কিন্তু গায় লাগল না। কোথার থেকে যে ঢিল দুটো আসলো, কে যে ঢিল দুটো ছুড়লো, কিছুই ঠাওর করতে পারলাম না। চারিদিক লক্ষ্য ক'রে দেখলাম, কোন মানুষ যে ঐ ঢিল ছুড়েছিল তা' মনে হয় না। তখন আমার মনে হয়েছিল, ভূত ব'লে যদি কিছু থাকে, এটা তার কাজ হ'তে পারে। আর একদিন সন্ধ্যাবেলায় কেমিক্যালের মাঠে ব'সে আছি। তখন বাদল বৈরাগীর বাড়ীতে খুব ভূতের উৎপাত। সেই সম্বন্ধে কথা হচ্ছে। হঠাৎ ঐ দিক থেকে একটা খোয়া এসে পড়লো। আমাদের জীবনের ফাঁকে-ফাঁকে অনেক কাণ্ড ঘ'টে যায়, সে সবগুলি ঠিকমতো pursue (অনুসরণ) করতে পারি না, observe (পর্য্যবেক্ষণ) করতে পারি না, তাই বহু রহস্য আমাদের কাছে অনুদ্ঘাটিত থেকে যায়। গাছ থেকে মাটিতে আপেল পড়তে তো কত লোক দেখেছে, কিন্তু নিউটনের মনে এইটে একটা প্রশ্ন হ'য়ে দেখা দিল। তিনি এই নিয়ে গবেষণা করলেন, তার ফলে আবিষ্কৃত হ'লো মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব। বৈজ্ঞানিক গবেষণা যতই হ'য়ে থাক, এখনও কিছুই হয়নি, আরোর সম্ভাবনা রয়েছে অফুরন্ত, আর এ চিরকাল থাকবেই। প্রত্যেকটা দিকেই অনেক কিছু করবার আছে। ধর্ম্মাশ্রিত বিজ্ঞানের সাহায্যে পৃথিবীর রোগ, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, চরিত্র ও হৃদয়ের দৈন্য অদূর ভবিষ্যতে অনেকখানি দূর ক'রে দেওয়া সম্ভব। আমাদের বর্ণাশ্রম, আমাদের বিবাহনীতি এগুলিও বিজ্ঞানের সন্ধিৎসু গবেষণারই ফল। এই মূল বিজ্ঞানের ফলে জাতি একদিন কত বড় হ'য়ে উঠেছিল। আমরা এ সবের তাৎপর্য্য ভুলতে বসেছি। সেইজন্যই তো মাথাওয়ালা লোক চাই, যারা দুনিয়ার সামনে ধৃতি বা ধর্ম্মকৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারে, আবার তাদের নিজেদেরও চাই এগুলি আচরণে ফুটিয়ে তোলা।

প্রফুল্ল (দাস)—মনুসংহিতা ও অন্যান্য সংহিতার সব বিধান তো মেনে নেওয়া যায় না এবং সব জায়গায় যুক্তিযুক্ততাও বোঝা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগামাথা, কার্য্যকারণ ও প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে বুঝতে গেলে অমনতরই মনে হবার কথা। কিন্তু একটু তলিয়ে বুঝতে গেলে দেখতে পাবে, যা' আছে তা' ঠিকই আছে—দেশ-কাল-পাত্রানুগ পরিপ্রেক্ষিতে, অবশ্য সামগ্রিকের সঙ্গে সঙ্গতিহারা প্রক্ষিপ্ত যদি কিছু থাকে, তা' বাদে। এ বাবা বিধির দলিল,

ঋষির বিধান, এর মধ্যে গরমিল পাবে না। আমাদের একটা মুশকিল হয় কি জান? আমরা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়ে সব একাকার ক'রে ভাবতে অভ্যস্ত, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রের মস্ত কথা হ'লো বৈশিষ্ট্যের সংরক্ষণ ও পোষণ, সেই দিক দিয়ে যদি চিন্তা না কর, তাহ'লে সমাধানী সূত্র খুঁজে পাবে না।

নদীয়া থেকে সুরেনদা (বিশ্বাস) ব'লে একজন এসেছেন, তিনি নিজের দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগের কাহিনী বিবৃত ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরকে কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—ঠাকুর! আমার অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হবে? আমি কি সুখের মুখ দেখতে পাব?

শ্রীশ্রীঠাকুর (জোরের সঙ্গে)—পরিবর্ত্তন করতেই হবে। তোর হাতের মধ্যেই সব। আর, তোর ভাবনা কী? তুই তো পথে আ'সে গিছিস। পরমপিতার নাম পাইছিস। এইবার যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি কর্,—তাঁকে ভালবেসে নিজের দুঃখের কথা ভুলে যা। তাঁকে পাইছিস, এতবড় সুখের মধ্যে দুঃখের কথা কি মনে থাকে? সেই সুখের কথাই ক' মানুষকে, মানুষকে সুখী কর, সেবা দে, যা'তে মানুষের উপকার হয়, ফিঙ্গে হ'য়ে লেগে তাই কর্। হাতের কাছে যাকে পাবি, তাকেই পরমপিতার ভাবে ভরপুর ক'রে দিবি।............তোদের আবার দুঃখ, অভাব? ও-কথা আমার বিশ্বাস করতেই ইচ্ছা হয় না। মনে হয়, ঐ কথা বলার অভ্যাস আছে, তাই বলিস, ব্যাপার তা' নয়। আবার ভাবি দুঃখকেই হয়তো ভালবাসিস, তার হাত থেকে মুক্তি চাস না, মুখে শুধু বলিস—'দুঃখ যাবে কি ক'রে?' মোট কথা, যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি যে আন্তরিকতার সঙ্গে করে, মানুষের আপদে, বিপদে, দুঃখে, কষ্টে যে সাধ্যমতো করে, বাধাবিঘ্নে যে ডরায় না, যে খানিকটা পরিশ্রমী, যার স্বাস্থ্য মোটামুটি চলনসই, সে অভাব-পীড়িত হ'য়ে হাহাকার ক'রে বেড়াবে—এ হ'তেই পারে না। কিছুদিন এই চলনে চললে তার অবস্থা ফিরতে বাধ্য, আমি কাগজে-কলমে লিখে দিতে পারি।.........আমি ভাবি, একটা খাঁটি সৎসঙ্গী যদি একটা গ্রামে থাকে, সে তার গ্রামের একটা লোককেও দৈন্যগ্রস্ত থাকতে দেবে কেন? মানুষকে কতখানি দৈন্যমুক্ত করলি, সেই খবরই তোদের কাছ থেকে শুনতে চাই। ঐ ধান্ধা যেন এতখানি প্রবল হয়, যার কাছে নিজের সংকীর্ণ স্বার্থ তুচ্ছ হ'য়ে যায়। সুখের কথা বলছিলি, এই-ই কিন্তু সুখের প্রাণ, মনে করলে এই মুহূর্ত্ত থেকেই তুই এই মহাসুখের অধিকারী হ'তে পারিস। কী বলিস? এ-কথা মনে ধরে?

সুরেনদা। পারি না-পারি কল্পনা করতেও ভাল লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (উত্তেজিত কণ্ঠে)—যা' তোরা পারবি না, তা' আমি কখনও করতে বলি না তোদের। কতকগুলি গাল-ভরা দার্শনিক কথা বলার অভ্যাসও আমার নেই। তোমাদের সুবিধাটা আমার একটা গরজ-বিশেষ, না হ'লে নিজেই কষ্ট পাই, সেই দায়ে আমার প্রাণ চুইয়ে কথাগুলি বেরোইছে। যা' কইছি—এর

চাইতে সহজ সরল পথ আর হয় না, এতে একসঙ্গে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। এর পরেও যদি কেউ না-পারার কথা কও, আমার ভারি কষ্ট লাগে। (শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখ-মুখ আন্তরিকতায় ছলছল ক'রে উঠলো, কণ্ঠে অনুরণিত হ'য়ে উঠলো মমতাদীপ্ত আকুল আবেদন।)

সুরেনদা—আপনার দয়ায় ঠিক পারব।

শ্রীশ্রীঠাকুর (হাসিমুখে)—মিনমিনের মতো ক'স কেন? জোর গলায় ক'।

সুরেনদা ঐ কথা আবার বললেন, স্পষ্ট ক'রে জোরের সঙ্গে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন হাসতে-হাসতে বললেন—এক-একটা বলদ থাকে, ইচ্ছা করলে খুব দ্রুতবেগে লাঙ্গল টানতে পারে, কিন্তু তা' টানে না, ঢিমে-তেতালা চলে। কৃষাণ তখন লেজে এমন ক'রে মোড়া মারে যে বলদ চেতে ওঠে। তোদের অনেকের বেলাও সেইরকম দেখি। তোরা পারিস সব, কিন্তু ইচ্ছা ক'রে চেতিস না। এতে আমার খাটুনি বেড়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসন্ন বদনে সবার মুখের দিকে চেয়ে একটা নিবিড় তৃপ্তি সঞ্চারিত ক'রে দিচ্ছেন প্রাণে-প্রাণে, সবার বুক ভ'রে উঠেছে অনির্ব্বচনীয় সুখ-সন্দীপনায়।

অরুণকে (জোয়ার্দ্দার) একটা বই হাতে ক'রে নিয়ে আসতে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর সোল্লাসে বললেন—কী রে?

অরুণ—এটা গ্রামার।

শ্রীশ্রীঠাকুর সরোজিনীমার দিকে চেয়ে বললেন—ওর হাঁটাচলা, রকম-সকম দেখে মনে হয়, এখন পড়াশুনো ওর ভাল লাগছে।

সরোজিনীমা—আপনার হাতে মার খাওয়ার পর থেকে ও বদলে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর 'পর নেশা আছে ওর খুব। এই নেশা যদি ঠিক থাকে, তবে দিন-দিন আরো ভাল হবে।

সরোজিনীমা—আমার উপর নেশায় আর কতটুকু ভাল হবে? আপনার উপর নেশা থাকলেই মানুষ হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার উপর নেশা না থাকলে আমার উপর নেশা হ'তে পারে না। মাতৃভক্তি নেই, পিতৃভক্তি নেই, অথচ গুরুভক্তি এ খুব কমই দেখতে পাবে। যদি দেখ, তাও সন্দেহ ক'রো—সে ভক্তি আসল না, নকল। তবে এমন হ'তে পারে যে মা-বাপের ভুলের দরুন তাদের প্রতি শ্রদ্ধাটা বিরত ও বোবা হ'য়ে রয়েছে, এবং সদ্‌গুরুর সান্নিধ্যে গুরুভক্তি, মাতৃভক্তি ও পিতৃভক্তি একই সঙ্গে সম্বেগবান হ'য়ে উঠেছে। 'এক তরী করে পারাপার।' ভবসাগর সুখে পাড়ি দেওয়ার নিরাপদ তরণীই হচ্ছে ঐ শ্রদ্ধা।

শ্রীশ্রীঠাকুর তক্তপোষের উপর আসনগেড়ে ব'সে সামনের দিকে ঝুঁকে কথা বলছেন। বসার মধ্যে, কথার মধ্যে একটা পরম অন্তরঙ্গতার সুর।

তপোবনের একটি ছাত্র কুকুর পুষতে ভালবাসে, সে এসেছে, সঙ্গে-সঙ্গে তার কুকুরটিও এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা বুঝি তোর কুকুর?

ছেলেটি—হ্যাঁ। একরকম আমার। আমার পাছে-পাছে ঘোরে—আমি খেতে না দিলে খেতে চায় না। আমাকে দেখা অবধি কুকুরটা আমার পিছু নিয়েছে। বাড়ীতে আমার ভাল কুকুর আছে। সেটাও আমাকে খুব ভালবাসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই ভালবাসিস কিনা, তাই তোকে ভালবাসে। কুকুর পোষা খুব ভাল। আমারও কুকুরের উপর খুব ঝোঁক ছিল। কুকুরকে পোষ মানাতে গিয়ে নিজেরও অনেকখানি শিক্ষা হয়। আমাদের যত বড়কে মানার বুদ্ধি থাকে, অন্যেও তত আমাদের মানে, এমন-কি ইতর জীবজন্তু পর্য্যন্ত। এইসব জীবজন্তু ভাল ক'রে পোষ মানাতে গেলে ভাল ক'রে লক্ষ্য করতে হয়, এদের মেজাজ কখন কেমন থাকে, চাহিদা ও প্রয়োজন কখন কেমন হয়, ইত্যাদি। এরা তো কথা বলতে পারে না। চোখ-মুখ ও চেহারা দেখে বুঝে নিতে হয়। কুকুর-বিড়ালের চরিত্র যদি এইভাবে পড়া থাকে, মানুষের চরিত্র প'ড়ে নিতেও তোমার দেরী লাগবে না।.........কুকুর পুষতে গেলে সেইরকম কুকুর পুষতে হয়, যার জাত ও বংশ খুব ভাল। ভাল জাতের, ভাল বংশের কুকুর কখনও বিশ্বাসঘাতক হয় না। সে কোন লোভানিতে ভোলে না। যে লোভ দেখাতে যায়, তারই বরং টুঁটি চেপে ধরে। অনেক কুকুর আছে, যাদের এক টুকরো মাংসের লোভ দেখিয়ে চোরে চুরি ক'রে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু pedigreed dog অর্থাৎ ভাল কুকুর যেগুলি, তাদের কাছে তা' কখনই সম্ভব নয়। তারা জান দেবে, কিন্তু নেমকহারামী করবে না, প্রভুর কোন ক্ষতি হ'তে দেবে না। ওগুলির মধ্যে ভক্তি-ভালবাসার একটা অকৃত্রিম রূপ দেখা যায়। যেমন বাধ্য, তেমনি পরাক্রমী, যেমন সংযত, তেমনি তেজী।

ছেলেটি বললো—বাড়ীতে নিজের কুকুরটা ছেড়ে এসে কুকুরটার জন্য আমার মন কেমন করতো। কিন্তু এই কুকুরটাকে পেয়ে এখন আর তত খারাপ লাগে না। তবে ভাবি, আমি যখন পরীক্ষা দিয়ে এখান থেকে চ'লে যাব, তখন তো এর মন খারাপ হ'য়ে যাবে, আর কে-ই বা একে খাওয়াবে, যত্ন নেবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাওয়ার আগে তোর মতো কাউকে ঠিক ক'রে দিয়ে যাস, যা'তে ওর অযত্ন না হয়। তোর মতো কুকুর ভালবাসে এমন কারও উপর ভার দিয়ে যাবি, আর তুই থাকতে-থাকতে তার সঙ্গে ভাব ক'রে দিবি। তখন তার মধ্য-দিয়েই কুকুরটা তোকে পাবে, তোর ছেড়ে-যাওয়ার কষ্টটা ওর তত লাগবে না।

ছেলেটি শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে চ'লে গেল।

আশ্রমের প্রতি স্থানীয় অনেকের বিরুদ্ধ মনোভাবের বিষয় কথা উঠলো। একটি দাদা এই প্রসঙ্গে বললেন—যাদের প্রকৃতি খারাপ, তারা সৎ-এর বিরুদ্ধে

না লেগেই পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা অহঙ্কারী, প্রভুত্বকামী, ঈর্ষা ও দ্বেষ-পরায়ণ, তাদের নিয়েও চলার রীতি আছে। সেই রীতি যদি আমরা না জানি, তাহ'লে কেবল অন্যের ঘাড়ে দোষ দিলে চলবে না। একসময় ছিল, যখন আমি গ্রামের সবার সঙ্গে মিশতাম, সবার বাড়ী যেতাম, সবার খোঁজ-খবর নিতাম, তা'তে মানুষ তুষ্ট থাকতো। কিন্তু পরে আমি এদিকে লোকজন নানা ঝামেলা নিয়ে এতই ব্যাপৃত হ'য়ে পড়লাম যে, গ্রামের সবার সঙ্গে মেলামেশা করবার আর সে-সুযোগ পেলাম না। আমার হ'য়ে যে তোমরা এটা করবে, তাও তোমরা করলে না, ফলে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়লাম। সামাজিক স্তরে মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মেলা-মেশা করার একটা প্রয়োজন আছে। নচেৎ তুমি মানুষের যতই ভাল কর না কেন, তা'তে তাদের মন পাবে না। ওতে তাদের inferiority-তে (হীনম্মন্যতায়) ঘা লাগবে। তারা ভাববে, তুমি বড় মানুষ হয়েছ, তাই সবাইকে দয়া করছ। কিন্তু বিনীত থেকে তুমি যদি সবার সহানুভূতি কুড়িয়ে নাও, সেইটেই বরং তোমার লাভ। এক সময় ছিল, পাবনার উকিল, মোক্তার, মুহুরী, এমন-কি নকল-নবীসরা পর্য্যন্ত আমাদের কাজের ব্যাপারে কোন পয়সা নিত না, স্বেচ্ছায় সানন্দে ক'রে দিত, এবং এই করার ভিতর-দিয়ে তারা একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করতো যে, তারা একটা সৎ-প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করছে। পরে আমাদের তরফের যারা, তাদের মধ্যে কেউ-কেউ এমন টাকার গরম দেখাতে লাগল, লোভানি দিতে লাগল—যে এখন আর পয়সা ছাড়া এক-পা চলা যায় না। অন্যে যেটা এক পয়সায় পারে আমাদের সেখানে পাঁচ পয়সা খরচ করতে হয়, তা'ও কাজ উদ্ধার হয় না। মানুষের লোভ আছে, অহমিকা আছে, দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থপরতা আছে, আমাদের চালের ভুলে সেইটেকে যদি আরো উস্কে দেওয়া হয়, তাহ'লে তো বিপদ বেড়ে যায়। আর, এই যে অজ্ঞাতসারে উস্কে দেওয়া, এর পিছনেও থাকে নিজেদের স্বার্থবুদ্ধি, নানারকম প্রবৃত্তির কণ্ডূয়ন। মানুষের দোষ তো আছেই, কিন্তু সেই দোষকে মাথা তুলতে না দেওয়ার মতো দূরদর্শিতা, কৌশল, চরিত্র, চলন, ব্যবহার, পরাক্রম ও প্রস্তুতি যদি আমাদের না থাকে, তবে তা' আমাদের আয়ত্ত করতে হবে তো। যাজন সর্ব্বত্রই করা লাগে। যেমন কথায়, তেমনি কাজে। আমরা বাইরে এত যাজন ক'রে বেড়াই, কিন্তু এখানে আমাদের যাজন কোথায়? আর, যাজনের প্রথম কথাই হ'চ্ছে মানুষের সঙ্গে সশ্রদ্ধ হৃদ্যতা স্থাপন। ....এটা, অবশ্য তোমাদের করণীয় যা' সেই দিক দিয়ে বলছি, কিন্তু এমন বহু বিশ্বাসঘাতক আছে, যারা কিছুতেই ছোবল মারতে ছাড়বে না। এই জীবনে কম দাগা পাইনি সে-দিক দিয়ে। কতকগুলি মানুষ এমন আছে, তাদের জন্য যত করা যাবে, তারা ততোধিক ক্ষতি করবে। অনেক সময় ভেবেছি তাদের জন্য আর কিছু করবো না, তা'তে অন্ততঃ তাদের অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতার

দৌরাত্ম্য থেকে খানিকটা রেহাই পাব। কিন্তু যখনই তারা বিপন্ন হ'য়ে পড়ে তখন সব কথা ভুলে যাই। একটা বিহিত করতে না পারলে নিজের প্রাণ যেন আর বাঁচে না। আমার কথা কী কব? একটা মেয়ে-মানুষেরও আমার থেকে মনের জোর ঢের বেশী। তাই মনে হয়, আমাকে সংরক্ষণ করার ক্ষমতা আমার নেই। আছে তোমাদের।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু পাশ ফিরে বসলেন—জানলার ফাঁক দিয়ে আনমনাভাবে দূর আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন—দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর এবং সীমাহীন অম্বর ভেদ ক'রে দূরে, বহুদূরে, আরো দূরে কী যেন দেখছেন। হয়তো বা জন্মজন্মান্তরের স্মৃতি ভেসে আসছে তাঁর চোখের সামনে। জন্ম-জন্ম ধ'রে তিনি ভালবেসেছেন মানুষকে, দিয়েছেন তাদের অমৃতের পরশ, আর মানুষ অকথ্য অত্যাচার করেছে তাঁর উপর, তবু তাঁর প্রেম হার মানেনি কোনদিন। শত আঘাতে অটল থেকে তা কল্যাণ-কলনিনাদে ছুটে চলেছে জগতের প্রত্যেকটি জীবনকে সার্থক ক'রে তুলতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার উঠে কাজল-ভাইয়ের ঘরের বারান্দায় একটা মোড়ার উপর এসে পূর্ব্বাস্য হ'য়ে বসলেন।

পূজনীয়া ছোটমা কাজলকে সঙ্গে নিয়ে এসে পাশে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাজলরাজা কী কয়?

ছোটমা হেসে বললেন—দুষ্টুমি করে, আর কেবল বুদ্ধি, আপনার কাছে যেয়ে 'রাধাবোল' 'রাধাবোল' করবে। ওতে খুব স্ফূর্ত্তি পায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন করবি নাকি?

কাজলভাই এগিয়ে আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর হাত ধ'রে কিছু সময় 'রাধাবোল' 'রাধাবোল' বলতে লাগলেন, কাজলভাইও দুলতে-দুলতে সঙ্গে-সঙ্গে বলছেন, 'রাধাবোল' 'রাধাবোল'।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বলছেন, এ হ'লো zigot (বীজ)-এর কাজ। ভিতরে ঐ জিনিস আছে কিনা, তাই এত নেশা।

আস্তে-আস্তে চতুর্ভুজদা (উপাধ্যায়), যোগেশদা (চক্রবর্ত্তী), গুরুদাসদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), কেদারদা (ভট্টাচার্য্য), গোপেনদা (রায়), নিবারণদা (বাগচী), চারুদা (সরকার) প্রভৃতি অনেকে এসে উপস্থিত হ'লেন, মায়েদের মধ্যেও অনেকে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর চারুদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এখন পেট কেমন?

চারুদা পেটের অবস্থা আগের থেকে ভাল। এখন খুব খিদে হয়, খুব খেতে ইচ্ছা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর একরকম আছে লোভের খিদে, তা' কিন্তু ভাল নয়। আর, খাওয়া-দাওয়া খুব সাবধানে করবেন। মাত্রা ছাড়িয়ে যাবেন না। আপাততঃ

ঝোলভাত চালিয়ে যান।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন হরিপদদাকে (সাহা) ডেকে—Indian Materia Medica, ভারতীয় ভৈষজ্য তত্ত্ব, বনৌষধিদর্পণ প্রভৃতি বই থেকে কয়েকটি জিনিসের গুণাগুণ দেখতে বললেন।

হরিপদদা—পরে দেখলে হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরে আবার কী? এখনই দেখে দে। তড়িৎ-ঘড়িত না করলে কি কাম হয়? তুই দেখে এগুলির ভিতর থেকে একটা জায় ক'রে ফেল—ফলকথা লিভার, বায়ু, অম্বল, আম, অজীর্ণ সবগুলি দিক দেখা চাই। একেবারে মোক্ষম ওষুধ ক'রে দিবি। চারুদা খেয়ে কবে ধন্বন্তরি।...........আর দ্যাখ্, আমার ইচ্ছা করে, ওষধি গাছ-গাছড়া সব যদি নানান জায়গা থেকে এনে এখানে লাগাস, তাহ'লে খুব ভাল হয়। এরা তো সব নানা-জায়গায় ঘোরে, আর সৎসঙ্গীও আছে সব জায়গায়। একটু চেষ্টা করলেই এটা করা যায়। এ জায়গায় এমন ক'রে ফেলবি, 'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে' অর্থাৎ 'যাহা নাই সৎসঙ্গে, তাহা নাই জগতে।' যে ব্যাপার ধরবি, তার একেবারে চরম ক'রে ছেড়ে দিবি। কী তো কয়? 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি' না-কি জানি?

যোগেশদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ঐ নেশা। যা' করব, তাই-ই perfectly (নিখুঁতভাবে) করব, তার কোন দিক বাকী রাখব না, কোন দিকে ফাঁকি দেব না, half-heartedly (আধা অন্তর নিয়ে) কিছুই করব না, নিজেকে spare (ক্ষমা) করব না কিছুতেই। আপনারাও ঐরকম অভ্যাস ক'রে ফেলেন। তাহ'লে দেখবেন, জীবনের মধ্যে মস্ত একটা মজা পাবেন। ঢিমে-তেতালা ভাব আমার মোটেই ভাল লাগে না। ফাঁকি দেওয়া মানে নিজেই ফাঁকিতে পড়া। আপনাদের এই যে ঋত্বিকতার কাজ, এ হ'লো দেবতার কাজ। নিরন্তর অনুশীলনের উপর যদি না থাকেন, তাহ'লে চরিত্রের দীপ্তি থাকবে না। নিজের ভিতরে যদি দীপ্তি না থাকে, তবে মানুষের অন্তরের আঁধার দূর করতে পারবেন না, সে আপনি মুখে যত ভাল কথাই কন। Example is better than precept (দৃষ্টান্ত উপদেশের চেয়ে ভাল)। আপনাদের চলা, বলা, অভ্যাস-ব্যবহার দেখে যেন মানুষ educated (শিক্ষিত) হ'য়ে উঠতে পারে। আপনারা হলেন লোক-শিক্ষক। আপনাদের কত জিনিস আয়ত্ত করতে হবে। I. C. S.-দের চাইতেও আপনাদের বেশী চৌকস হওয়া লাগবে। বলা, কওয়া, লেখা, নাচ, গান, বক্তৃতা, আহরণ-পটুত্ব, সাধন-ভজন, কষ্টসহিষ্ণুতা—কোন দিক দিয়ে আপনারা কম যাবেন না—আর তা' সবই ধর্ম্মার্থে—সত্তাপোষণ-পালনে। যে যে-কাজ নিয়ে থাক, তাকে সেই কাজে যেন আরোর দিকে এগিয়ে দিতে পারেন। কৃষক আপনাদের কাছে এসে দেখবে, কৃষি-সম্বন্ধেও তার অনেক কিছু জানবার

আছে আপনাদের কাছে। এমনি উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, জমিদার, চাকরে, নেতা—প্রত্যেককেই যেন আপনারা আরোতর শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে তুলতে পারেন। এখানকার এই university-তে (বিশ্ববিদ্যালয়ে) আপনাদের শেখার সুযোগ অনন্ত। আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা থাকলেই হয়। হাতের কাজ যত পারেন শিখবেন—সাঁতার কাটা, সাইকেল চালান, ঘোড়ায় চড়া, মোটর চালান, টাইপরাইটিং, ফটোগ্রাফি, ছুতোরমিস্ত্রীর কাজ, রাজমিস্ত্রীর কাজ, কর্ম্মকারের কাজ, কোদাল চালান, কাঠফাড়া, ঘরবাঁধা, লাঙ্গল চালান, রান্না করা, কেনা-বেচা করা, ল্যাবরেটরির এক্স্পেরিমেণ্ট ইত্যাদি যে-সব কাজ হামেশা লাগে, তা' যত জানা যায় ততই ভাল। হাতের কাজে চোস্ত হ'লে এ সব থেকে একটা অভিজ্ঞতা হয়, তখন কথাগুলির মধ্যেও তার একটা ছাপ থাকে, তা' মানুষের মাথায় গেঁথে যায়, সেগুলি ফাঁকা কথা হয় না। আর, বাইরে নূতন জায়গায় যেখানে যাবে তোমরা, সেখানে শীর্ষস্থানীয় যারা তাদের বাড়ীতে অতিথি হবে। তোমাদের প্রতিমুহূর্ত্তের চলন যেন এমন হয়, যা'তে মানুষ তোমাদের শ্রদ্ধা না ক'রেই পারে না। এইভাবে মাথা-মাথা লোকগুলির মধ্যে ঢুকবে। আর, সব সময় লক্ষ্য রাখবে, ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠা ছাড়া, আত্মস্বার্থ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকে যেন কিছুতেই মন না যায়। তোমরা তৈরী হ'লে সব ঠিক ক'রে ফেলতে পারবে।

২১শে পৌষ, সোমবার, ১৩৪৮ (ইং ৫।১।৪২)

প্রভাত-সূর্য্যের দিকে মুখ ক'রে ব'সে আছেন শ্রীশ্রীঠাকুর, শান্ত-সৌম্য ধ্যান-গম্ভীর মূর্ত্তি। চোখ চেয়েই যেন ধ্যান করছেন। কোন্ অতলে তলিয়ে গেছে তাঁর মন। তবু সহজ, সচেতন, সক্রিয়, সদানন্দ, পরিবেশের কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়াচ্ছে না। একেই কী বলে সহজ সমাধি? চৈতন্য-সমাধি? পূর্ণ সমাহিতি ও পূর্ণ জাগ্রতির শুভ-সমন্বয়ই কি বর্ত্তমানের যুগধর্ম্ম? আর, তাই-ই কি তিনি দেখাচ্ছেন নিজ জীবনে? সেইজন্যই কি তাঁকে পেয়ে মানুষের এত আনন্দ, এত আরাম, এত আশ্বাস? নইলে, তাঁর সান্নিধ্যলাভের জন্য কেন এই দুর্নিবার অনির্ব্বাণ ক্ষুধা মানুষের?

হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এসেছেন একটি যুবক। ছুটে এসেছেন কলকাতা থেকে। একটা কারখানায় কাজ করেন তিনি। এসে তাসুর সামনে প্রণাম করলেন তিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর চকিতে পাশ ফিরে উত্তরাস্য হ'য়ে ব'সে সুধামধুর কণ্ঠে বললেন—কী রে, কী খবর? অমন উসকো-খুসকো দেখাচ্ছে কেন তোকে? ভাল আছিস তো?

যুবক—আমরা কারখানার শ্রমিকরা আজ চার দিন হ'লো ধর্ম্মঘট করেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেন রে?

যুবক—কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের দাবী-দাওয়ার দিকে কানই দেয় না, তাই ধর্ম্মঘট করেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এতে লাভ কী তোদের?

যুবক—কারখানার লোকসান হ'লে কর্ত্তারা তখন আমাদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারখানার যদি লোকসান হয়, তা'তে তোদের লাভ কোথায়? আর, তোদের বাদ দিয়ে একেবারে নতুন লোক যদি তারা নেয়, তখন তোরা করবি কী? দেশে কি বেকার লোকের অভাব আছে যে তোমরা ছাড়া লোক জুটবে না?

যুবক—অন্য লোক যারা ওখানে কাজ নিতে যাবে, আমরা তাদের শাসাব, ভয় দেখাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ তো ভাল বুদ্ধি দেখছি! হাগবও না, পথও ছেড়ে দেব না। মালিকের কী দোষগুণ তা' নিয়ে আমি আলোচনা করছি না এবং সে যে নির্ভুল এ কথাও আমি বলি না। কিন্তু আমার মনে কয়েকটা প্রশ্ন জাগছে।

যুবক—বলুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ কারখানার শ্রমিক হওয়ার জন্য মালিক কি তোমাদের বাধ্য করেছিল?

যুবক—তা' করবে কেন? আমরাই কাজ খুঁজছিলাম, কাজ পেয়ে ওখানে ঢুকেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মালিকের সঙ্গে মাইনে ইত্যাদির যে সর্ত্ত ছিল, যে সর্ত্তে তোমরা ঢুকেছিলে, সে সর্ত্ত কি মালিক পূরণ করছে না?

যুবক—তা' যে করছে না, তা' নয়। কিন্তু যুদ্ধের বাজারে কোম্পানী লাল হ'য়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের মাগ্‌গী ভাতা ইত্যাদি যা' দেওয়ার তা' দিচ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে তোমরা যেটা চাচ্ছ সেটা তো দয়া। দাবী-দাবী বলছ কেন?

যুবক—দয়া কিসের? আমরা খেটে-পিটে মাল তৈরী করি ব'লে তো মালিকের এত ফুটানি।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঊরুর উপর কোলবালিসটি রেখে তার উপর ভর দিয়ে ঝুঁকে ব'সে হাত নেড়ে বলতে লাগলেন—আমি তো বলি, মালিক যে তার কারখানায় তোমাদের কাজ দিয়েছে, সেইটেই দয়া। পরের কারখানায় না খেটে পেটের ভাত রোজগারের মুরোদ যদি তোমাদের থাকতো, তাহ'লে তোমরা সেখানে ঢুকতে যেতে না। সে যে দয়া ক'রে তোমাদের কাজ দিয়েছে, তা'তেই তোমাদের যাহোক ক'রে পেট চলছে। পেট চলার ব্যবস্থা যে ক'রে দিয়েছে, এখন তার

মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গতে না পারলে হবে কেন?

যুবক—পেট চলার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে বলছেন, কিন্তু সে তো তার নিজের গরজে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের গরজেই হোক, আর যাই হোক, সে তোমাদের দ্বারস্থ হয়নি পরিশ্রম কিনবার জন্য, তোমরা তার দ্বারস্থ হয়েছিলে পরিশ্রম বেচবার জন্য। সে তোমাদের পরিশ্রম কিনে তোমাদের বাঁচার পথ ক'রে দিয়েছে।

যুবক—তা'হলে কি আপনি বলতে চান, শ্রমিক ব'লে আমাদের মানুষের মতো বাঁচবার অধিকার নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার যোগ্যতা-অনুযায়ী বাঁচবার অধিকার তোমার আছে বৈ কি? তোমার যোগ্যতা যদি থাকে ৫ পয়সার, অথচ ৫ টাকার যোগ্যতা যার আছে, তার সঙ্গে তাল ঠুকে যদি চলতে চাও, তাহ'লে চুরি, ডাকাতি বা জুলুম ক'রে তা' করতে হবে। চুরি, ডাকাতি বা জুলুমকে যদি তুমি গালভরা দার্শনিক ব্যাখ্যা দাও, তাহ'লেই তার স্বরূপ বদলে যায় না।

যুবক—এখন এই যোগ্যতার মাপকাঠি কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের বাঁচা-বাড়ার উপযোগী পোষণ-দানের ক্ষমতা যার যেমন, তার যোগ্যতাও তেমন।

যুবক—সেদিক দিয়ে আমার তো মনে হয়, মালিকদের থেকে আমাদের যোগ্যতা ঢের বেশী। আমরা অন্ততঃ শারীরিক পরিশ্রম করতে পারি, তাদের কোন ক্ষমতাই নেই, কেবল পারেন বিলাসিতা করতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারখানাটা চালু করতে ও চালু রাখতে যতটুকু যোগ্যতা দরকার, তা' তাদের আছেই। অতোখানি যোগ্যতা থাকলে তোমরাও শ্রমিক না হ'য়ে এক-একজন মালিক হ'য়ে দাঁড়াতে।

যুবক—পয়সার জোর থাকলে মানুষ সব পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যোগ্যতার জোর না থাকলে পয়সার জোর আসে কী ক'রে? অবশ্য, ফাঁকি দিয়ে যে কেউ-কেউ টাকার মালিক না হয়, তা' নয়। কিন্তু সে-টাকাও তারা টিকিয়ে রাখতে পারে না, বা ক্রমবর্দ্ধমান ক'রে তুলতে পারে না, যদি যোগ্যতা না থাকে।

যুবক—বাবার টাকায় যারা বাহাদুরী করে তাদের যোগ্যতাটা কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কৃতী পিতার সন্তান হওয়াটাই একটা যোগ্যতা। এর পিছনেও জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল লাগে, যোগ্যতা লাগে। আবার, সন্তান উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার যোগ্যতার খানিকটা পেয়েই থাকে, অবশ্য যদি বিবাহে কোন গোলমাল না ঘটে থাকে। কিন্তু জন্মগতভাবে যে যাই পাক না কেন, সে যদি অনুশীলন না করে, তাহ'লে তার ক্ষমতা বাড়ে না।

যুবক—তাহ'লে কি ধর্ম্মঘট আপনি পছন্দ করেন না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার উপর যদি কেউ ধর্ম্মঘট করে, তাহ'লে তুমি পছন্দ কর কিনা?

যুবক—কথাটা বুঝতে পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, তোমার স্ত্রী তোমাকে রান্না ক'রে দেয়, তুমি তার কোন চাহিদা পূরণ করতে না পারার দরুণ যদি সে ধর্ম্মঘট করে, অর্থাৎ রান্না করা বন্ধ ক'রে দেয়, তাহ'লে তোমার কেমন লাগে?

যুবক—আমার আয়-উপার্জ্জনের প্রতি লক্ষ্য না রেখে সে যদি কোন আব্দার ধরে, তাহ'লে আমি তা' পূরণ করব কেমন ক'রে? তেমন অবস্থায় আমি যদি তার চাহিদা পূরণ করতে না পারি, তাহ'লে তো আমার দোষ নয়, বরং সেটা তারই দোষ। তার উপর আবার যদি রান্না বন্ধ ক'রে দেয়, সেটা তো আরো দোষ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, টাকা-পয়সা সংক্রান্ত কোন চাহিদা যদি তার না থাকে, সে যদি তোমার কাছ থেকে মাত্র ভাল ব্যবহারটুকু চায়, আর, তাই যদি না পায়, এবং তার জন্য যদি রান্না বন্ধ ক'রে দেয়, তাহ'লে কেমন হয়?

যুবক—ওতে তো মেজাজ আরো খারাপ হ'য়ে যাবে, ভাল ব্যবহার যতটুকু পেত, তাও পাবে না। কিন্তু মালিকের ক্ষেত্রে তো অন্য কথা, আমাদের খাটিয়ে সে অজস্র পাচ্ছে, তার থেকে সামান্য কিছু দিলেই তো আমরা খুশি, তার তা' দেওয়া তো কঠিন কিছু নয়, নিজের কোন ক্ষতি না ক'রেই দিতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি তো নিজের কোন ক্ষতি না ক'রেই তোমার স্ত্রীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে পার।

যুবক—সব সময় কি মন-মেজাজ ঠিক থাকে নাকি? এক সংসারে চলতে গেলে কোন-কোন সময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও এক-আধটা খারাপ ব্যবহার হ'য়ে যায়, আর তার জন্য রান্না বন্ধ ক'রে দেবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মালিক-শ্রমিকের বেলায় ব্যাপারটা এইভাবে ভাব না কেন? মালিক হয়তো অনেকখানি সুযোগ-সুবিধা তোমাদের দিয়েছে, কোন সময় হয়তো পারেনি এবং সেটা হয়তো তার আর্থিক অসামর্থ্যের দরুন নয়, মানসিক অসঙ্গতির দরুন। ধরলাম, তাই যদি হয়, তবে তার প্রতিকার কী ধর্ম্মঘট? তোমার মানসিক অসঙ্গতি-প্রসূত দুর্ব্যবহারের দরুন, তোমার স্ত্রী যদি তোমার প্রতি তার কর্ত্তব্য না করে, সেখানে তো তুমি আরো চ'টে যাও, আর এক্ষেত্রে কী তোমাদের এই বেদরদী রকমে মালিকের মনটা হঠাৎ খুব প্রসন্ন হ'য়ে উঠবে? আর, ধর্ম্মঘট যদি কর, তাহ'লে নিজেদের কর্ম্মশক্তিকেই তো নষ্ট করতে থাকবে, তা'তে লাভ কী? আমি বলি টাকার উপর লোভ না ক'রে মানুষের উপর লোভ কর। মালিককে ভালবাস, মালিকের ভাল যা'তে হয় তাই কর। সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধির দরুন শ্রমিক যদি মালিকের স্বার্থকে নিজের স্বার্থ ব'লে মনে করতে না পারে

এবং মালিক যদি শ্রমিকের স্বার্থকে নিজের স্বার্থ ক'রে নিতে না পারে, তবে সেটা উভয়ের পক্ষেই দোষণীয়। যা'তে পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্বার্থান্বিত হ'য়ে ওঠে, প্রত্যেকের মধ্যে সেই মানসিকতা যা'তে গজায়, তেমনতর যাজন চালাও। সৎসঙ্গী হিসাবে তোমার কাজ হ'লো সেই সামঞ্জস্যবিধান।

যুবক—আমার কথা কে শুনবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার যদি কোন হীন স্বার্থবুদ্ধি না থাকে, সহকর্ম্মী এবং মালিক সকলের প্রতি শুভেচ্ছা নিয়ে তুমি যদি চেষ্টা কর, ঠিক পারবে। ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধি যদি থাকে, তবে পারবে না এমন কাজ নেই। শ্রমিক হোক, মালিক হোক, প্রজা হোক, রাজা হোক, তখনই তারা ভুল করে, যখনই তারা ইষ্টনীতি থেকে বিচ্যুত হয়। তোমাদের কাজ হ'লো মানুষকে এই বিচ্যুতির সুযোগ না দেওয়া। এ বাদ দিয়ে দলবিশেষকে যতই ক্ষ্যাপাও না কেন, তা'তে সমস্যার সমাধান হবে না। শুনেছি, কোন-কোন শ্রমিকনেতা ধর্ম্মঘট বাধিয়ে বেশ দু'পয়সা ক'রে নেয়।

যুবক—তাহ'লে কী ধর্ম্মঘট কখনই করা উচিত নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রমিকরা যদি কখনও ধর্ম্মঘট করে বা ধর্ম্মঘট করবার ভয় দেখায়, তবে তা' নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জন্য করবে না, করবে বহুর স্বার্থের জন্য। মালিক হয়তো বহু টাকা লাভ করেছে একবার, সবরকম খরচ-খরচা, ইনকাম-ট্যাক্স ইত্যাদি বাদ দিয়েও তার বহু আছে, তাকে হয়তো ধরলো জনসাধারণের জীবিকা, শিক্ষা বা স্বাস্থ্যোন্নতিমূলক স্থায়ী কোন ব্যবস্থা ক'রে দিতে। সুবিধা ও সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও অর্থগৃধ্নুতার দরুন মালিক যদি তা' করতে অস্বীকার করে এবং তেমন ক্ষেত্রে শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে যদি বলে, 'আমরা নিজেদের জন্য কিছুই চাই না, আমরা কষ্টেসৃষ্টে যেভাবে চলছি সেই-ভাবে চলব, কিন্তু সাধারণের সুবিধার জন্য আপনার এটা করতেই হবে, তা' যদি দয়া ক'রে না করেন, তাহ'লে আপনার কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আগের মতো আন্তরিক সহযোগিতা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।' তাহ'লে সেটা দোষের কিছু হয় না। এমন-কি কল্যাণবুদ্ধি নিয়ে, অমনতর ক্ষেত্রে মালিককে সৎকাজে, সদ্ব্যয়ে বাধ্য করার জন্য যদি বাস্তবে ধর্ম্মঘটও করে, তা'ও দোষণীয় নয়। তবে যে-কোন ক্ষেত্রে ধর্ম্মঘট যত না ক'রে পারা যায়, ততই ভাল। ধর্ম্মঘট যদি করতে হয়, তবে তা' অধর্ম্মের নিরোধ এবং ধর্ম্ম ও কৃষ্টির প্রতিষ্ঠার জন্য। দেশের বৈশ্যশক্তি তো আজ ব্রাহ্মণ্য-শক্তিকে মান্য করে না, বরং দায়ে প'ড়ে রাজশক্তি ও শূদ্রশক্তিকে (শ্রমশক্তি) খাতির ক'রে চলে, অন্ততঃ এই শূদ্রশক্তিও যদি বৈশ্যশক্তিকে ধর্ম্ম ও কৃষ্টি-পরিপোষণার্থে দানে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে, সেও একটা মস্ত লাভ। এতে সবারই কল্যাণ হবে। নইলে, বৈশ্যশক্তি ও শূদ্রশক্তির যদি বিত্ত বাড়ে অথচ চিত্তের দৈন্য না ঘোচে, তাহ'লে কী

বিত্ত তার অনর্থই ঘটাবে, কদর্য্য গ্লানিরই সৃষ্টি ক'রে তুলবে। তোমাদের এই আন্দোলনকে যত বাড়িয়ে তুলতে পারবে, ততই মানুষের চিত্ত-সম্পদ ও চরিত্র-সম্পদ বেড়ে যাবার সম্ভাবনা।

বেলা এখন সাড়ে আটটা। আশ্রম-প্রাঙ্গণ রোদে ছেয়ে গেছে। এখানে-ওখানে এক-এক দঙ্গল মিলে শীতের সকালে মিষ্ট রৌদ্র উপভোগ করছে। ডিস্পেন্সারী, ফিলান্থ্রপি অফিস, তরকারীর বাজার, কলতলা সর্ব্বত্রই এখন কর্ম্মতৎপরতা। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছেও অনেকে জমায়েৎ হয়েছেন। এই দিব্য পরিবেশের মাধুর্য্যটুকু সব হৃদয় দিয়ে আহরণ করছেন। বকুল, বাবলা, বনঝাউ ও সোনালের ডালে-ডালে পাখীগুলি নেচে-নেচে খেলা করছে, আনন্দে কলরব করছে। গরু-ছাগলগুলিও স্বচ্ছন্দ মনে চ'রে বেড়াচ্ছে মাঠে। কয়েকটা কুকুর রোদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঊর্দ্ধে নির্ম্মল, নীল আকাশ, চারিদিকে যেন শান্তি-সমীরণ বইছে। সকলেই তাঁর সঙ্গসুখ-উপভোগে রত। তনুমনপ্রাণ ডুবিয়ে দিয়েছে তাঁর সান্নিধ্যপূত এই সুধাস্রোতে। পরিতৃপ্তি ও পরিপূর্ণতার রসঘন ছন্দে লীলায়িত তাঁর দেবদেহ, অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে অমিয়-লাবণ্যের ললিত উল্লাস, তাই যতই দেখছে ততই বুক ভ'রে উঠছে অনির্ব্বচনীয় আনন্দে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পাশ ফিরে ব'সে জিজ্ঞাসা করলেন—আজ কত তারিখ রে?

বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য)—আজ ৫ই জানুয়ারী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা বছর পিছনে ফেলে এসে আবার নূতন বছরে পা দিলাম, তা'ও পাঁচ দিন হ'য়ে গেল। এইভাবে দেখতে-দেখতে ৩৬৫ দিন কেটে যাবে। এই বছর হ'য়ে যাবে পুরোণ বছর, আবার নূতন বছর সুরু হবে। কালের পরিক্রমা কাউকে খাতির করে না। বুদ্ধিমান সেই যে এই সময়কে বিফলে যেতে না দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার বললেন—রোদে যেয়ে বসি, কী বলিস?

সকলে বললেন—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর বেরিয়ে বেশী দূরে আর গেলেন না, শ্রীশ্রীমায়ের কুটিরের পাশে একটা চেয়ারে বসলেন। গাড়ু-গামছা ইত্যাদি ওখানে নিয়ে আসা হ'লো।

শ্রীশদা (রায়চৌধুরী)—শরীরের পুষ্টির জন্য কোন্ খাদ্য আপনি সব-চাইতে ভাল মনে করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, হবিষ্যান্নের মতো পুষ্টিকর খাদ্য কমই আছে। ওতে আতপ চাল, কাঁচকলা, ডালবাটা, তিলবাটা, ঘি, দুধ, কলা ইত্যাদি যে-সব জিনিস খাওয়া হয়, আমার মনে হয়, তা'তে আর বিশেষ কোন deficiency (খাঁকতি) থাকে না, তবে টাটকা শাক-সব্জী ও ফলও কিছু-কিছু খাওয়া ভাল, অবশ্য ব্রত হিসাবে হবিষ্য যখন করা হয় তখন নয়। এ-সব বলছি উচ্চাঙ্গের কথা। আমার মনে হয়, মানুষ কঠোর পরিশ্রম যদি করে, নাম যদি ঠিকমতো

করে, মানসিক শান্তি যদি থাকে, তবে স্রেফ ডাল-ভাত খেয়ে হজম করতে পারলে তা' থেকেই যথেষ্ট পুষ্টি সংগ্রহ করতে পারে। আর, মানুষ যে দামী-দামী টনিক ইত্যাদি খায়, আমার মনে হয়, পঞ্চামৃত (দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, চিনির মিশ্রণ) খেয়ে যদি হজম করতে পারে, তা'তে অনেক টনিকের থেকে বেশী কাজ দেয়। জিনিসগুলি যদি খাঁটি হয়, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হজম হবারই কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর শৈলমাকে দেখে হেসে-হেসে মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে বলছেন—বুক্‌কুলু! বুক্‌কুলু!

শৈলমা একগাল হেসে ফেললেন। আহ্লাদে ডগমগ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই নৌকা-বাইচ দেখিছিস?

শৈলমা—অল্প-সল্প।

শ্রীশদা প্রভৃতি তখন গল্প করতে লাগলেন, পূর্ব্ব বঙ্গে নৌকা-বাইচ উপলক্ষে কত আমোদ-আনন্দ হয়, সমস্ত লোক কত মেতে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুভ-অনুশীলনমূলক স্ফূর্ত্তির প্রবর্ত্তনা যত করা যায়, ততই ভাল। ওতে মানুষের instinct (সহজাত সংস্কার)-গুলি nurture (পোষণ) পায়।...........নষ্টচন্দ্রার দিন যে চুরি করে, এ প্রথাও আমার ভাল ব'লে মনে হয়। গৃহস্থ সজাগ রয়েছে, তা' সত্ত্বেও তার দৃষ্টি এড়িয়ে তার বাড়ীর বাতাবী, শসা, নারকেল, কলা কি আর পাঁচটা জিনিস নিয়ে আসা কম চাতুর্য্যের কথা নয়। ধর, তুমি হয়তো যুদ্ধে গেছ, সেখানে শত্রু-শিবিরে ঢুকে সুকৌশলে তোমার কতকগুলি কাজ বাগিয়ে নিতে হবে। ঘরোয়াভাবে এইগুলি যদি তুমি পার, ওগুলি পারাও তোমার কঠিন হবে না। জীবনের এমনি আছে একটা সহজ চলা আর একটা আছে বিপদ, আপদ, দুর্দ্দশা, দৈবদুর্ব্বিপাক, শত্রুতা, ষড়যন্ত্র, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, যুদ্ধবিগ্রহ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ইত্যাদি emergency (জরুরী অবস্থা)-র মধ্যে চলা। কার যে কখন কোন্ অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে তার কিছুই ঠিক নেই। সেইজন্য প্রস্তুত থাকা লাগে সব অবস্থার জন্য, যা'তে আকস্মিক কোন দুরবস্থার মধ্যে প'ড়ে আমরা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে না যাই। যে-শিক্ষা আমাদের শুধু সুসময় ও সুখের জন্য প্রস্তুত করে, অথচ দুঃসময় ও দুঃখের জন্য প্রস্তুত করে না, সে-শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নয়। শিক্ষা প্রস্তুত ক'রে তুলবে আমাদের সমগ্র বাস্তবতার জন্য, সেই বাস্তবতা কোন ধরাবাঁধা পথে চলে না, তার মধ্যে থাকে অনেক বৈচিত্র্য, অনেক জটিলতা, অনেক ভালমন্দ সম্ভাবনা। তার সবখানির জন্য তৈরী হ'তে হয়।...........আমার পড়াশুনোর জীবনে আমি যে কঠোর দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি, তা' আমাকে অনেকখানি ঠিক ক'রে দিয়ে গেছে। অতোখানি চরম অবস্থার মধ্যে না পড়লে মানুষের কষ্ট আজ যেমন ক'রে বুঝতে পারি, তা' বোধ হয় পারতাম না। আমার নাম অনুকূল বটে, কিন্তু জীবনের প্রায় প্রতি পদক্ষেপে আমাকে প্রতি-

কূলতার পাহাড় কেটে এগোতে হয়েছে। আমার জীবনের একমাত্র নেশা ছিল মাকে খুশি করা। আমার বুদ্ধি-বিবেচনা-শক্তিমতো বরাবর সেই চেষ্টা করেছি। আমার লোভ ছিল, মা'র কাছ থেকে বাহবা পাওয়ার, তাঁর আদর পাবার। কিন্তু মা ছিলেন আমার প্রতি বড় কড়া, তাঁর শাসন ও ভর্ৎসনা পেয়েছি অজস্র, তাঁর সোহাগের জন্য ক্ষুধা থাকলেও তেমন পাইনি তা'। তাহ'লে কী হবে? মা ছাড়া যে আমার অচল। মা যতই অসন্তুষ্ট হউন, রুষ্ট হউন, কেবল এৎফাঁক করতাম, কেমন ক'রে মাকে তুষ্ট করব। ঐ ছিল আমার ধান্ধা। প্রতিকূল অবস্থায় হাল ছেড়ে দেবার বুদ্ধি আমার কোনকালে হয় না। তখন আমার গোঁ চেতে যায়, কেমন ক'রে সেটাকে আয়ত্তে আনব। ছেলেবেলায় পাড়ার সকলেই ছিল আমার অভিভাবক। খামকা কতোজনে কান চেপে ধ'রে দুটো চড় দিয়ে ছেড়ে দিত। সেখানে দোষ হয়তো আমার কিছুই নেই। অন্য কারও দোষের কথা যে ক'ব, তা'ও আমার কখনও মন চাইত না। অনেকে আজেবাজে কথা মা'র কাছে এসে লাগাত। মাও চালাতেন একচোট। এইরকম যতই ঘটুক, আমি কখনও হতাশ হতাম না, নিরাশ হতাম না। ভাবতাম, আমি আমাকে এমন ক'রে তৈরী করব, এমনভাবে চলব, যা'তে এর অবকাশ না ঘটে। স্কুলে মাষ্টারদের কাছে মারও কম খাইনি। একবার এক আর এক দুই হয় কী ক'রে এই কথা জিজ্ঞাসা ক'রে তো প্রাণ যায় আর কি? মাষ্টার মশায় ভাবলেন—আমি তাঁকে ঠকাবার জন্য না-বোঝার ভান করছি, কিন্তু আমি যে বুঝতিছি না সেটা কেমন ক'রে বোঝাব। আমার কাছে সমস্যা দাঁড়ালো, কোন দুটো জিনিস তো একরকম দেখি না। এমন অবস্থায় এক আর এক দুটো এক হ'লো, এ বরং বলা যায়, কিন্তু দুই হ'লো এ-কথা বলি কী ক'রে? আমার কথা কে শোনে? মারের পর মার। দোয়াড়ে মার। কলকাতায় পড়ার সময় দিনের পর দিন কলের জল খেয়ে, ফুটপাথে শুয়ে কতদিন কেটে গেছে। ছুটিতে বাড়ী এসে যে দুদিন থাকব, ভালমন্দ খাব, তারও উপায় ছিল না। পাড়ার লোকে বলতো, বউয়ের টানে আসে, বেশী দিন বাড়ী থাকলে পড়াশুনা নষ্ট হ'য়ে যাবে। মা-ও ব্যস্ত হ'য়ে পড়তেন। ফিরে যেতাম কলকাতায়। ডাক্তারী যখন সুরু করলাম, স্থানীয় ডাক্তাররা প্রাণপণ শত্রুতা করছে। বিধিমতো চিকিৎসা ক'রে রোগ সারলেও তারা বলতো—আমি তুক ক'রে রোগ সারিয়েছি। বসন্ত চৌধুরী প্রভৃতি ফাঁক পেলেই মানুষের সামনে অপমান ক'রে ছেড়ে দিতেন। তাদের ঐ অপমান আমি গায় মাখতাম না। যে আমার বিরুদ্ধে যতই বলুক, কারও বিরুদ্ধে কিছু বলবার মতো আমার কখনও মন হ'তো না। কারও বিরুদ্ধে বলব কী? কোন রোগী হাতে নিলে তাকে ভাল করবার জন্য প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করতো, সেই ধান্ধাতেই আমি অস্থির। বার-বার রোগীর বাড়ী গেলে, পাছে রোগীর বাড়ীর লোক কিছু মনে করে, সেইজন্য রোগীর বাড়ীর কাছ দিয়ে ঘুরতাম, ভাবতাম—একবার ডাকলে

আর একবার যেয়ে রোগীর অবস্থাটা দেখে আসি, তাকে আর একবার সাহস-ভরসা দিয়ে আসি। টাকার জন্য আমি কোন দিন ডাক্তারি করিনি, কিন্তু টাকা আসতো খুব। অবস্থা খারাপ দেখলে তার কাছ থেকে টাকা নিতাম না, বরং ওষুধ-পথ্যের জন্য গাঁটের থেকে টাকা খরচ করতাম। এ করতাম নিজের স্বস্তিরই গরজে। পরে এমন হ'লো, যারা আমার নিন্দা করতো, মানুষ তাদের তাড়া করতো। আশ্রমের গোড়ার আমল থেকে এ পর্য্যন্ত বাধা কম পাইনি। শক্তি-মন্দির তো ঐ তালেই আছে। তবে এ-গুলিতে আমার তত মন খারাপ হয় না, যত মন খারাপ হয় আপনাদের বেচাল দেখলে। আমি আদেখ্‌লে মতো আছি, চিরদিন আমি ভালবাসার কাঙ্গাল। ভালবাসার নামে যেখানে দেখি ব্যবসাদারী, কাপট্য, সেখানে আমার মন খিঁচড়ে যায়। সত্যিকার ভালবাসা যেখানে সেখানেই থাকে প্রিয়ের মনোমতো চলন, চিন্তা, ব্যবহার, আত্মনিয়ন্ত্রণ। আপনারা অনেকেই আমার জন্য ঢের করেন, কিন্তু নিজেদের প্রবৃত্তির গায় হাত দেন না। আমার জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ ও প্রবৃত্তিকে কতখানি অতিক্রম করতে পারেন, সেইটে হ'লো ভালবাসার মাপকাঠি। কিন্তু অনেকেরই দেখি অহংকার, অভিমান বা স্বার্থে এতটুকু চোট লাগলে পীরিত চ'টে যাওয়ার মতো হয়। তাই, আমার হিসেব ক'রে আপনাদের তোয়াজ ক'রে চলতে হয়। এতে কি সুখ হয়? না, আপনাদেরই কল্যাণ হয় এতে? তবে আমি বেহায়া, নাছোড়বান্দা। যে যাই করুক, তার ভাল না করতে পারলে আমার নিস্তার নেই। এতে আমার নিজের উপর দিয়ে অনেকখানি চোট যায়। তবে আমার শান্তি ও সান্ত্বনা এইটুকু যে, আপনাদের মধ্যে কিছু-কিছু মানুষ ভালবাসার টানে সত্যিই adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হ'য়ে উঠছে। সেই মানুষগুলিকে দেখবেন—তারা পরিবেশের সঙ্গেও শুভ সঙ্গতি নিয়ে চলে—অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ-রফা না ক'রেও। যারা একটু পথে দাঁড়ায়, তারা সবারই সত্তাপোষণী হ'য়ে ওঠে, দরকচা-মারা যেগুলি সেগুলি কেবল বেগ দিয়ে মারে।

২২শে পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৪৮ (ইং ৬।১।৪২)

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আনন্দের হাট বসেছে। দুপুরে ঘুম থেকে ওঠার পর তিনি মাতৃ-মন্দিরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় এসে বসেছেন। ভক্তবৃন্দ তাঁর তক্তপোষের চারিদিকে ঘিরে বসেছেন। আনন্দময়ের সান্নিধ্যে সকলেই আনন্দিত, আর ভক্তগণের উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীঠাকুরও মহাপ্রীত।

নিজের থেকেই বলছেন—আপনারা সব আছেন এখানে, বেশ আছি, যখন মনে হয় আপনাদের অনেকের যাবার সময় হ'লো, তখন বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ ক'রে ওঠে। এও বুঝি, কাজের জন্য আপনাদের তো বাইরে যাওয়া লাগবেই, কিন্তু কেন জানি মন মানে না। এ আমার কেমন স্বভাব বলেন তো?

সকলেই চুপ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বলছেন—আমি নিজেকে যেন কারও থেকে আলাদা ক'রে ভাবতে পারি না। মনে হয়, আমি যেমন আমার মধ্যে আছি, তেমনি সবার মধ্যে আছি, সবই যেন আমি, সবই যেন আমার, এই যে বন্ধন তা' থেকে মুক্তি পেতেও মন চায় না। শুধু ভাবি, সকলকে কেমন ক'রে সুস্থ রাখা যায়, সুখী করা যায়, উন্নতিপরায়ণ ক'রে তোলা যায়। এই স্বার্থের ধান্ধায় দিনরাত উদ্‌ব্যস্ত হ'য়ে চলি। পরকালের কথাও যে একটু ভাবব তারও আমার অবকাশ নেই।

কুমারখালির-মা—সব কালের মালিক যিনি, তাঁর আর পরকালের ভাবনা ভাবতে হবে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—ইহকালের ভাবনা ঠিকমতো ভাবলে পরকালের ভাবনা কারও ভাবা লাগে না। যতটুকু কাল আমরা হাতে পাই, ততটুকু যদি তাঁর সেবায় লাগাতে পারি, তাহ'লেই তো কাম ফর্সা। তাঁর সেবা কিন্তু পারিপার্শ্বিককে বাদ দিয়ে নয়। প্রত্যেকের বাঁচা-বাড়ার সাহায্য যতটা করতে পারবে—নিজে ইষ্টনিষ্ঠ থেকে ও তাকে ইষ্টনিষ্ঠ ক'রে—ততই জানবে তাঁর সেবা করা হ'লো। সেই সেবায় তিনি তুষ্ট হন। নচেৎ তাঁর পটে ফুল-বিল্বপত্র যতই দেও না কেন, কিংবা পুণ্যলোভে বা আত্মপ্রতিষ্ঠার লোভে ইষ্টের গাড়ু-গামছা যতই বও না কেন, তা'তে কিন্তু তাঁর সন্তোষ উৎপাদন হবে না। আমি দেখেছি, আমাকে সেবা করবার জন্য অনেক সময় কাড়াকাড়ি প'ড়ে যায়। একজনকে বললাম পিকদানীটা ধরতে, সে আসার আগে আর তিনজন হয়তো এগিয়ে আসল। সেটা আমার পছন্দসই কিনা, তাও তারা ভেবে দেখে না। আবার, তাদের কাউকে যখন সত্যিই প্রয়োজন তখন হয়তো তাদের টিকিটিও দেখা যাবে না। তারা তখন নিজের ধান্ধায় ব্যস্ত। ফলকথা, আমার সেবা যে তারা করতে চায়, তা' নয়। এক-একজন এক-এক খেয়াল নিয়ে অবসর-বিনোদন করে। ও তাদের একটা খেয়াল বিশেষ। আমার সুখ-সুবিধা লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য, নিজেদের খেয়াল চরিতার্থ করা। জান যে তোমরা সকলের খোঁজ-খবর নিলে, সেবা-যত্ন করলে আমি খুশি হই, কিন্তু আমার কাছে এসে হয়তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে থাক, অথচ পাশের বাড়ীর একটা রোগীর খবর নেবার অবকাশ হয় না তোমাদের। এ-সবগুলি আমি লক্ষ্য ক'রে দেখি, কিছুই আমার চোখ এড়ায় না। আবার অনেকে আছে, সেবার অছিলায় প্রবৃত্তির ঘোরে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু আমার এদিক দিয়ে মাড়ায় না। এক-এক জনের এক-এক ব্যাধি। মোটপর, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখি—আমি যা' চাই বা কই, সেটা ছাড়া আর সব পারে, আর সেটা করলেও তার মধ্যে নিজের প্রবৃত্তি ও খেয়ালের এমন কতকগুলি খাদ মিশিয়ে রাখে যে, তার মধ্য-দিয়ে চরিত্রের গলদ বাড়ে বই কমে না, ফলে দক্ষতা ও কৃতকার্য্যতার মুখ তারা দেখতে পায় না।

পরে আবার দোষ দেয়—ঠাকুরের কথামতো তো এই ক'রে দেখলাম, তা'তে তো এই হ'লো। আমি ভাবি—ঠাকুরের দোষ না হয় দিলি, কিন্তু তা'তে তোর কী হ'লো? তাই মানুষের ভিতরে ফাঁকি-বুদ্ধি থাকলে, তাদের সঙ্গে পারা মুশকিল। তবে কর্ম্মঠ স্বভাব যাদের, করার পথে তাদের স্বেচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি যাই হোক না কেন, তাদের সংশোধনের সম্ভাবনা বেশী থাকে, অবশ্য যদি ঐ সঙ্গে নাম, ধ্যান ও আত্মবিশ্লেষণের অভ্যাসটা বজায় থাকে। যারা অলস, নিজেরা কিছু করে না, অথচ যারা করে, ক্রমাগত তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা ক'রে বেড়ায়, তাদের জঞ্জাল ক্রমে-ক্রমে ভারী হ'তে থাকে। তাদের নিজেদের দোষ যা, তা' আবার গুণিত হয় দোষদর্শনের ভিতর-দিয়ে। তারা কর্ম্মক্ষেত্রে নামলে অন্ততঃ টের পায়, তাদের মধ্যে গলদ কতখানি। তাই গীতায় আছে—'সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ, সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।' (হে কুন্তীপুত্র! দোষযুক্ত হ'লেও সহজাত কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ, অগ্নি যেমন ধূমে আচ্ছন্ন হয়, তেমনি সকল কর্ম্মই দোষযুক্ত হয়।)

আশু (ভট্টাচার্য্য)—আমাদের প্রকৃতি দেখে আপনার রাগ হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাগ ক'রে যাব কোথায়? ছাওয়ালের বাবা তো হোসনি, তাহ'লি কিছুটা বুঝতিস। তবে দুঃখ হয়, আপসোস হয়। আমার কথা শোনে না ব'লে যে দুঃখ হয়, তা' নয়, আমার কথা না শুনে দুঃখ পাবে ব'লে দুঃখ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদাকে বললেন—আমার নাড়ীটা দেখ্ তো!

প্যারীদা ঘড়ি ধ'রে দেখে বললেন—Pulse rate (নাড়ীর গতি) একটু বেড়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কত?

প্যারীদা—আপনার normal (স্বাভাবিক) যা', তা' থেকে ৫।৭ বেশী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইটুকু বাড়লো কেন?

প্যারীদা—ও কিছু না। মাঝে-মাঝে এইরকম variation (পার্থক্য) হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা ডাক্তারের কথা হ'লো না। ডাক্তার প্রত্যেকটার কারণ খুঁজে বের করতে চেষ্টা করবে, তবেই সে ভাল ক'রে চিকিৎসা করতে পারবে। আন্দাজে ঢিল মারা অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার।

প্যারীদা—আপনার কাছে যদিও এই কথা বলছি কিন্তু আমি সবটারই কারণ অনুসন্ধান ক'রে থাকি এবং সেইভাবে ওষুধ দিই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লিই ভাল। আমি তোমাকে যত কথা কইছি, সব যদি মনে রেখে কাজে লাগাও, তাহ'লি দেখবা, রোগী আরাম করা কত সহজ হবে। ....এ সম্বন্ধে যখন যা' কই, টুকে রেখো ও মাঝে-মাঝে সেগুলি প'ড়ো।

দাসীর কথা বাসি হ'লি কামে লাগে (হাস্য)।

উপস্থিত অনেকেই হেসে ফেললেন।

একটা গন্ধ পেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর নাক টেনে আশুর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—বল্‌তো কিসের গন্ধ?

আশুভাই উঠে খোঁজ করতে যাচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—উঠতি পারবি না। এই জায়গায় ব'সে ক'।

আশুভাই নাক টানতে লাগলেন, কিন্তু সঠিক ঠাওর করতে না পেরে বললেন—বুঝতে পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর আরো কয়েকজনের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন।

কেউ-কেউ বললেন—কোন গন্ধই তো পাচ্ছি না।

কেউ যখন পারলেন না, শ্রীশ্রীঠাকুর তখন বললেন—পায়রার গু-র গন্ধ ব'লে মনে হ'চ্ছে। ছাদের উপর যেয়ে দেখ্‌ তো পায়রার গু জমেছে নাকি।

তখন কয়েকজনে একসঙ্গে উপরে যেয়ে দেখে এসে বললেন—ওখানে পায়রার গু কিছু জমেছে বটে, কিন্তু একেবারে কাছাকাছি যাওয়ার আগ পর্য্যন্ত তো গন্ধ পাইনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চোখ, কান, নাক, ত্বক, জিহ্বা সবগুলিরই অনুভব-শক্তি বাড়িয়ে তুলতে হয়। তখন দূরদর্শন, দূরশ্রবণ, দূর থেকে ঘ্রাণ পাওয়া ইত্যাদি স্বাভাবিক হ'য়ে উঠবে। এর মধ্যে অলৌকিকত্বের কোন বালাই নেই। ইন্দ্রিয়ের বোধশক্তিই বেড়ে যায়। তাকেই মানুষে কয় অতীন্দ্রিয়। নামধ্যান বেশী ক'রে করলে, আর প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম বোধশক্তি বাড়াতে চেষ্টা করলে এগুলি সহজেই হয়। দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে দূরের একটা জিনিস ভাল ক'রে দেখতে হয়তো চেষ্টা করলে। দেখে যা' মনে হ'লো আবার কাছে গিয়ে হয়তো মিলিয়ে দেখলে। আবার হয়তো আরো দূরের একটা জিনিস দেখলে, সেটা ঐভাবে মিলিয়ে দেখলে। শ্রবণ, ঘ্রাণ ইত্যাদি সম্বন্ধেও ঐভাবে চেষ্টা করতে থাকলে। দেখা, শোনা, শোঁকা একসঙ্গে কত দূরের কতখানি পার, তারও অনুশীলন করতে হয়। এইভাবে অনুশীলন করতে-করতে দেখবে একেবারে তুখোড় হ'য়ে উঠবে। আমার মনে হয়, চোখ বুজে শুধু গায়ের চামড়া স্পর্শ ক'রে সহজেই বলা যায়, লোকটা কে। প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয়ের বোধশক্তি যা'তে বাড়ে, সেই ধরণের নানাপ্রকার খেলাধুলো বের করতে হয়, আর তাই ছেলেপেলেদের মধ্যে চারিয়ে দিতে হয়। বোধ হওয়া চাই সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর, ক্ষিপ্র হ'তে ক্ষিপ্রতর, সমগ্র হ'তে সমগ্রতর, আবার বোধ-অনুপাতিক ঐ বিশেষ স্থলে বিহিত করণীয় যা', সে-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত ও বাস্তব-করণও হওয়া চাই ত্বরিত ও সম্যক্‌। এইসব নিজেরা করতে হয়, মানুষকে দিয়ে করাতে হয়। মানুষকে কঠিন অবস্থার মধ্যে ফেলে দিতে হয়। সেই অবস্থায় সে কী করে, কেমন করে, তা' দেখতে

হয়। নিজের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের শক্তিকে প্রসারিত করার অভ্যাস যার থাকে, তার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাব্যতাকে বিকশিত ক'রে তোলার একটা ঝোঁকও হয়, উদ্ভাবনী বুদ্ধিও তার বেড়ে যায়। কঠিন অবস্থার মধ্যে প'ড়ে কিভাবে কী করতে হবে, তাও তার মাথায় খেলে যায়। আমি ইচ্ছা ক'রেই সেইজন্য এক-এক জনের উপর এক-একটা চাপিয়ে দিই। কাউকে হয়তো একটা কিছু জোগাড় করতে বললাম, সেই জিনিসটার দরকার আমার যতটা থাক বা না থাক, তা' জোগাড় করতে গিয়ে যে-সব প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করতে হবে তাকে, তার মধ্য-দিয়ে তার অনেকখানি বাস্তব শিক্ষা হবে, সেইটেই আমার লাভ। আমি বলি বা না বলি, ক্রমাগত যে আমার জন্য স্বতঃস্বেচ্ছভাবে, স্ফূর্ত্তির বিলাস হিসাবে কঠিন হতে কঠিনতর দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে উদ্‌যাপন করে, সে বেড়েই ওঠে। দুনিয়ায় সেই বুদ্ধিমান যে ইষ্টার্থপূরণী ব্রত হিসাবে নিজের উপর সর্ব্বদা কঠোর চাপ চাপিয়ে রাখে, এর ফলে হয় কি, হাউস ক'রেই সে এত ভার বইতে অভ্যস্ত হ'য়ে থাকে যে, অতি বিরাট প্রয়োজনের ভারও তার কাছে ভার ব'লে মালুম হয় না। অক্লান্ত পরিশ্রমের উপর থেকেও তার মনে হয় যেন মহা আরামে আছে। মহাপ্রলয়েও টিকে থাকবার মতো শক্তি অর্জ্জন করে তারা। তাদের আশ্রয়ে আবার কতো মানুষ বেঁচে যায়। ধর্ম্ম মানে যদি হয় বাঁচা-বাড়া, তবে ধর্ম্মানুশীলনের ব্যাপারে এ-সবের প্রয়োজন আছে।

বেলা তখন আন্দাজ চারটে। আশ্রমের উপর দিয়ে গ্রামের লোক কেউ-কেউ কাশীপুরের হাটে যাচ্ছে। ঝাঁকায় ক'রে লাউ, বেগুন, মূলো, লঙ্কা ইত্যাদি নিয়ে যাচ্ছে বিক্রী করতে। ঝাঁকার এক পাশে আছে দড়িবাঁধা তেলের শিশি। আনাজপত্র বিক্রী ক'রে তেল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে আসবে। মাঠের মধ্যে এখনও বেশ রোদ আছে, তবে রোদের তেজ কমে আসছে। গাছের ছায়া দীর্ঘায়িত হ'য়ে পূব দিকে হেলে পড়েছে। মাঝে-মাঝে একটা দমকা হাওয়া এসে বেণুবন দুলিয়ে দিয়ে একটা গভীর সন-সন শব্দের সৃষ্টি করছে। অশথের শাখায়-শাখায় কাঁপন লেগে ঝর-ঝর ক'রে ঝ'রে পড়ছে জীর্ণ পত্রদল। আশ্রমের সামনের বনঝাউ গাছগুলিতে ব'সে কয়েকটি পাখী ডাকছে, তাদের সুরে বেলা-শেষের তান। কেমন যেন উদাস, করুণ আবহাওয়া চারিদিকে। তায় আবার শীতের দিন। মন ঘরে ফিরে যেতে চায়, যেতে চায় প্রিয়জনের কাছে, যেতে চায় সেখানে যেখানে আছে তার চিরন্তন স্নেহের আশ্রয়। সকলে তাই শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঘিরে আরো নিবিড় হ'য়ে বসে। ক্লান্ত অপরাহ্ণে প্রিয়তমের মধুর সান্নিধ্য মধুরতর মনে হয় ভক্তজনের কাছে। এখান থেকে উঠতে ইচ্ছা করে না কারও। কেবল দুটি নয়ন ভ'রে সাধ মিটিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে তাঁকে, আর শুনতে ইচ্ছা করে তাঁর সর্ব্বদুঃখহরা অমৃত-স্নিগ্ধ বাণী।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবার সুরু করেন—ভক্তির মতো জিনিস আর হ'তে নেই।

শক্তি বল, জ্ঞান বল—সব আসে ও থেকে। শ্রেয়কে আশ্রয় ক'রে যে আন্তরিক টান তাকেই বলে ভক্তি। সন্তানের পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, স্ত্রীর স্বামীভক্তি, শিষ্যের গুরুভক্তি—এর কোনটাই ফেলনা জিনিস নয়। ভক্তির কোঠায় যে একবার পা দিয়েছে, সেই ত'রে যাওয়ার পথে উঠেছে। রামচন্দ্র স্বয়ং ভগবান। তিনি তাঁর সারাটা জীবন দিয়ে দেখালেন—পিতৃভক্তি কাকে বলে। ক্যাসাবিয়াঙ্কার পিতৃভক্তির কথা আজও মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। কেউ-কেউ হয়তো ভাববে, ঐভাবে আত্মবিসর্জ্জন দেওয়া তার বোকামী। কিন্তু যে অক্ষরে-অক্ষরে পিতৃ-আদেশ পালনের জন্য ঠায় দাঁড়িয়ে মরতে পারে, নিজের প্রাণটাকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করতে পারে, তার ভিতরে কতখানি নিষ্ঠার জোর তা' একবার ভেবে দেখতে হবে তো। ঐখানেই তার মহত্ত্ব। অতখানি একাগ্র নিষ্ঠায় মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। তারপর যারাই বড় হয়, তাদের মধ্যেই দেখা যায় মাতৃভক্তি। চাণক্যের কথা শুনেছি, এক জ্যোতিষী এসে নাকি তার সম্বন্ধে তার মাকে বলেছিল যে, তার ছেলে রাজা হবে, কারণ, তার সামনের দাঁত দুটো উঁচু ও বড়। ওটা যেমন সুলক্ষণ তেমনি আবার দুর্লক্ষণও, কারণ, অমনতর দাঁত থাকলে, সে-ছেলে মায়ের দুঃখের কারণ হয়, সে মাতৃভক্ত হ'তে পারে না। এইকথা শুনে বালক মুহূর্ত্তে মনস্থির ক'রে ফেলল, ভাবল—দাঁত দুটো থাকলে যদি রাজা হ'তে হয়, আর রাজা হ'লে যদি মাকে ভুলতে হয়, মায়ের কষ্টের কারণ হ'তে হয়, মাতৃভক্তি থেকে চ্যুত হ'তে হয়, তবে কাজ নেই সে রাজত্ব দিয়ে ও রাজলক্ষণবাহী দাঁত দিয়ে। এই ভেবে মা বাধা দিতে না দিতেই চোখের নিমেষে একটা নোড়া দিয়ে নিজের কাঁচা দাঁত দুটো ভেঙ্গে ফেলল—দর-দর ক'রে রক্ত পড়তে লাগল। মা তো হতভম্ব। এ হেন ছেলে, যে মায়ের খুশির জন্য হাসিমুখে যে-কোন কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে পারে, ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হ'য়ে তারই গলায় পরিয়ে দেন জয়, যশ, প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য্যের মালা। বাঞ্ছিতের সুখকামনায় আত্মসুখ কামনাকে বর্জ্জন করতে পারে যে, প্রকৃতিই সেই শূন্যতাকে ভ'রে দেন পূর্ণতায়।

প্রকাশদাকে (বসু) দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন—কি রে! কী খবর?

প্রকাশদা—যেখানে যেতে বলেছিলেন, সেখানে গিয়েছিলাম, কাজ হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখলি তো? বুদ্ধি ক'রে, সাহস ক'রে মাথা খাটিয়ে কাজ না করলি কি হয়?

প্রকাশদা হেসে মাথা চুলকাতে-চুলকাতে বললেন—ঠাকুর! আমি তো মাথা খাটাইনি, আপনি যা' ব'লেছেন বেকুবের মতো তাই করেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যা' বলি সেইটুকু যথাযথভাবে করতে মাথাটা যতটুকু খাটান লাগে, তাই যে অনেকে পারে না। অনেকে কথাগুলিই ঠিকমতো শুনতে

পায় না, নিজের পেয়ে-বসা ধারণা-অনুযায়ী শোনে, পেয়ে-বসা ধারণা-অনুযায়ী বোঝে। পরে বলে, আপনি তো তাই বলেছিলেন। আবার, কেউ-কেউ এমন নিরেট, তার হয়তো ঝগড়া হয়েছে কারও সঙ্গে, সে এসে আমাকে জানাল, 'এখন কী করব বলেন'। আমি তাকে ব'লে দিলাম, "এইভাবে-এইভাবে তার সঙ্গে কথা ক', ব্যবহার কর্, তাহ'লে ঠিক হ'য়ে যাবে।" সে তাই করল, ক'রে আবার বলল—ঠাকুর আমাকে ব'লে দিয়েছেন, তোমাকে এই কথাগুলি বলতে তাই বললাম। (ব'লেই শ্রীশ্রীঠাকুর একটুখানি হাসলেন।)

অন্যসকলেও হাসতে লাগলেন।

স্বামীভক্তি ও গুরুভক্তি সম্বন্ধে আবার কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাতিব্রত্যের মহিমা অশেষ। তা'তে যোগৈশ্বর্য্য পর্য্যন্ত লাভ হয়। এ-বিষয়ে একটা গল্প আছে খুব সুন্দর। এক ব্রাহ্মণ একদিন একটি গাছতলায় ব'সে বেদপাঠ করছিলেন, এমন সময় একটি বক উপর থেকে তার শরীরে মলত্যাগ করে, তা'তে ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হ'য়ে বকটিকে শাপ দিতেই বকটি ভস্ম হ'য়ে গেল। আর একদিন তিনি এক গৃহস্থের বাড়ীতে ভিক্ষা করতে গেছেন। গৃহস্বামী তখন ক্ষুধার্ত্ত ও পীড়িত। তাঁর স্ত্রী তখন স্বামী-সেবায় রত। তিনি তখন ব্রাহ্মণকে একটু অপেক্ষা করতে বললেন। এদিকে ব্রাহ্মণ তো রেগে অগ্নিশর্ম্মা। হাতের কাজ সেরে গৃহকর্ত্রী ভিক্ষা দিতে এসে সবিনয়ে তার বিলম্বের কারণ ব'লে ব্রাহ্মণের কাছে ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ তা'তে শান্ত না হ'য়ে আরো উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন। অনন্যোপায় হ'য়ে পতিব্রতা বললেন, 'আমি তো আর কাক-বক নই যে, আমাকে ভস্ম ক'রে দেবেন। অতো রাগ করা বৃথা। আমি কোন অন্যায় করিনি, স্বামীর পরিচর্য্যায় ব্যস্ত ছিলাম, তাই একটু দেরী হয়েছে।' ব্রাহ্মণ পতিব্রতার অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন, এবং তাঁর উপদেশ-অনুসারে শাস্ত্রতত্ত্ব জানবার জন্য মিথিলার পিতৃমাতৃ-ভক্ত ধর্ম্মব্যাধের কাছে গেলেন। বিদ্যা ও কুলের জোর যতই থাক না কেন, ভক্তি ছাড়া যে শাস্ত্রতত্ত্বে অনুপ্রবেশ লাভ হয় না, এখানে এই কথাটিই বোঝান হয়েছে। আবার, নিম্নকুলোদ্ভূত কোন লোকও যদি প্রকৃত ভক্তিমান হয়, তারও যে প্রভূত জ্ঞানের বিকাশ হ'তে পারে, সে-জিনিসটিও এখানে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। তবে একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে—শূদ্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক'রে বিপ্রের গুরু পর্য্যন্ত হ'তে পারে, কিন্তু তাই ব'লে উচ্চবর্ণের মেয়ে বিয়ে করতে পারে না। বিয়ের বেলায় পুরুষের বীজবৈভব বিচার করতে হবে। পুরুষের বীজবৈভব যদি নারী যে-বীজোৎপন্না তার থেকে সমৃদ্ধতর না হয়, সমৃদ্ধতর না হ'লেও অন্ততঃ তার সমান যদি না হয়, তাহ'লে প্রজননক্ষেত্রে বিপর্য্যয় দেখা দেয়। বীজ নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে মাটিকে আয়ত্তে এনে তার থেকে নিজের উপযোগী পুষ্টি সংগ্রহ করতে পারে না, বরং মাটিই তা'কে

আত্মসাৎ ক'রে তার বৈশিষ্ট্যকে বিকৃত ক'রে তোলে।

বীরেনদা (বিশ্বাস)—গুরুভক্তির ভিতর-দিয়ে যে সমস্ত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি-লাভের কথা আছে, সে কেমন ক'রে সম্ভব হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আরুণির কথা, উপমন্যুর কথা শোনা আছে তো? এসবের তাৎপর্য্যটা ভাল ক'রে বুঝতে হবে। আচার্য্য ধৌম্য তাঁর শিষ্য আরুণিকে পাঠালেন ক্ষেতের আল বাঁধবার জন্য। আরুণি যখন কোনমতেই আল বাঁধতে পারল না, তখন নিজেই আলের মধ্যে শুয়ে প'ড়ে জল ঠেকাল। দিনান্তে আচার্য্য আরুণিকে দেখতে না পেয়ে শিষ্যগণ সহ বেরিয়ে পড়লেন আরুণির খোঁজে। ক্ষেতের কাছে গিয়ে ডাকতে লাগলেন, 'আরুণি, ও আরুণি!' আরুণি আলের পাশে শুয়ে থেকেই উত্তর দেয়—'প্রভু! এই যে আমি।' ধৌম্য তাকে উঠে আসতে বলেন। আরুণি তখন সব কথা খুলে বলে। গুরু প্রীত হ'য়ে আশীর্ব্বাদ করেন—'আমি খুব খুশি হয়েছি। সর্ব্বশাস্ত্র তোমার অধিগত হবে।' শিষ্য উপাধ্যায়কে প্রণাম ক'রে বিদায় নেয়। এর মানে হ'লো, গুরুতে যার মন একাগ্র, গুরুর স্বার্থের জন্য যে সবরকম কষ্ট স্বীকারে অভ্যস্ত, তার প্রবৃত্তির বিক্ষেপ ও বিক্ষোভ স্বতঃই প্রশমিত হ'য়ে আসে। অমনতর একনিষ্ঠ তপস্যা যার, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মপরিচিতি ক্রমশঃই পূর্ণতা লাভ করতে থাকে। যে নিজেকে অধিগত করতে পারে, সে সেই দাঁড়ায় ফেলে বিশ্বের যা'-কিছুকেই অধিগত ক'রে ফেলে। উপমন্যুরও ঐ ব্যাপার। ধৌম্যের আর এক শিষ্যের নাম ছিল উপমন্যু। তিনি তাকে গো-পালনে নিযুক্ত করলেন। গুরু তাকে হৃষ্টপুষ্ট দেখে জিজ্ঞাসা করলেন,—'তোমাকে বেশ নাদুস-নুদুস দেখছি, তুমি কী খাও?' শিষ্য বলল—'ভিক্ষা ক'রে যা' পাই, আমি তাই দিয়েই জীবন-ধারণ করি।' গুরু বললেন, 'ভিক্ষা ক'রে যা' পাবে, তা' আমাকে দেবে। শিষ্যের ভিক্ষালব্ধ জিনিসপত্র গুরুরই প্রাপ্য।' আবার কিছুদিন পরে গুরু শিষ্যকে খাদ্য-সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। শিষ্য বলল—'আমি প্রথমবার ভিক্ষা ক'রে যা' পাই, তা' আপনাকে দিই, তারপর ভিক্ষা ক'রে যা' পাই, তাই খেয়ে থাকি।' গুরু বললেন, 'তাও ঠিক নয়। এতে অন্য ভিক্ষুকের অসুবিধা সৃষ্টি করা হয় এবং তোমারও লোভকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।' এরপর উপমন্যু গরুর দুধ খেয়ে বেঁচে থাকে। গুরু আবার একদিন ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। উপমন্যু বলে—'গরুর দুধ খাই।' উপাধ্যায় বলেন—'তুমি দুধ খেলে বাছুরের অসুবিধা হ'তে পারে, এভাবে দুধ খেও না।' আবার কিছুদিন পরে গুরুর সেই প্রশ্ন। শিষ্য উত্তর দেয়—'বাছুরগুলির মুখে বা গরুর বাঁটে যে ফেনা লেগে থাকে, তাই খাই আমি।' গুরু বলেন—'বাছুরগুলি তোমার প্রতি অনুকম্পায় হয়তো বেশী ফেনা নিষ্কাশন করে, এতেও তাদের অসুবিধা হ'তে পারে, তুমি ঐ ফেনা খেও না।' এবার আহারের সব পথ রুদ্ধ। তবু শিষ্য ভাবে—আচার্য্য খেতে নিষেধ

করেছেন, কিন্তু গরু চরাতে তো নিষেধ করেননি, তাই খালি পেটে সানন্দে গরু চরায়। একদিন ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে সে কয়েকটা আকন্দপাতা চিবিয়ে খেল। আকন্দপাতা খাওয়ায় অন্ধ হ'য়ে এদিক-ওদিক ঘুরতে-ঘুরতে এক কুয়োর মধ্যে প'ড়ে গেল। গুরু তাকে যথাসময় আশ্রমে আসতে না দেখে শিষ্যদের নিয়ে বনে গেলেন। বনে গিয়ে তাকে ডাকতে লাগলেন। উপমন্যু কুয়োর মধ্য থেকে সব বৃত্তান্ত বলল। সবাই মিলে ধরাধরি ক'রে তাকে উপরে টেনে তুললেন। তারপর গুরুর উপদেশমতো দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারের আরাধনায় উপমন্যু দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। সুস্থ হ'য়ে গুরুকে প্রণাম করতেই গুরু আশীর্ব্বাদ ক'রে বললেন, 'বৎস, তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ। সমস্ত বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র তোমার কাছে প্রতিভাত হবে।' এতখানি চোট স'য়েও ভক্তি-বিশ্বাস যার অটল থাকে, সে তো অকম্প্রজ্ঞানের রাজ্যেই অধিষ্ঠান লাভ ক'রে যায়, তার কি আর জ্ঞানের কিছু বাকী থাকে?

২৩শে পৌষ, বুধবার, ১৩৪৮ (ইং ৭।১।৪২)

তপোবনের একটি ছাত্র পরীক্ষায় ফেল করেছে ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে কাঁদছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন আশ্রম-প্রাঙ্গণে বাবলা-তলায় একটি হাতল-ওয়ালা বেঞ্চে পূর্ব্বাস্য হ'য়ে বসা। বেলা আন্দাজ আটটা, রোদ উঠেছে বেশ, শ্রীশ্রীঠাকুর রোদের মধ্যে পা-দুখানি রেখেছেন, বেঞ্চের হাতলে হেলান দিয়ে সুখকর ভঙ্গীতে ব'সে আছেন। কিছু ধান ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে, কতকগুলি পায়রা সেগুলি খুঁটে-খুঁটে খাচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর পায়রাগুলির দিকে চেয়ে আছেন সস্নেহ-সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে, চেয়ে-চেয়ে দেখছেন পায়রাগুলির ধান খাওয়া। পায়রা-গুলির সুখে তিনিও যেন কত সুখী। ছেলেটির কান্নায় শ্রীশ্রীঠাকুর চকিত ভঙ্গীতে চাইলেন তার দিকে, চেয়ে স্নেহ-বিগলিত কণ্ঠে বললেন—কি হইছে সোনা? কি হইছে? কাঁদো কেন?

ছেলেটি কাঁদতে-কাঁদতে বলল—আমি পরীক্ষার পরে বাড়ী চ'লে গিয়েছিলাম, আজ এসে শুনলাম আমি প্রোমোশন পাইনি। ভাবছি, বাবা-মাকে কি ক'রে এই কথা জানাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—ও, এই কথা! এই জন্য তুই কাঁদছিস! দূরে পাগল! পরীক্ষায় ফেল করিছিস, তাতে কী হইছে? এবার এমন ক'রে পড়, যাতে খুব ভালভাবে পাশ করতে পারিস। মনে-মনে এমন সঙ্কল্প করা লাগে যে জীবনে আর কখনও ফেল করব না। আর, শুধু নিজে ফেল না করা নয়, সহপাঠী বা পরিচিত কাউকেও ফেল হ'তে দিবি না। কোথায়-কোথায়, কিসে-কিসে গলদ আছে, সেগুলি বের করা লাগে, বের ক'রে খেটে শুধরে

ফেলতে হয়। নিজের গলদগুলি সেরে ফেলতে পারলে, অন্যকেও তখন তোর অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহায্য করতে পারবি, প্রবুদ্ধ ক'রে তুলতে পারবি। শুধু পড়াশুনার ব্যাপারে নয়, সব ব্যাপারেই জীবনে জয়ী হওয়া চাই। যদি কখনও কোন ভালকাজে অকৃতকার্য্য হোস বা দুঃখ পাস, তা'তে কিন্তু দমবি না, রোখের সঙ্গে লেগে যাবি। বাধাকে বাধ্য ক'রে তার উপরে উঠে জয়ী হওয়া চাই। আমার ঐ স্বভাব আছে, তাই দেখিস না কিছুতেই ডরাই না। বাধাকে বাধ্য করা, না-কে হাঁ করা, অসম্ভবকে সম্ভব করা—এ-যেন আমার একটা নেশা বিশেষ। তা'তে কোন কষ্টের জ্ঞান থাকে না আমার, একটা শুয়োরে গোঁ যেন পেয়ে বসে। কাজ হাসিল না ক'রে যেন আমার রেহাই নেই। অনেকদিন আগের কথা, একদিন গরমের সময় দুপুর বেলা হঠাৎ খেয়াল হ'লো, এই গরমের মধ্যেই আগুনের মতো বালির উপর দিয়ে হেঁটে কুষ্টিয়া যাব। মনে হওয়া মাত্র বেরিয়ে পড়লাম। সে কি কাঠফাটা রোদ, বালি তেতে যেন একেবারে জ্বলন্ত কয়লা হ'য়ে আছে। একটু দূর হেঁটে মনে হ'লো এর মধ্যে যেয়ে কাজ নেই। পরক্ষণেই মনে হ'লো—এত শীঘ্র আমি সংকল্পচ্যুত হব, তা' কিছুতেই হ'তে দেব না, মনে যখন করেছি যাব, যেতেই হবে আমাকে। তখন সেই অবস্থায় ৯ মাইল পথ পাড়ি দিলাম এইভাবে। যেতে-যেতে পায়ের তলায় ফোস্কা প'ড়ে গ'লে-গ'লে ঘা হ'য়ে গেল, কিন্তু তবু দমলাম না, তখন রোখ আমার এতই প্রবল যে কষ্ট সম্বন্ধে হুঁশ নেই। কুষ্টিয়া পেঁছে তখন খেয়াল হ'লো পায়ের কী অবস্থা হয়েছে। ওদিন কেটে গেল, পরদিন দুপুরবেলা আবার মনে হ'লো, দেখি পায়ের এই অবস্থা নিয়ে আবার পাবনা পর্য্যন্ত হেঁটে যেতে পারি কিনা। কষ্টের কথা ভেবে মন শিউরে উঠলো, তৎক্ষণাৎ মনে হ'লো, ভয় বা দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। পারব না যখন মনে হ'চ্ছে, তখন তাকে অতিক্রম ক'রে পারাই লাগবে। ভেবে কি ব'সে থাকার জো আছে? ভেবেছি কি করতেই হবে। বেরিয়ে পড়লাম পায়ের ঐ দগদগে ঘা নিয়ে, এসে পেঁছুলাম এখানে। কোন ভাল ব্যাপারে হ'টে যাওয়াটা আমার কাছে বড় অপমানজনক মনে হয়। ও আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি না।......তোরা আমার বাচ্চা, তোদেরও আমি এমনতর দেখতে চাই। তাই বলি, রুখে দাঁড়া, ফেল যেন ফেল মেরে যায় তোর কাছে, কোন ব্যাপারে ফেলকে আর এগুতে দিবি না তোর ত্রিসীমানার কাছে, শুধু তুই নয়, দেখবি কেউ যেন কোন সৎকাজে ফেল না পড়ে। নিজে কৃতকার্য্য হ'বি, সবাইকে চেতিয়ে তুলে কৃতকার্য্যতায় পেঁছে দিবি। কী বলিস, এ খেলায় মজা আছে না?

ছেলেটি তখন স্ফূর্ত্তিতে ফুলছে, হাসি-হাসি মুখে বললো—আপনার কথা শুনে মনে হ'চ্ছে আমি সব পারব। আমি আজ থেকে লাগলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লসিত হ'য়ে—সাবাস বেটা! এরেই তো কয় পুরুষ-ছাওয়াল।

তবে যা' করিস, শরীরটা ঠিক রেখে করবি। মনে রাখিস, আমার জন্য তোকে জীবনে বড় হওয়া লাগবে, কৃতী হওয়া লাগবে, আর তা'তে তোর বাপ-মায়েরও মুখ উজ্জ্বল হবে।

ছেলেটি আনন্দবিধুর সাশ্রুনয়নে শীতের মাটিতে আভূমিলুণ্ঠিত হ'য়ে প্রণাম ক'রে চ'লে গেল, তার অশ্রুধারা পুরুষোত্তম-পদচুম্বিত আশ্রম-ভূমির উপর অম্লান মাধুর্য্যে জেগে রইলো তার শুভসংকল্পের—নবজন্মের ভাস্বর স্বাক্ষর বহন ক'রে।

একটু পরে খেপুদা (চক্রবর্ত্তী), কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও বঙ্কিমদা (রায়) আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনাদের একসঙ্গে দেখলে আমার গোপালের কথা মনে পড়ে। গোপাল ছিল হাতের লাঠির মতো। কাছে থাকলে বল পাওয়া যেত।

কেষ্টদা—আপনার প্রত্যেকটি কাজে গোপালের উৎসাহ ছিল অসাধারণ। নিজে যেমন উৎসাহী ছিল, অন্যের মধ্যে আবার তেমনি উৎসাহ সঞ্চারিত ক'রে দিতে পারত। কন্‌ফারেন্সের রিপোর্টগুলি পড়তো, ঐ সব dry facts and figures (নীরস তথ্য ও সংখ্যা)-এর ভিতর-দিয়ে কেমন একটা glowing hopeful picture (উজ্জ্বল আশাপ্রদ চিত্র) ফুটিয়ে তুলতো।

বঙ্কিমদা—কথা বলতে হয় কেমন ক'রে, সে art (কলা) ও জানতো।

শ্রীশ্রীঠাকুর খেপুদা, কেষ্টদার দিকে চেয়ে—বঙ্কিম ঐ দিক দিয়ে একটু খাটো, তা'ছাড়া ওর জুড়ি নেই। অফিস নিয়ে লাগিছে তো তার পিছনে লাগেই আছে। আবার, খোয়া ভাঙতে দেন বা ঘর দুরমুজ করতে দেন, কোনটাতেই পিছপাও হবে না। (হাসতে-হাসতে) তবে নতুন লোক ওর কথা শুনলি ঘাবড়ে যায়। একদিন আমাকে তো একজন ব'লেই বসলো—উনি আমার উপর চ'টে গেলেন কেন? আমি যত ভাল কথা বলি, উনি তত চটেন, এ কেমন লোক? আমি তখন বলি—উনি খুব ভাল লোক, উনি খুব ভাল কথাই বলছেন। ওর ভাল কথা বলারও ধরণ ঐ রকম। আপনি বুঝতে পারেননি। লোকটার সঙ্গে মিশে দেখবেন। ভদ্রলোক তখন আমতা-আমতা করতে-করতে বলল—ও তাই বুঝি? উনি আমার সঙ্গে ভাল কথা বলছিলেন!

এই ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন। বঙ্কিমদা শুদ্ধ সকলেই সে হাসিতে যোগ দিলেন।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর গম্ভীরভাবে বললেন—মানুষেরই যে বড় অভাব।

কেষ্টদা—বড়খোকা, মণি এরা অসাধারণ মানুষ। ওরা একটু shy (লাজুক প্রকৃতির), নইলে মানুষ-পরিচালনা করার ক্ষমতা ওদের খুব আছে। মাথাও খুব ভাল, বুঝগুলি এমন সহজ।

খেপুদা—বড়খোকা exceptionally intelligent (অসাধারণ

বুদ্ধিমান)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা এখনও চ্যাংড়া মানুষ, তারপর বড়খোকার শরীরও ভাল না, ওর বুদ্ধি আছে, দরদও আছে, আবার কর্ম্মশক্তিও কম নয়, তবে বড়বৌয়ের মতো একটু রাশভারী। মানুষ প্রথমে ঠাওর পায় না, যত মেশে তত দেখে, অন্তরে মধুভরা। ওর শরীরটার জন্য বড় ভাবনা হয়!.........মণিরও লোক একগাট্টা ক'রে নিয়ে চলার ক্ষমতা আছে। 'তারা' যাবার পর থিয়েটার, গান-বাজনা জিইয়ে রাখিছে কিন্তু ও-ই। ওর নিজের যেমন নেশা আছে, আবার কতকগুলিকে তৈয়েরীও করিছে বেশ। অনুশীলন করে খুব, ঐ নিয়ে লাগেই আছে। রীতিমতো একটা atmosphere (আবহাওয়া) create (সৃষ্টি) ক'রে ফেলিছে। পাঁচজনের সঙ্গে হৃদ্য সহযোগিতায় একটা কাজও যে নিখুঁতভাবে করতে পারে—দিনের পর দিন ঝড়ঝাপ্টা-বাদল অগ্রাহ্য ক'রে ক্রমাগতি বজায় রেখে, তার মধ্যে অনেকখানি সম্ভাব্যতাই কল্পনা করা যায়।............পাগলুটারও আমার উপর খুব নেশা আছে। এরা সব সুস্থ সুদীর্ঘ জীবন পায়, তাহ'লে অনেক কিছু করতে পারবে।

সরোজিনীমা তামাক সেজে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে কেষ্টদার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—আপনি ডলাই-মলাই ক'রে প্রফুল্ল (দাস), চুনী (রায়চৌধুরী), বীরেনকে (মিত্র) যেমন পোক্ত ক'রে দেছেন, কিরণ (মুখোপাধ্যায়), মনোরঞ্জন (বন্দ্যোপাধ্যায়) ওদেরও তেমনি ক'রে দেন। আপনার কতকগুলি hand (সহকারী) না থাকলে, একলা সব দিক সামাল দেওয়া মুশকিল হবে।............শরৎদার মতো আরও কয়েকজন পাতাম। হাউড় তোলার জন্য বক্তৃতারও দরকার আছে। অবশ্য বক্তৃতার effect (ফল) যদি utilise (সদ্ব্যবহার) না করা যায়, তাহ'লে তা'তে কাজ হয় না। Public meeting (জনসভা)-এর আগে যাজন লাগে, পরে যাজন লাগে, এমন কি meeting (সভা)-এর সময়ও যাজন লাগে।

কেষ্টদা—Meeting (সভা)-এর সময় যাজন কী রকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধরেন, একজায়গায় একটা meeting (সভা) হ'চ্ছে audience (শ্রোতৃবৃন্দ)-এর ভিতরে intersperse ক'রে (ইতস্ততঃ-ছড়িয়ে) কতকগুলি গুণগ্রাহী আপনজন রেখে দেবেন। তারা বক্তার বক্তৃতার সময় মাঝে-মাঝে এমনতর suggestive remark (সঙ্কেতপূর্ণ মন্তব্য) করবে যা'তে আশে-পাশের সবার supporting tendency (সমর্থনী মনোভাব) হয়। কেউ যদি বক্তৃতার সময় উল্টো মন্তব্য করে বা বিরূপ ভঙ্গী দেখায়, তা'ও তারা tactfully (কৌশলে) counteract (প্রতিবিধান) করবে—আশ-পাশের লোককে সমর্থনমুখী ক'রে। এতে বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে সমগ্র জনতা

charged (উদ্বুদ্ধ) হ'য়ে যাবে। যারা wrong suggestion (ভ্রান্ত সংকেত) দিয়ে মানুষকে সৎপথ হ'তে দূরে রাখতে চায়, তারা audience (শ্রোতৃবৃন্দ)-কে infect (দূষিত) করবার সুযোগ পাবে কম। বক্তৃতার সময় লক্ষ্য করা লাগে, audience (শ্রোতৃবৃন্দ)-এর ভিতর কার চোখমুখ কেমন glow করে (দীপ্ত হ'য়ে ওঠে)। আগ্রহশীল যারা, তাদের চোখমুখের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। আপনাদের কথা শুনলে তাদের এমনভাব হবে যে, তারা যেন কী পাওয়া পেয়েছে। তাদের mark (লক্ষ্য) ক'রে রাখতে হয়। পরে তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যাজনে উদ্বুদ্ধ ক'রে দীক্ষিত ক'রে তুলতে হয়। দীক্ষার ব্যাপারে দীক্ষাদাতার চাইতে দীক্ষাগ্রহণকারীর আগ্রহ বেশী হওয়া চাই। সেই আগ্রহ সৃষ্টি করাই যাজনের প্রধান লক্ষ্য। তুমি দীক্ষা নাও, এ-কথা বলতে নেই, তা'তে বরং মানুষের নিজের আগ্রহ ক'মে যায়। অবশ্য ধরাবাঁধা কোন রাস্তা নেই। ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবস্থা আছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুর বলেছেন উত্তম বৈদ্যের কথা। উত্তম বৈদ্য দরকার হ'লে রোগীর বুকে হাঁটু দিয়ে ওষুধ খাইয়ে দেয়। আসল কথা যাজক, অধ্বর্য্যু বা ঋত্বিকের কোন দৈন্যবোধ থাকবে না, মানুষের মঙ্গলের জন্য, ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার জন্য সে যেখানে যেমন শোভন ও সুষ্ঠু বিবেচনা করে, তাই করে যাবে।

Public meeting (জনসভা) করা সম্পর্কে আমার আরো একটা কথা মনে হয়। স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রধান যারা তাদের এমনভাবে যাজনে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে হয় যে তাঁরা নিজেরাই যেন স্বতঃ-দায়িত্বে সভা আহ্বান করেন, এবং আপনাদের অনুরোধ করেন বলবার জন্য। তাঁরা উদ্যোক্তা হ'য়ে যদি সভা আহ্বান করেন এবং লোককে আমন্ত্রণ করেন, আপনারা যদি অনুরুদ্ধ ও আমন্ত্রিত হ'য়ে সেখানে যান—তার একটা মর্য্যাদা হয় অন্যরকম। আর, কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে কম। তেমন কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'লেও ঐ প্রধানরাই তার প্রতিবিধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেটা আপনাদের প্রতি অনুরাগবশতঃ না হ'লেও, নিজেদের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার তাগিদে ক'রে থাকেন তাঁরা। যে-ভাবেই করুন, আপনাদের লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই।......(কেষ্টদাকে লক্ষ্য ক'রে) বরিশাল থেকে ফিরে এসে আপনারা পিরোজপুরের মিটিংয়ের গল্প করিছিলেন, আমার বড় ভাল লাগিছিল। ঐভাবে মিটিং করা আমার খুব পছন্দ হয়। গল্পটা আবার করেন তো।

কেষ্টদা—প্রফুল্ল সবটুকু জানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক' দেখি, শুনি।

প্রফুল্ল—কেষ্টদা রইলেন বরিশাল। আমি ও বীরেনদা (মিত্র) কয়েকদিন আগে গেলাম পিরোজপুর। আমরা পিরোজপুর যেয়ে বিশ্বেশ্বরদার (দাস) বাড়ীতে উঠলাম। তখন বিশ্বেশ্বরদা, জনার্দ্দনদা (বসু), প্রভৃতির সঙ্গে

কথাবার্ত্তা ব'লে স্থানীয় নামকরা লোকের একটা list (তালিকা) ক'রে নিলাম। কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা, মুস্লিম লিগ, বার এসোসিয়েসান, মেডিক্যাল এসোসিয়েসান, স্থানীয় ক্লাব ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান—ইত্যাদি সকল ব্যাপারেরই কর্ম্মকর্ত্তাদের সাথে বীরেনদা ও আমি দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা চালাতে লাগলাম। কয়েকদিন পর কেষ্টদার ওখানে যাবার সম্ভাবনা আছে সে কথাও তাঁদের বললাম। কেষ্টদা গেলে তাঁর কাছ থেকে যে আপনার ও সৎসঙ্গের সম্বন্ধে বিশদ পরিচয় লাভের সুযোগ জুটবে, তাদের সে কথাও জানালাম। কেষ্টদার বাবার ওখানে খুব নামডাক, কেষ্টদার কথাও অনেকে জানেন। সবাই কেষ্টদাকে পিরোজপুরে আনবার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন। আমরাও বললাম, সুবিধা পেলেই তিনি আসবেন। সব কথা কেষ্টদাকে লিখে জানাতে থাকলাম। পরে উনি জানালেন কবে যাবেন। স্থানীয় যুবকবৃন্দকে আমরা সে-খবর জানালাম। তাঁরা তখন হুলার হাট ষ্টীমার-ষ্টেশন থেকে কেষ্টদাকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা সহকারে পিরোজপুরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন। নিজেরা বাস রির্জাভ ক'রে ক্লাবের ব্যাণ্ড, ফুলের মালা ইত্যাদি নিয়ে গেলেন। পরে স্থানীয় বিশিষ্টরা নিজেদের স্বাক্ষরে মিটিংয়ের এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করলেন। রবিবার দিন বেলা তিনটের সময় স্থানীয় এক বিরাট মণ্ডপে মিটিং হ'লো। সমস্ত সহর ভেঙ্গে পড়লো সে মিটিং-এ। সভায় মাইক ছিল না বটে, কিন্তু কেষ্টদা এমন উদাত্ত কণ্ঠে বললেন যে কারও শুনতে কোন অসুবিধা হ'লো না। কেষ্টদার বলাও সেদিন খুব মর্ম্মস্পর্শী হয়েছিল। মিটিংয়ের পর সুরু হ'য়ে গেল ব্যক্তিগত যাজনের পালা। দলে-দলে লোক আসতে লাগলো বিশ্বেশ্বরদার বাড়ী। ভোর থেকে রাত একটা পর্য্যন্ত যাজনে বাড়ীখানা সরগরম হয়ে থাকতো। পদস্থ হাকিমরাও আসতেন কেষ্টদার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে। প্রমথবাবু ব'লে একজন গেজেটেড অফিসার কেষ্টদার সঙ্গে দেখা করতে এসে এতই রস পেয়ে গেলেন যে উঠি-উঠি ক'রেও পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে উঠতে পারলেন না। জরুরী কাজকর্ম্ম ফেলে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। তাঁর প্রশ্নগুলিও ছিল খুব intelligent (বুদ্ধিদীপ্ত)। সকলেই কেষ্টদার সেদিনকার যাজন খুব উপভোগ করেছিলাম। ঐ ক'টা দিন সময় কোথা দিয়ে যে কেটেছে তা' ঠিক পাইনি। ভাল-ভাল দীক্ষাও বেশ কিছু হ'লো। আমরা যেদিন চ'লে আসি, সেদিন পিরোজপুরের দীক্ষিত-অদীক্ষিত অনেকেই চোখের জল ফেলেছিলেন। ওখান থেকে আমরা গ্রীনবোটে বেরিয়ে পিরোজপুর মহকুমার বহু বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে যাই। সে-সব জায়গায়ও ঐভাবে মিটিং ও যাজন চলতো। কেষ্টদার সঙ্গে ঐ এক মাস ঘুরে আমি খুব উপকৃত হয়েছি, কোন্ প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দিতে হয়, তা' শুনে-শুনে টুকে রেখেছি।

কেষ্টদা খগেনদারও (তপাদার) খুব student like attitude

(ছাত্রোচিত মনোভাব), লেখাপড়া তো তেমন জানে না, যাজনের মধ্যে ইংরেজী কথা যার যা' শুনতো তা' আবার বাংলা অক্ষরে পেন্সিল দিয়ে নোট বইতে টুকে রাখতো, sentence-কে-sentence (পুরোপুরো বাক্য)—জায়গায়-জায়গায় হুবহু লিখে রাখিছে, কোথাও-কোথাও অবশ্য ভুল আছে। নোট বইটা একদিন আমার হাতে পড়তে—দেখলাম। প্রথমে ভাষাটা বুঝতে পারছিলাম না, পরে বুঝলাম, ইংরেজী ভাষা বাংলা অক্ষরে লেখা।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে হাসতে লাগলেন। পরে বললেন—এ একটা শুভ নমুনা। দেখেন অনুসন্ধিৎসা, জ্ঞানস্পৃহা সাধারণের মধ্যে কতখানি বেড়ে গেছে। হাওয়া যা' বওয়ায়ে দিছেন আপনারা, তা'তে মানুষের ভাল না হ'য়ে আর যায় না। এখন কিছু লোক জোগাড় করেন আর speed (বেগ)-টা বাড়ায়ে দেন, আর সবসময় লক্ষ্য রাখবেন সংহতি যা'তে অটুট থাকে। নিজেদের মধ্যে এতখানি understanding (বুঝ) থাকা চাই যে, কেউ যেন এর মধ্যে দাঁত বসাতে না পারে। বাংলার মাটিতে সংহতি গ'ড়ে তোলাটা বড় কঠিন কাজ। একজনের শ্রীবৃদ্ধি বা প্রাধান্য দেখলে আর পাঁচজনের অকারণ চোখ টাটায়। মানুষের inferiority (হীনম্মন্যতা) আছে, take it for granted (এটা ধ'রেই নেবেন), আর তাই ধ'রে নিয়ে মানুষের inferiority (হীনম্মন্যতা) যা'তে excited (উত্তেজিত) না হয় সেইভাবে চলবেন।

কেষ্টদা—তার মানে তো খোশামুদে চলনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টার্থ বিসর্জ্জন দিয়ে যদি আপনি শুধু মানুষকে খুশি করার তালে থাকেন, তাকে বলা যায় খোশামুদে চলনা। অমনতর খোশামুদে চলনায় কোন কাজ হয় ব'লে আমার মনে হয় না। আর একটা আছে ইষ্টে fanatic (গোঁড়া) থেকে, ইষ্টার্থে যেখানে যেমন চলা লাগে, তেমনি চলা। একে বলে কৌশলী চলন, চতুর চলন। এমনতর চলতে জানে যে, তাকেই কয় ধুরন্ধর। যেমন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, চাণক্য। কৌটিল্যাসিদ্ধ সরল চলনই শ্রেয়। তা' যেখানে মানুষ পারে না, তার মানে তার কোন obsession (অভিভূতি) আছে। ইষ্টার্থ তার কাছে বড় নয়, ইষ্টার্থে নিজের গোঁ সে ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। যার ঐ টেক ভাঙ্গেনি, ধর্ম্ম তার কাছ থেকে বহু দূরে।

খেপুদা—আমার একটা কথা মনে হয় দাদা! নানা জায়গায় যদি constructive activity (গঠনমূলক কর্ম্ম) ও সেবাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি start (চালু) করা না যায়, তাহ'লে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দ্যাখ্ খ্যাপা! মানুষের হাততালি পাওয়া বা বাহবা পাওয়ার লোভ আমার কোনদিনই নেই। গালমন্দেরও আমি বড় একটা পরোয়া করি না। আমি ভাবি কাজের কাজ যদি কিছু না হ'লো, তবে কী করব আমি মানুষের সুখ্যাতি দিয়ে? আর, মানুষের সত্যিকার ভাল করতে গিয়ে প্রথমটা যদি

দুর্নামের ভাগী হ'তে হয়, তাহ'লেই বা আমার ক্ষতি কী? আমি যে জানি খ্যাপা, মানুষের দুঃখ কোথায়, আর সেই দুঃখের নিরাকরণ যা'তে হয়, তাই-ই তো ক'রে যাচ্ছি। এ আমার কাছে সখের ব্যাপার নয়, প্রাণের দায়। এর চাইতে বড় constructive activity (গঠনমূলক কর্ম্ম) আর কী আছে, আমি জানি না। মানুষগুলি একেবারে ছন্নছাড়া হ'য়ে গেছে, সংযম কাকে কয়, আত্মনিয়ন্ত্রণ কাকে কয়, তা' জানে না। তা'তে জীবনসংগ্রামে পদে-পদে হ'টে যাচ্ছে। তারই অনুশীলনের জন্য কই দীক্ষার কথা, যজন, যাজন, ইষ্টভৃতির কথা। আবার, এক আদর্শের পতাকাতলে যত লোক দীক্ষার মাধ্যমে সমবেত হবে, ততই তাদের মধ্যে একটা পারস্পরিকতা গজিয়ে উঠবে। এমনি ক'রেই বিচ্ছিন্ন মানুষগুলি দানা বেঁধে উঠবে। প্রত্যেকের জন্য ভাববে প্রত্যেকে, প্রত্যেকের জন্য করবে প্রত্যেকে। এই প্রাণটুকু, এই দরদটুকু যদি তোমরা প্রাণে-প্রাণে ফুটিয়ে দিতে পার—নিজেদের আচরণ দিয়ে, তাহ'লে আর relief-centre (সাহায্যকেন্দ্র) খুলতে হবে না। তখন relief-centre (সাহায্য-কেন্দ্র) হবে প্রত্যেকটা মানুষ। অবশ্য, দৈবদুর্ব্বিপাকে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি সময়ে তোমরা যদি অন্নবস্ত্র, ওষুধপত্র, অর্থ সংগ্রহ ক'রে বিতরণ কর, তা'তে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ঐটেকেই মুখ্য ক'রে তুলো না। তোমাদের মুখ্য কাজ হ'লো ধর্ম্মদান। দরিদ্র-নারায়ণ কথাটা দেশে প্রচলিত আছে, ও-কথা আমার ভাল লাগে না, কারণ, নারায়ণ স্বতঃই যড়ৈশ্বর্য্যশালী। নারায়ণই যদি কও, সে-নারায়ণকে দরিদ্র থাকতে দেবে কেন? প্রত্যেকটি নারায়ণের যোগ্যতা যা'তে বাড়ে তাই কর। আর, তার জন্য প্রথম পরিবেষণ করতে হবে ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টি। ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টি যত বেশী মানুষের জীবনের মধ্যে, আচরণের মধ্যে বুনে দিয়ে যেতে পারবে—নিজেদের জীবন দিয়ে, আচরণ দিয়ে,—ততই দেখবে তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সামাজিক অনুষ্ঠানাদি ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টির ছাঁচে ফেলে নিজেরাই গ'ড়ে তুলতে লাগবে। উন্নতির zigote (প্রাণকেন্দ্র)-টা সৃষ্টি ক'রে দাও, আর তাকে পোষণ দাও, শুকিয়ে মরতে দিও না, তাহ'লে দেখবে, তা' পূর্ণাঙ্গ অবয়ব নিয়ে সময়ে আত্ম-প্রকাশ করবে। তোমার-আমার ব্যস্তবাগীশ হ'য়ে আলাদা ক'রে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শিরা-উপশিরা রচনায় ব্যাপৃত থাকার প্রয়োজন হবে না। যেখানে যেমন প্রয়োজন, স্বভাববশে আপনিই evolve করবে (উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে)। তাই কই, তেসরা চাষ আগে দিতে যেও না। এখন দোয়াড়ে দীক্ষা দিয়ে যাও, মানুষগুলিকে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি ও সদাচারে অভ্যস্ত ক'রে তোল, এদের পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান, সেবা-বিনিময় যা'তে বেড়ে চলে তার ব্যবস্থা কর, বিয়ে-থাওয়াগুলি যা'তে ঠিকমতো হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখ, আর এই কাজের জন্য উপযুক্ত কর্ম্মী সংগ্রহ কর। কখন কী করা লাগবে, সব আমার মাথায় আছে।

যা' কই তা' কাঁটায়-কাঁটায় ক'রে যাও। ব্যস্ত হ'য়ো না।

প্যারীদা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহস্বরে বললেন—পা'টায় ঝিং-ঝিং ধরিছে, একটু টা'নে দাও লক্ষ্মী!

প্যারীদা আগ্রহসহকারে এগিয়ে আসলেন।

২৬শে পৌষ, শনিবার, ১৩৪৮ (ইং ১০।১।৪২)

খেপুদা (চক্রবর্ত্তী), কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও বঙ্কিমদা (রায়) প্রাতে নিভৃত-নিবাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে সমবেত হয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণাস্য হ'য়ে বসেছেন, সামনেটা খোলা, সেই দিকেই চেয়ে আছেন। মাঝে-মাঝে কুষ্টিয়া মোহিনী-মিলের চোঙটার দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন, দেখতে-দেখতে বলছেন—ছেলেবেলা থেকে আমার দৃষ্টিটা বড় সন্ধানী দৃষ্টি। যা' দেখব, শুনব, বুঝব, তা' পুরোপুরি না দেখলে, না শুনলে, না বুঝলে আমার কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। ছেলেবেলায় বাগানে দেখি কতরকম গাছ, দেখি আর মনে হয়, এক মাটি আর এতরকম গাছ—এ সম্ভব হয় কী ক'রে? ভেবে আর কিনারা পাই না। শেষটা একদিন বাগানে যেয়ে ছোট-ছোট অনেক গাছপালা উপড়ে-উপড়ে দেখলাম। পরে বুঝলাম, মাটি এক হ'লেও বীজ আলাদা, তাই একমাটিতে হ'লেও গাছের চেহারা আলাদা হয়, ফল আলাদা হয়। আবার, বীজগুলিও হয় যে-বীজ থেকে ঐ গাছ হয়েছে সেই বীজেরই মতন, যদিও মাটির প্রকৃতি অনুযায়ী গাছের species (জাতি)-এর উৎকর্ষ-অপকর্ষ হ'তে পারে। মানুষগুলিও ঐরকম। একই পরিবেশে বহু মানুষকে জন্মাতে ও বাস করতে দেখা যায়, কিন্তু বীজ-অনুযায়ী আকৃতি-প্রকৃতির পার্থক্য হয়, আবার তারা যে বীজবাহী হয়, সে-বীজও তারা যে-বীজ হ'তে উদ্‌গত হয়েছে তারই অনুরূপ, পুরুষপরম্পরায় এমন ক'রেই চলে, তাই বর্ণধারা ও বংশধারা না মেনে উপায় নেই। কৃষ্টির মূলকথা হ'লো, বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি, উদ্বর্দ্ধন ও সামঞ্জস্যবিধান। পুরুষোত্তম হ'লেন সব বৈচিত্র্য, সব বৈশিষ্ট্যের সার্থক সঙ্গমতীর্থ। ঐ কেন্দ্র-পুরুষকে বাদ দিয়ে যেখানে ঐক্যবিধানের প্রচেষ্টা, সেখানে দেখা যাবে, হয় মানুষ বৈশিষ্ট্যগুলিকে ছেটে-কেটে একাকার করতে চেষ্টা করছে, নয়তো বৈশিষ্ট্য-সংরক্ষণের নামে পারস্পরিক বিভেদ ও বিচ্ছেদকে বাড়িয়ে তুলে হিংসাদ্বন্দ্বে লিপ্ত হ'চ্ছে। আমি মুখ্যু মানুষ, বই-কেতাবও পড়িনি, কিন্তু প্রকৃতিকে অস্বীকার ক'রে গায়ের জোরে, গলার জোরে বা কলমের জোরে আন্দোলন চালাতে গেলে তা'তে শেষরক্ষা হবে কিনা বুঝতে পারি না। হ্যাঁ কেষ্টদা! আপনার বিজ্ঞানে কী কয়? যে-জিনিসের যে-character (চরিত্র), সে-property (গুণ), তা' তেমনতরই behave (আচরণ) করবে তো, না

অন্য কিছু?

কেষ্টদা—আপনি যা' বলছেন, তা' তো স্বতঃসিদ্ধ, অন্য কোন প্রমাণনিরপেক্ষ, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর (অধীর আগ্রহে)—আপনি সত্যি ক'রে ক'ন, আমাকে খুশি করবার জন্য কিছু কবেন না। আমি ভাবি, আমার মতো একটা নিরেট মানুষ বোঝে, আর বড়-বড় নামকরা লোকেরা কেন বোঝে না, আমারই ভুল, না তাদেরই ভুল?

কেষ্টদা—আপনার ভুল হ'তে যাবে কেন? সত্যিকার জ্ঞানী যাঁরা, বিজ্ঞানী যাঁরা, তাঁরা তো এই কথাই বলেন। Nobel laureate Alexis Carrel বলেছেন—The democratic creed does not take account of the constitution of our body and of our consciousness. It does not apply to the concrete fact which the individual is. Indeed human beings are equal, but individuals are not. The equality of their rights is an illusion. The feebleminded and the man of genius should not be equal before the law. Sexes are not equal. To disregard all these inequalities is very dangerous. The democratic principle has contributed to the collapse of civilisation in opposing the development of an elite.—(গণতান্ত্রিক মতবাদ আমাদের দেহ ও চেতনার গঠন সম্বন্ধে চিন্তা করে না। প্রতিটি ব্যক্তি যে কী, সেই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতেও ইহা প্রযুক্ত নয়। সব মানুষই মনুষ্যজাতির অন্তর্ভুক্ত, সেই হিসাবে তারা সমান, কিন্তু ব্যষ্টিগুলি সমান বা এক নয়। তাদের অধিকারের সমতাও একটা ভ্রান্তি-বিশেষ। আইনের চক্ষে একজন ক্ষীণমনা লোক ও একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি সমান হওয়া উচিত নয়। পুরুষ-নারী সমান নয়। এই সমস্ত বৈষম্য উপেক্ষা করা অত্যন্ত মারাত্মক। গণতান্ত্রিক নীতি সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তিসমূহের উদ্ভবে বাধা সৃষ্টি ক'রে সভ্যতার ধ্বংসের কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।) Man the Unknown বইয়েতে তিনি আরো বলেছেন —The ancestral tendencies, transmitted according to the laws of Mendel and other laws give a special aspect to the development of each man. In order to manifest themselves, they naturally require the co-operation of the environment......Indeed, the circumstances of development are efficient only within the limits of the hereditary predispositions, of the immanent qualities of tissues and

consciousness.—(মেণ্ডেলের আবিষ্কৃত নিয়ম এবং অন্যান্য নিয়ম অনুযায়ী পুরুষপরম্পরায় যে প্রবণতাগুলি সংক্রামিত হয়, সেগুলি প্রতিটি মানুষের বিবর্দ্ধনের পথকে বৈশিষ্ট্যখচিত ক'রে তোলে। ঐ প্রবণতাগুলির বিকাশের জন্য পরিবেশের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। অবশ্য, বিকাশের অনুকূল অবস্থাগুলি ততটুকুই কার্য্যকরী হ'তে পারে, যতটুকু সম্ভাব্যতা কিনা তার বংশানুক্রমিকতার মধ্যে, দৈহিক উপাদান ও চেতনার মধ্যে অনুস্যূত হ'য়ে আছে।) মনীষী Galton বলেছেন—The parent is rather the trustee than the producer of the germ-cells ; or again the individual bodies are like mortal pendents that fall away from the immortal necklace of germ-cells.—(জনক বীজকোষের জনয়িতা নয় বরং তার অছিমাত্র। আবার এও বলা যায় যে, প্রত্যেকটি জাতক যেন অবিনশ্বর বীজকোষের মালা হ'তে প্রলম্বিত এক-একটি নশ্বর পুঁতিমাত্র।) Aldous Huxley বলেছেন—We must begin by the frankest, the most objectively scientific acceptance of the fact that human beings belong to different types.—(গোড়াতেই আমাদের অত্যন্ত অকপট ও অরঙ্গিলভাবে এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে মেনে নিতে হবে যে, মনুষ্যজাতি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত।) মহামতি Downing লিখেছেন—Galton, in his studies of the families of distinguished English judges, found that the son of an English judge is 500 times as likely to be a person of note as the son of the average Englishman. A similar fact was disclosed in Galton and Schuster's studies of other 'note-worthy families'. It is evident from this that ability runs in families.—(গ্যালটন বিশিষ্ট ইংরেজ জজদের পরিবারগুলিকে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে দেখেছিলেন যে, একজন সাধারণ ইংরেজের ছেলের তুলনায় একজন ইংরেজ জজের ছেলের খ্যাতনামা ব্যক্তি হওয়ার সম্ভাবনা অন্ততঃ ৫০০ গুণ বেশী। গ্যালটন ও সুষ্টার অন্যান্য খ্যাতনামা পরিবারগুলিকে পর্য্যবেক্ষণ ক'রেও অনুরূপ তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন। এটা সুস্পষ্ট যে, যোগ্যতা বংশপরম্পরায় পরিবার-গুলির মধ্যে প্রবাহিত হ'য়ে চলে।) বিখ্যাত Sociologist Prof. Gidding বলেছেন—The notion that all men are equal either in work, capacity or utility is unfounded and all efforts to blend the classes into one human caste are foredoomed to failure, because equality is a chimera.—(কর্ম্মক্ষমতা, যোগ্যতা বা উপযোগিতার দিক দিয়ে যে সকল মানুষ সমান, এ-কথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং

মনুষ্যসমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে এক শ্রেণীহীন মানবজাতিতে পরিণত করার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য, কারণ, তথাকথিত সাম্য অলীক কল্পনামাত্র।) এইরকম জগদ্বিখ্যাত আরো বহু মনীষীর বহু কথা পাওয়া যায়, যার ভিতর-দিয়ে বোঝা যায় যে, বর্ত্তমান বিজ্ঞান আপনার কথারই প্রতিধ্বনি করছে, অজানিতে আপনার সিদ্ধান্তের দিকেই অগ্রসর হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কথা ব'লে কথা নয়। Fact is fact (তথ্য তথ্যই), যেমনভাবে তা' উদ্ঘাটন করা যায়, তেমনভাবে যে অগ্রসর হয়, সেই-ই তার সাক্ষাৎকার লাভ করতে পারে। অসুবিধা হ'য়ে পড়ে, যদি কোন untoward bias (প্রতিকূল ঝোঁক) থাকে। যাহো'ক, এইসব কথা শুনলে ভরসা হয়, ভাবি, আমি তাহ'লে বেহেড হ'য়ে যাইনি, কিংবা দুনিয়াও একেবারে দেউলে হ'য়ে যায়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকিয়ায় ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় পা-দুটি ছড়িয়ে দিলেন বিছানার উপর উত্তর দিকে। হাসিমুখে বলতে লাগলেন—স্থূল হ'তে সূক্ষ্ম ও কারণ-স্তর পর্য্যন্ত আমার এই আমান অস্তিত্ব দিয়ে যতটুকু দেখেছি বা বোধ করেছি ব'লে বলি, সমস্ত জগৎও যদি তাকে মিথ্যা বলে, তাহ'লেও আমার অনুভবটা মুছে ফেলতে পারব না, আমার সত্তায় তা' গাঁথা হ'য়ে আছে। এ আমার শোনা কথা নয় যে, অন্যের কথায় আমার ধারণা পাল্টে যাবে। তবু উপযুক্ত মানুষ, বিভিন্ন শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের বাস্তব সমর্থন পেলে আমার আনন্দ হয়, ভাল লাগে। কারণ, জীবনীয় সম্পদ আমার যদি কিছু থাকে, সকলেই তা' উপভোগ করুক, এই-ই আমি চাই। একলা-একলা উপভোগ হয় না, উপভোগ যা'তে এস্তার হ'য়ে ওঠে, সেইজন্য প্রত্যেককে এর ভাগ দিতে চাই। বিশিষ্ট লোকদের কাছ থেকে আর্য্যকৃষ্টির মূল নীতিগুলি সম্পর্কে সমর্থনসূচক সিদ্ধান্ত ও উক্তি পেলে, অনেকের সে-বিষয়ে আস্থা ও আগ্রহ হবে। তাই আপনাদের এত পড়তে বলি, খুঁজতে বলি। পড়ার লোক তো আপনাকে ছাড়া দ্বিতীয় কাউকে দেখি না। সুশীলদা ও শরৎদারও পড়বার অভ্যাস আছে, কিন্তু ওদের science (বিজ্ঞান) না পড়া থাকার দরুন অনেকখানি deficiency (খাঁকতি) রয়ে গেছে। Science (বিজ্ঞান) পড়তে-পড়তে মানুষের জ্ঞানচর্চ্চা, চিন্তা, চলন ও কথাবার্ত্তার মধ্যেও একটা scientific outlook (বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী) ফুটে ওঠে, কোন-কিছু শুনেমিলে বা প'ড়ে তার মাৎটুকু বাদ দিয়ে সারটুকু পাকড়ে নিতে পারে। এর ভিতর-দিয়ে আসে accuracy of knowledge (জ্ঞানের বিশুদ্ধতা), হাবিজাবি ভেজাল থাকে না তা'তে। বঙ্কিমেরও সব বিষয়ে interest (অনুরাগ) আছে, কিন্তু বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে ও যা' বলে তা' খানিকটা ধারণা-অনুরঞ্জিত। Scientific outlook (বৈজ্ঞাকি দৃষ্টিভঙ্গী) থাকলে মানুষ ঐ ধারণা-অনুরঞ্জনাকে বাদ

দিয়ে চলে। ধর্ম্মের ব্যাপারেও ঐ কথা। যুক্তি, বিচার ও প্রমাণসহ যা' নয়, তেমনতর কিছুই আপনি মানতেন না, কিন্তু আপনার ভিতরটা মানবার মতো কিছু পাওয়ার জন্য আঁকু-পাঁকু করত, এতে আপনার পক্ষে ঢের সুবিধা হয়েছে। ধর্ম্ম, আধ্যাত্মিকতা, ঈশ্বর, আত্মদর্শন, ব্রহ্মজ্ঞান, সাত্ত্বিকতা, সাধুতা, পুণ্যকর্ম্ম, পরকাল, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ, কর্ম্মযোগ, প্রাণায়াম, সমাধি ইত্যাদি সম্বন্ধে কতগুলি মনগড়া ধারণা নিয়ে যারা গুরুর কাছে আসে এবং ঐ ধারণার মাপকাঠিতে যারা গুরুকে বিচার করে, তারা অনেক সময় বঞ্চিত হয়। একজন হয়তো সাধনতত্ত্ব জানবার লোভে আমার কাছে আসলো, আমি হয়তো তাকে বললাম গরুর ঘাস কাটতে। গুরুর আজ্ঞা পালন করলে পুণ্য হয়, সেই লোভে-লোভে সে হয়তো গেল ঘাস কাটতে। ঘাস কেটে ফিরতে দেরী হ'য়ে গেল, এদিকে ক্ষিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে, এসে অসময়ে আনন্দবাজারে গেছে, রাঁধুনে বামুন উঠলো মুখ খিঁচিয়ে। অমনি অহঙ্কার, অভিমান, সন্দেহ, অবিশ্বাস সবগুলি এসে জেঁকে বসলো। ঐদিন রাত্রে সে হয়তো টিকিট কাটলো, তারপর আর তার টিকিটি পর্য্যন্ত দেখা গেল না এ-মুলুকে এ-জীবনে। বাইরে গিয়ে হয়তো ব'লে বেড়াচ্ছে—মশায়! সৎসঙ্গের কথা বলছেন? ওখানে ধর্ম্মের 'ধ'-ও নেই। আছে প্রবল বিষয়-বুদ্ধি। আমি গেলাম ঠাকুরের কাছে সাধনতত্ত্ব শিখতে, তিনি কিনা আমাকে বললেন ঘাস কাটতে।.........এইরকম কত রকমারি যে হয়, তার কি ইয়ত্তা আছে? নিখুঁত ও নিয়মিতভাবে নিষ্ঠাসহকারে ঘাস কাটার মধ্য-দিয়ে, নিজের অহঙ্কার-অভিমানকে নিয়ন্ত্রিত করার ভিতর-দিয়ে, পরিবেশের সঙ্গে শুভ সঙ্গতি বজায় রাখতে গিয়ে তার যে কতখানি বাস্তব সাধন হ'তো, সে কি তার বোঝবার জো আছে? এখানে যারা আছে সবাই যে আমাকে ভালবেসে আছে, তা' মনে করবেন না। এমন লোকের অভাব নেই, যারা আমাকে ভগবান ব'লে প্রচার করে, কিন্তু স্বার্থ ও অভিমানে আঘাত লাগলে তৎক্ষণাৎ আমার interest (স্বার্থ) sacrifice (ত্যাগ) করতে পারে। যারা প্রবৃত্তির দায়ে হামেশা আমার interest (স্বার্থ) sacrifice (ত্যাগ) করে, বুঝবেন তারা আমাকেও যে-কোন মুহূর্ত্তে অস্বীকার করতে পারে, ত্যাগ করতে পারে। কথাগুলি কঠোর মনে হ'চ্ছে, কিন্তু এই হ'চ্ছে আদত ব্যাপার। বাড়ীর পোষা ময়নাটার উপর মানুষের যে প্রীতি ও মমতা হয়, আজীবন যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি ক'রেও অনেকের ইষ্টের উপর সে প্রীতি ও মমতাটুকু হয় না। তাই, সব চলনাটাই হয় কেমন যেন কৃত্রিম।

খেপুদা, বঙ্কিমদা বিদায় নিলেন, ইতিমধ্যে আরো ২।৩ জন আসলেন।

উপস্থিত একটি মায়ের দিকে চেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর রহস্য ক'রে বললেন—আমি যদি মানুষ না হ'য়ে টাকা হতাম, তাহ'লে তোর ভালবাসা লুফে নিতে পারতাম।

মা-টি বললেন—আপনি কী যে কন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (হাসতে-হাসতে)—মাঝে-মাঝে অপ্রিয় সত্য কথা কই। সেটা আমার দোষও কইতে পার, গুণও কইতে পার। যখন দেখি, মোলায়েম ক'রে সত্য কথা কইলে তোমাদের অনেকের চামড়া ভেদ করে না, তখন দায় ঠেকে তোমাদের ভাল চেয়েই একটু-একটু কড়া কথা কই। তোমাদের কাউকে প্রয়োজন-বশতঃও রূঢ় কিছু বললে আমার যে কতখানি লাগে, তা' যদি তোমরা বুঝতে!

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক চেয়ে খেলেন। তামাক খাওয়ার পর বালকের মতো ঔৎসুক্যসহকারে একটা ঘড়ির Parts (অংশগুলি) দেখতে লাগলেন। কেষ্টদার কাছে আবার খুঁটে-খুঁটে জিজ্ঞাসা করলেন—এটা কী? ওটা কী? এতে কী হয়?

কেষ্টদা সব খুঁটিনাটি ক'রে বুঝিয়ে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমন ঘড়ি করা যায় না যে বছরে একবারের বেশী দম দেওয়া লাগবে না।

কেষ্টদা—খুব সূক্ষ্ম লম্বা spring (স্প্রিং) যদি হয়, কিংবা দম ফুরিয়ে গেলে automatically (আপনা থেকে) দম হ'য়ে যাবে এমনতর mechanical arrangement (যান্ত্রিক ব্যবস্থা) যদি থাকে, তাহ'লে হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের দেশে আগে সময় নির্ণয় করতো কী ক'রে?

কেষ্টদা—সূর্য্যের ছায়া মেপে সময় নির্ণয় করা হ'তো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, যেকালে পল, বিপল, অনুপল ইত্যাদি কথা হামেশা প্রচলিত ছিল, তখন সেগুলি শুধু গাণিতিক সিদ্ধান্ত হিসাবেই ছিল না, দৈনন্দিন জীবনে ওর প্রয়োগ ছিল এবং তা' নির্ভুলভাবে নির্দ্ধারণ করার মতো উপযুক্ত ব্যবস্থাও ছিল। সূর্য্যের ছায়া মেপে সময় নির্দ্ধারণের কথা যা' বলছেন, তার অনেক অসুবিধা আছে, যেমন বৃষ্টির দিনে যখন সূর্য্য দেখা যায় না, তখন মানুষ সময় ঠিক করবে কী ক'রে? রাত্রে কী করবে? আমরা জ্যোতিষ-গণনায় দেখতে পাই, সময়ের কত ক্ষুদ্রতম অংশ ওর মধ্যে ক্রিয়াশীল। সময়ের ঐসব ক্ষুদ্রতম বিভাগগুলি নির্ণয় করার মতো যন্ত্র ছিল ব'লে আমার মনে হয়। যন্ত্র-বিজ্ঞানে আপনারা যে কম ছিলেন তা' কিন্তু নয়। ছিটেফোঁটা খবর যা' মেলে তা'তেই তো অবাক ব'নে যেতে হয়। হাজার বছর বিজিত অবস্থায় বাস ক'রে আমরা আমাদের ইতিহাস ভুলে গিছি, কৃষ্টি ভুলে গিছি। তোতাপাখীর মতো মনিবরা যা' শেখাচ্ছে তাই শিখছি, যা' বলাচ্ছে তাই বলছি। ভাল ক'রে ঘেঁটে দেখা... ঢোঁড়েন, জাতির সত্যিকার ইতিহাসটা উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেন। জীবনের প্রত্যেকটা বিভাগে আমাদের পিতৃপিতামহেরা কতখানি উন্নতি করেছিলেন, কথায়-কথায়, গাথায়-গাথায় সেগুলি চারিয়ে দেন। মায়েরা ছেলে কোলে ক'রে নিয়ে শুয়ে ঐ গল্পই করুক। পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব এদের দৈনন্দিন আলোচনার সামগ্রী হোক আমাদের পূর্ব্বপুরুষের গৌরবগাথা।

কত বড় একটা সভ্যতা, কত বড় একটা কৃষ্টির অধিকারী যে এ'রা ছিলেন, তা' বোঝা যায় এই দেখে যে, লক্ষ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও এত বড় প্রাচীন জাতি আজও টিকে আছে, এবং শুধু টিকে থাকা নয়, দুনিয়াকে নিত্য-নূতনভাবে দিয়ে চলেছে। স্বামী বিবেকানন্দকে যে পাশ্চাত্ত্য দেশ এতখানি সম্মান দেখালো, সে তাঁর চেহারা দেখে নয়, তাঁর কাছ থেকে তারা এমন কিছু পেয়েছিল, যা' তারা আর কোথাও পায়নি। রবীন্দ্রনাথ চ'লে গেছেন কিন্তু আজও সারা বিশ্বে তাঁর সমাদর, শুনি রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে পৃথিবীর সব দেশেই বিদ্বৎ-সমাজে একটা প্রচণ্ড আগ্রহ বিদ্যমান, কত ভাষায় তাঁর কাব্য ও সাহিত্যের অনুবাদ হ'চ্ছে। জাতির মজ্জায়-মজ্জায় অনেকখানি মাল না থাকলে কি এমন সব মানুষের আমদানী হ'তে পারে? কন কি কেষ্টদা! আমি সুখ রাখার জায়গা পাই না, যখন ভাবি, আজও আমাদের দেশে ভগবান রামকেষ্ট-ঠাকুরের মতো বিশ্বত্রাতার আবির্ভাব হয়। পরমপিতা আপনাদের প্রতি সুপ্রসন্ন, তাঁর নেক নজরে আছেন আপনারা। আপনাদের বিনাশ নাই, সব নাশকে বিনাশ করবার জন্য অবিনশ্বর হ'য়ে থাকতে হবে আপনাদের দুনিয়ার বুকে। কেবল লক্ষ্য রাখবেন—বিয়ে-থাওয়ার গোলমালে ভাল ছোপগুলি নষ্ট না হ'য়ে যায়। আর, অনুলোম চালাতে গিয়ে যেন অজ্ঞাতে প্রতিলোমের কারণ ঘটাবেন না, তার চাইতে বরং সবর্ণ বিয়ে ভাল।

কেষ্টদা—অনুলোম চালাতে গিয়ে প্রতিলোম ঘটান বলতে আপনি কী বলছেন, তা' বুঝতে পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধরেন, এই যশোহরের সুরেনরা, দেশে ওদের বলে নমঃশূদ্র, লোকে ভাবে ওরা শূদ্র, কিন্তু তা' তো নয়, ওরা হ'লো পারশব বিপ্র, বামুনের রক্ত ওদের গায়, ওদের মেয়ে যদি কায়স্থের ঘরে যায়, তাহ'লে তা' হবে ডাহা প্রতিলোম। আবার, বিপ্রের ঔরসজাত হ'লেও ওদের মা হ'লো শূদ্রা, তাই ওদের ছেলেরা ক্ষত্রিয়-কন্যা বা বৈশ্য-কন্যাকে যদি বিয়ে করে, তা'ও হবে প্রতিলোম, কারণ ওদের মাতৃবর্ণ নিম্নতর। এই সবগুলি লক্ষ্য করতে হয়। তা' ছাড়া প্রত্যেকটি সম্প্রদায় ও শ্রেণীর ইতিহাস যথাযথভাবে বের করতে হয়। নবশায়কদের প্রত্যেকটি শ্রেণীই বৈশ্য কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ওদের মধ্যে উচ্চতর বর্ণের অনুলোম জাত সন্তান থাকাও অসম্ভব নয়। যেমন প্রফুল্ল, শরৎদা এদের দেখলে আমার মনে হয়, হয়তো এদের মধ্যে বামনাই ছিট থাকতে পারে। কিন্তু আমার মনে হওয়ার দাম কী, যদি শাস্ত্র ও ইতিহাসে নজীর না পাওয়া যায়? আমি প্রফুল্লকে কত কইছি ঘে'টে দেখতে, তা' ও গা-ই করে না।

প্রফুল্ল—যারা এইসব নিয়ে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করে, তাদের অনেকের মধ্যেই দেখেছি কেমন যেন একটা inferiority (হীনম্মন্যতা) work (ক্রিয়া) করে, বামুন সাজার বুদ্ধি। তাই আমার ও ভাল লাগে না, শেষটা আমারও হয়তো

ঐ ভাব এসে যেতে পারে। আর, উপরে যত বেশী লোক থাকে সেই তো ভাল, হাউস মিটিয়ে প্রণাম করা যায় অনেককে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাগল আর কী? নিজের সত্যিকার পরিচয়টা জানতে চেষ্টা করার মধ্যে inferiority (হীনম্মন্যতা) কোথায়? আর শুধু তোদেরটাই যে বের করতে বলছি তা' তো নয়, নবশায়কের সবগুলি শাখা সম্বন্ধেই নির্ভরযোগ্য উক্তি ও তথ্য বের করবি। Uncoloured (অরঙ্গিল) হ'য়ে research (গবেষণা) করে যেমন, তেমনি করবি।

প্রফুল্ল—আপনি বলার পর থেকে আমি কিছু-কিছু ঘাঁটাঘাঁটি করছি, কিন্তু নানা বইতে নানা বিরোধী উক্তি ও তথ্য পাওয়া যায়। কোন পথ পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—হাতড়াতে-হাতড়াতে clue (সংকেত) পেয়ে যাবি। ....একটু পরে বললেন—চলেন, রোদের মধ্যে যাই, শীতে যেন জ'মে গিছি।

বাইরে এসে কেষ্টদার ঘাড়ে হাত দিয়ে উত্তরমুখী হ'য়ে মাতৃ-মন্দিরের দিকে এগুলেন। খানিকটা এগিয়ে দেবুভাইকে বললেন—মোড়াটা নিয়ে আয় তো কাজলের মা'র ঘর থেকে।

দেবুভাই (বাগচী) ছুটে গিয়ে মোড়া এনে পেতে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর রোদপিঠ ক'রে ব'সে রমজানের কাছ থেকে ধান-পানের খবর নিতে লাগলেন।

২৮শে পৌষ, সোমবার, ১৩৪৮ (ইং ১২।১।৪২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে নিভৃত-নিবাসে বিছানায় ব'সে আছেন। এমন সময় কেষ্টদা ওখানে গেলেন। কেষ্টদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে নীচেয় মেঝের উপর বিনা-আসনে বসতে যাচ্ছিলেন দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে বললেন—এত ঠাণ্ডায় খালি শানের উপর বসবেন না। একটা আসন টেনে নিয়ে বসেন।.........তা' আপনি আইছেন, ভালই হইছে। লোকের দঙ্গলের মধ্যে আপনাকে যা' কইবার তা' কইতেই পারি না। যখন যেটা ক'বার তখন সেটা না ক'লি আবার কামের অনেকখানি ক্ষতি হ'য়ে পড়ে। তা' ছাড়া একটা করণীয় কাজ করা হ'লো না ব'লে মনে একটা অস্বস্তিও লা'গে থাকে। অনেক সময় পরে আবার ভুলও হ'য়ে যায়। এইজন্যই এই জালের ঘর করিছিলাম—ভাবিছিলাম, রোজ কিছু সময় এখানে ব'সে আপনাদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা কব। তা' এ জায়গাও এখন বারোয়ারী জায়গা হ'য়ে গেছে। কেমন একটা ব্যাপার হইছে, শৃঙ্খলা যেন আমরা কিছুতেই মানতে পারি না।

কেষ্টদা—এই শৃঙ্খলা ভাঙ্গার বুদ্ধি কেন হয় আমাদের?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখেন, ভালবাসা যদি থাকে তাহ'লে বুদ্ধি থাকে প্রিয়ের সুখ, সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য কিসে হয়। প্রিয়র সান্নিধ্য না পেলে তার হয়তো বুক ভেঙ্গে যায়, কিন্তু তা'তেই যদি প্রিয়ের সুবিধা হয়, তেমন ক্ষেত্রে সে মনের ব্যথা মনে চেপে হাসিমুখে দূরেই থাকে, দূরে থেকেই তাঁর সুখ-শান্তির জন্য যা' পারে সন্তুষ্টচিত্তে ক'রে যায়। কোন অনুযোগ করে না, অভিযোগ করে না। সীতাকে যখন নির্ব্বাসন দিলেন রামচন্দ্র, তখন অনেকে সীতার প্রতি সহানুভূতিপরবশ হ'য়ে রামচন্দ্রের কাজের অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে তাঁর কাছে বলতে যেতেন, তা'তে কিন্তু সীতা রুখে উঠতেন, বলতেন, 'আর্য্যপুত্র ঠিকই করেছেন, তিনি প্রজানুরঞ্জক রাজা, তাঁর কাজ হ'লো প্রজাগণের সন্তোষ বিধান। তাদের মধ্যে অসন্তোষ বা বিক্ষোভ দেখা দিলে রাজার কর্ত্তব্যচ্যুতি ঘটে। তাই, আমাকে বনবাসে দিয়ে তিনি সেই অসন্তোষ ও বিক্ষোভের কারণ নিরসন করেছেন। এ তিনি ঠিকই করেছেন, এবং সহধর্ম্মিণী হিসাবে আমারও উচিত তাঁকে তাঁর কর্ত্তব্য-পালনে সহায়তা করা। তাই আমি সত্যিই সুখী, কারণ, নির্ব্বাসিত জীবন যাপন ক'রে আমি আমার স্বামীর জীবনব্রত উদ্‌যাপনে সাহায্য করতে পারছি। তোমরা তাঁর কাজের সমালোচনা ক'রো না, তিনি সাধারণ মানুষ নন, তিনি কখনও ভুল করেন না, অন্যায় করেন না।' কী কথা! ভাবলেও বুকখানা আনন্দে ফুলে ওঠে। একেই কয় ভালবাসা। রামচন্দ্রের সঙ্গ ছাড়া হ'য়ে সীতার প্রাণটা কী করতো, তা' তো বুঝতেই পারেন, কিন্তু দেখেন—কোনই অনুযোগ নেই, অভিযোগ নেই তাঁর বিরুদ্ধে, বরং তাঁর কাজ সমর্থন করেছেন কেমন সুন্দরভাবে। এহেন জীবন-যাপন ক'রে গেছেন তিনি, তাই রামের সঙ্গে তাঁর নামও জড়িয়ে গেছে ভারতের ইতিহাসে, বলতে বলে 'সীতারাম'। তাই, এই ঘরে ঢোকা সম্বন্ধে শৃঙ্খলা যে ভাঙ্গে, তার মূলে আছে ভালবাসার অভাব, আছে আত্মপ্রীতি, আত্মপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধি। আপনাদের মধ্যে অনেকে আছে যারা মানুষের কাছে দেখাতে চায়, তারা আমার পক্ষে কতখানি অপরিহার্য্য, তাদের কতখানি অধিকার, সর্ব্বত্র তাদের কতখানি অবাধগতি। এর মূলে আছে inferiority (হীনম্মন্যতা)—শ্রদ্ধার শ-ও নেই ওতে। শ্রদ্ধা মানুষকে তার চলনার সীমারেখা ও অধিকারভূমি সম্বন্ধে সচেতন ক'রে দেয়, সে তা' লঙ্ঘন করে না। এইটেই হ'লো সত্যিকার আত্মমর্য্যাদাশীল ব্যক্তির লক্ষণ। এই সীমারেখা সম্বন্ধে যাদের বোধ নেই তাদের শিক্ষিত বা মার্জ্জিতরুচি বলা যায় না। তারা অযথা দাবী করে, দৌরাত্ম্য করে, উৎপাত করে, অনধিকার চর্চ্চা করে, অন্যের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যকে ক্ষুণ্ণ করে, আর এমনি ক'রে মানুষের বিরাগভাজন হ'য়ে ওঠে। তাই, আমাদের আর্য্যশিক্ষাপদ্ধতি ও সাধনপদ্ধতির মধ্যে 'অধিকারী ভেদ'-এর উপর অতো জোর দেওয়া হ'তো। আপনাদের এই যে তথাকথিত গণতন্ত্র, এটা কিন্তু অবৈজ্ঞানিক।

কেষ্টদা—আপনি যে বর্ত্তমান গণতন্ত্রকে অবৈজ্ঞানিক বলছেন, কিন্তু পৃথিবীর সেরা-সেরা নেতা যাঁরা, তাঁরা সবাই তো এই গণতন্ত্রের সমর্থক। রকম যেমন দেখা যাচ্ছে, তা'তে সারা পৃথিবীতেই তো এই গণতন্ত্র ছড়িয়ে পড়বে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৈশিষ্ট্য-বিধৃত গণতন্ত্র যদি হয়, তা'তে তো আটকায় না। গণতন্ত্র আপনাদের দেশেই কি কম ছিল? শুনেছেন তো রামায়ণের কথা? একটি ব্রাহ্মণের ছেলের অকাল-মৃত্যু হয়েছিল ব'লে, ব্রাহ্মণ এসে কৈফিয়ৎ তলব করেছিল রামচন্দ্রের কাছে—কেন তোমার রাজ্যে অকাল-মৃত্যু হ'লো? এত বড় ব্যক্তিগত অধিকারের কথা আজকের দিনে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আপনারা কি কল্পনা করতে পারেন? অগণ্য নগণ্য প্রত্যেকেরই এতখানি অধিকার তখন ছিল। দেশের ব্যক্তিগুলির সঙ্গে মন্ত্রী বা নেতাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক কোথায়? গণতন্ত্রের নায়ক যাঁরা, তাঁরা যদিও বলেন প্রত্যেক মানুষ সমান, তাহ'লেও তাঁরা অন্তরে-অন্তরে জানেন যে তাঁরা অসামান্য, অসাধারণ। প্রকৃতপ্রস্তাবে অগণ্য, নগণ্য, দুঃখী, সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক কতখানি? তাঁরা সভা ক'রে বক্তৃতা করেন, কাগজে বিবৃতি দেন, ব্যথিত কা'রও বাড়ীতে গিয়েও বড় একটা খোঁজ-খবর নেন না, কিংবা ব্যক্তিগতভাবে লোকগুলি তাঁদের কাছে ব্যথার কথা জানাবার সুযোগ কমই পায়। তাদের বৈতরণী পার হবার খেয়ানৌকা হ'লো ভোট, ভোটের মালিক হ'লো জনতা; জনতার চাপ, জনতার দাবী যেখানে, সেখানেই তাঁরা দরদী ন্যায়-বিচারের থলি খুলে বসেন। ব্যষ্টি দিয়ে যে জনতা, সেই ব্যষ্টির তাঁরা ধার ধারেন না, তার কথায় কর্ণপাতও করেন না। তাই গণতন্ত্রের মধ্যে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা বলা হয়, ওটা একটা লোকঠকান কথা। প্রত্যেকটা প্রাপ্তবয়স্ক লোককে ভোটাধিকার দিলেই গণতন্ত্র হয় না। দেখতে হবে, এই ভোটাধিকারের ভিতর দিয়ে সে পেল কী? আবার, জনতার দাবী ছাড়া গ্রাহ্য হয় না ব'লে, বহু মানুষ ক্ষুদে নেতাদের খপ্পরে পড়তে বাধ্য হয়, যারা কিনা দল বাঁধতে ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে ওস্তাদ। তারা অনেক সময় মানুষের প্রবৃত্তি ও প্রলোভনকে উস্কে দেয়, কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন না ক'রে মানুষকে অধিকার-আদায় সম্বন্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে, ফলে তারা কর্ম্মশক্তি, কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও যোগ্যতা হারিয়ে সমাজের ভারস্বরূপ হ'য়ে ওঠে। সেইজন্য ব্যক্তির দুঃখবেদনার কথা, সমস্যার কথা সহানুভূতি-সহকারে শুনতে হয় এবং সম্ভবমতো তার নিরাকরণের ব্যবস্থা করতে হয়। তাহ'লে জনতার বহু দাবী-দাওয়া ও বিক্ষোভের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। আপনার কাছে একটা মানুষ এসে যদি soothed (তুষ্ট) হ'য়ে যায়, সে আবার তার পরিবেশের কাছে বলে, এতে বহু মানুষের শ্রদ্ধা আপনার উপর আকৃষ্ট হয়, আর প্রত্যেকে যদি জানে যে তার ব্যথা নিরাকরণের একটা জায়গা আছে, তাহ'লে মানুষগুলির

মন আশ্বস্ত থাকে। কেউ বিক্ষোভমূলক বিপক্ষদল গঠন করতে চাইলে, তারাই প্রতিরোধ করে তা'। দুষ্টলোক মানুষকে ক্ষেপিয়ে সমাজের অনিষ্ট করবার সুযোগ পায় কম, সংহতিও বজায় থাকে অনেকখানি। তাই তো আপনাদের বলি—প্রত্যেকের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা বলবার কথা। আপনার সঙ্গে প্রত্যেকটা কর্ম্মীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক যত গভীর হবে, ঋত্বিক্-সঙ্ঘের কাজও আপনি তত সুষ্ঠুভাবে চালাতে পারবেন। প্রত্যেকের কথা শুনবেন, প্রত্যেকের জন্য ভাববেন, প্রত্যেকের জন্য যথাসাধ্য করবেন, আর সাহায্যাদি যা' করবেন, তা' যথাসম্ভব নিজে সংগ্রহ ক'রে করবেন। কারও মুখাপেক্ষী বা হাতধরা হ'য়ে থাকবেন না। ফিলান্‌থ্রপির থেকে দিল ভাল, না দিল, না দিল। আপনার ভিক্ষা তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। দেখেন না, আমি কাউকে বিপদে, আপদে, বিশেষ প্রয়োজনে দেবার বেলায় ফিলান্‌থ্রপির কাছে চাই না। জন্মে অবধি ভিক্ষা করতেই আছি। ও অভ্যাস আমি ছাড়তে চাই না। আমি যদি নিজ দায়িত্বে সংগ্রহ না করি, তাহ'লে অন্যেও করবে না। এই অর্জ্জনপটুত্ব মানুষের চরিত্র-গঠনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এতে মানুষের অভ্যাস-ব্যবহার অনেক শুধরে আসে, মানুষের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রাখতে হয়, মানুষকে সাধ্যমতো সেবা দিতে হয়।

প্রফুল্ল (দাস)—আমরা অনেক সময় মানুষকে সাময়িকভাবে কথাবার্ত্তায় উদ্বুদ্ধ ক'রে যা' প্রয়োজন সংগ্রহ করি, কিন্তু তাদের জন্য তেমন কিছু করি না। অন্যের কথা বলতে পারব না, কিন্তু আমি নিজে এইরকম ক'রে থাকি! ভাবি, ইষ্টের ব্যাপারে যখন সংগ্রহ করছি, তখন আমার অতো ভাববার কি আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যদি তোমাকে কিছু সংগ্রহ করতে বলি, সে-ব্যাপারে যদি আমার নাম ভাঙ্গাও, তাহ'লে তোমার কিছু হ'লো না। মানুষগুলির সঙ্গে তোমার এমন সম্বন্ধ থাকা চাই, যা'তে তুমি চাইলেই তোমাকে দেবে, তোমাকে দিতে পেরে আত্মপ্রসাদ বোধ করবে। কেউ যদি খুশি মনে তার ক্ষুধার অন্ন থেকে দিতে চায় এবং তা' গ্রহণ না করলে ব্যথিত হয়, সে জায়গায় তাকে খিন্ন না ক'রে কিছু নিলেও দোষ হয় না, আবার কেউ যদি অন্তরে-অন্তরে ক্ষুণ্ণ হ'য়ে তার অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের এক অংশ দিয়ে দেয়, এবং তা'তে যদি সে materially (বস্তুগতভাবে) এতটুকুও affected (ক্ষুণ্ণ) না হয়, তাহ'লেও তা' না নেওয়া ভাল। আমি দেখিস না—যাদের আছে, তাদের অনেকের কাছে কিছুই চাই না, বরং তাদের আরো দিই, কিন্তু যাদের কিছু নেই, তাদের কাছেই হয়তো চাই। দ্যাখ্, পরমপিতার সেবায় অর্থ ব্যয় করতে সুকৃতি লাগে, পিতৃপুরুষের পুণ্য না থাকলে সে-প্রাণ লাভ করে না মানুষ। তবে আমার সব সময় বুদ্ধি থাকে, যার কাছ থেকে এক পয়সা নিই, কেমন ক'রে তাকে এক টাকা পাইয়ে দেওয়া যায়। মূল কথা, দেবার বুদ্ধি থাকলে মানুষের যোগ্যতা ও প্রাপ্তির খাঁকতি

ঘটে না। তোরাও ঐ বুদ্ধি মাথায় রাখবি, যার কাছ থেকে যা' নিবি, তার বেশী তাকে লাভবান ক'রে দিতে চেষ্টা করবি।

প্রফুল্ল—তা' করব কিভাবে? আমাদের তো ট্যাঁক গড়ের মাঠ হ'য়ে থাকে সব সময়।

শ্রীশ্রীঠাকুর (হেসে বললেন)—মাথা খাটানো লাগে। আমি কী দিয়ে করি? আমার তো কানাকড়ি নেই, তোদের তো তবু বাক্স আছে, চাবি আছে। সময়-অসময়ে দু'-চার টাকা তা'তে রাখিস। আমি তো তালা-চাবির ধার ধারলাম না জীবনে। আমার তা' লাগবে কিসে? আমি তো সবসময় শূন্য হ'য়ে আছি। কিন্তু পারি কি ক'রে? পারি তোরা সব এত আছিস ব'লে। তোদেরও তো মানুষের অভাব নেই, কত মানুষ তোদের ভালবাসে, তোরাও তাদের ভালবাসিস। নিজের যা' থাকে তা' দিবি, যেখানে পারবি না—মানুষকে দিয়ে মানুষের জন্য করবি। করতে থাক,—দেখিস, ব্যক্তিত্বের এমন প্রভাব হবে যে তোদের মুখের কথায় মানুষের হাজার টাকার কাজ হ'য়ে যাবে। আবার, সঙ্গে-সঙ্গে বুদ্ধি দিবি, প্রেরণা দিবি, মনের ব্যথা মুছে নিবি, obsession (অভিভূতি)-গুলি কাটিয়ে দিবি, ইষ্টানুরাগ বাড়িয়ে দিবি। সেবার সবরকম হাতিয়ার তোদের হাতে আছে, তোরা তো রাজা।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটুখানি চুপ ক'রে থেকে মৃদুমধুর হাসতে লাগলেন, আকুল করা সে-হাসি, সে-হাসি দেখলে মনে হয়—অনন্তকাল ঠুঁস হ'য়ে প'ড়ে থাকি তাঁর পায়ের তলে, আর মাঝে-মাঝে মুখ তুলে চেয়ে দেখি তাঁর ঐ ভুবন-ভোলানো হাসিমুখখানি।

প্রফুল্ল ব'সে-ব'সে ভাবছে মানুষকে বস্তুগতভাবে লাভবান ক'রে তোলা যায় কেমন ক'রে, কিন্তু কোন প্রশ্ন করতে সাহস পাচ্ছে না, কারণ, শ্রীশ্রীঠাকুর যা' বলেছেন, তা' সুস্পষ্ট। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন আপন মনে বলছেন—ধর, একটা লোক অর্থবান কিন্তু মাতাল, মদ খেয়ে-খেয়ে শরীর, মন, অর্থ সব নষ্ট করছে। তুমি যদি তোমার সুগঠিত চরিত্রের প্রভাবে, তোমার ভালবাসার যাদু দিয়ে, তোমার ইষ্টনেশার পরশ লাগিয়ে তার ঐ মদের নেশা ছুটিয়ে দিতে পার, তাহ'লে তুমি কিন্তু তাকে indirectly (পরোক্ষভাবে) materially profitable (বস্তুগতভাবে লাভবান) ক'রে তুললে। তাই service (সেবা)-এর কোন লেখাজোখা নেই। Active feeling (সক্রিয় অনুভূতি) থাকলে মাটিচাপা ফোয়ারার মতো নিত্যনূতন পন্থা মাথায় ফুটে বেরুতে থাকে। তবে সব করাটা হবে ইষ্টসূত্রে গ্রথিত ক'রে, নইলে লোক-সেবা করতে যেয়ে মানুষ বেহেড হ'য়ে পড়ে, কারণ, করাগুলির মধ্যে কোন integrating thread (সংহতি-সূত্র) থাকে না,

ক্রমাগত environment (পরিবেশ)-এর complex (প্রবৃত্তি)-অনুযায়ী utilised (ব্যবহৃত) হয়।

ইতিমধ্যে খেপুদা এসে বসলেন। খেপুদা খুক-খুক ক'রে কাশছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শাসনের সুরে বললেন—তোরে ক'য়ে আমি আর পারলাম না, কতদিন কইছি, তোর ফেরেঞ্জাইটিসের ভাব আছে, শীতের ক'মাস সকাল-সন্ধ্যে মাফলারটা গলায় পে'চায়ে রাখবি, তা' তুই খেয়ালই করিস না। আর আমারও এমন কপাল, এমন একটা মানুষও দেখি না, যে তোর পাছে-পাছে থা'কে এইগুলি ক'রে দেবে। আমার দুর্ভাবনার অন্ত নেই। একটু অবসর পেলেই কত কথা মনে পড়তে থাকে। ....যা প্যারী, খ্যাপার মাফলারটা এনে দে তো।

প্যারীদা ছুটে গেলেন মাফলার আনতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওষুধ-টষুধ খাচ্ছিস তো ঠিকমতো?

খেপুদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবে প্যারী যে কয়, সব ওষুধ ঠিকমতো খাস না?

খেপুদা—প্যারী ভাবে, গাদা-গাদা ওষুধ খেলে রোগ তাড়াতাড়ি সেরে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ডাক্তারের নির্দ্দেশ পুরোপুরি মেনে চলাই ভাল। পুরোপুরি মেনে চ'লে যদি ফল না হয়, তখন তুমি প্যারীকে বলতে পারবা—তোমার ওষুধ এই ক'দিন খেলাম, কিন্তু ফল কিছু পেলাম না। প্যারীর কোন ভুল-ত্রুটি হ'য়ে থাকলে সে-ও তা' বিচার-বিবেচনা করবার সুযোগ পাবে। কিন্তু direction (নির্দ্দেশ)-গুলি যদি in toto (সম্পূর্ণভাবে) follow (অনুসরণ) না কর, তাহ'লে কিছুই বোঝা যাবে না।

খেপুদা—আচ্ছা খাব। পরে কেষ্টদার দিকে চেয়ে হাসতে-হাসতে বললেন —ওষুধ খাবার যন্ত্রণা রোগের যন্ত্রণা থেকে নিতান্ত কম নয়।

কেষ্টদা হেসে উত্তর দিলেন—যা' কইছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরও সেই হাসিতে যোগ দিয়ে বললেন—ওষুধ খাওয়ার যন্ত্রণার একটা ফয়দা আছে, কারণ, ওষুধ ঠিক-ঠিক মতো পড়লে ও তা' ঠিকঠিক মতো খেলে রোগ সারে।

কেষ্টদা পূর্ব্বপ্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে বললেন—আপনি যে বর্ত্তমান গণতন্ত্রকে অবৈজ্ঞানিক বলছিলেন, সেটা কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো বই-টই পড়িনি, তবে আপনাদের মুখে যা' শুনেছি তা'তে এই বুঝেছি, গণতন্ত্রের ধারণা—সব মানুষ সমান। কিন্তু এই ধারণাটাই ভুল। কোন দুটো মানুষই সমান নয়, দুটো মানুষ কেন, ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে কোন দুটি প্রাণী বা বস্তুই অবিকল এক নয়, প্রত্যেকটি যা'-কিছুই বিশিষ্ট ও বিভিন্ন। এই বিশিষ্টতা ও বিভিন্নতা না মানাই অবৈজ্ঞানিক বুদ্ধি। এই হিসাবে আমাদের বর্ণাশ্রম-সম্বলিত গণতন্ত্রই কার্য্যকরী। এখানে প্রত্যেক

মানুষেরই অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকের তার মতো ক'রে। বর্ণ, বংশ, ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও ইতিহাস ইত্যাদিকে বাদ দিয়ে যদি শিক্ষা, বিবাহ ও জীবিকা ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা হ'তে থাকে, তাহ'লে বিপর্য্যয় ছাড়া আর কিছু হবে না। আপনি-আমি হয়তো দেখে যেতে না পারি, কিন্তু পৃথিবীকে যদি বাঁচতে হয় তবে বর্ণধর্ম্মের fundamental principles (মৌলিক নীতিগুলি)-কে adopt (গ্রহণ) করতেই হবে। আমি এ কথা নিজ হাতে কাগজ-কলমে লিখে দিয়ে যেতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখ আবেগদীপনায় জ্বলজ্বল করতে লাগল। সকলেই অবাক-বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন তাঁর পানে।

২রা মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৮ (ইং ১৬।১।৪২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃতনিবাসে বিছানায় ব'সে আছেন দক্ষিণাস্য হ'য়ে। চশমা চোখে দিয়ে নিবিষ্টমনে নাদকারণীর ইণ্ডিয়ান মেটিরিয়া মেডিকা পড়ছিলেন। এইবার ওষুধ মেলায় খুশি, বললেন—'তামাক সাজ।' কালিদাসী-মা তামাক সেজে দিলেন। মালদহের একটি দাদার গুরুতর অসুস্থতার সংবাদ জানিয়ে কাল একখানা চিঠি এসেছে। সেই থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর ডাক্তারী বই ঘাটছিলেন। কেষ্টদা, বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), হরিপদদা (সাহা), প্যারীদা (নন্দী), কালীদা (সেন) প্রভৃতির সঙ্গে মাঝে-মাঝে আলাপ করছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে অতটা উদ্বিগ্ন দেখে প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করলো—অসুখ-বিসুখ সম্বন্ধে কত চিঠিই তো আসে, সব ক্ষেত্রে তো আপনাকে এতখানি উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত-সমস্ত হ'তে দেখি না, ক্ষেত্রবিশেষে আপনার এই বিশেষ উদ্বেগের কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু হেসে বললেন—উদ্বেগ নিয়েই আছি আমি। তবে তোমরা স্বাবলম্বী হ'য়ে ওঠ যদি, সেই-ই আমার আনন্দ। সেইজন্য অনেক সময় কাউকে-কাউকে নাকানি-চুবানি খেতে দেখেও রা করি না। আবার, সাহায্য করলেও সামনা-সামনি করি না, করি পরোক্ষভাবে, যাতে সে হাল ছেড়ে না দেয়। মানুষের এমনি দোষ, তারা যেন নাবালক ও পঙ্গু হ'য়ে থাকতেই ভালবাসে। আমার একটু সাহায্য পেলেই গা ঢিল মারে, সেই সাহায্যের উপর দাঁড়িয়ে যে আরো চেষ্টা ক'রে কৃতী হবে, তা' আর হয় না। তাই আমি নজর রাখি সবার উপর, কিন্তু সবসময় সবাইকে হাত বাড়িয়ে দিই না, তবে যখনই দেখি, কেউ হুমড়ি খেয়ে পড়তে যাচ্ছে, তখন আর স্থির থাকতে পারি না। আমার রকমটা কিরকম জান? ধর, তুমি একজনকে সাঁতার শেখাচ্ছ, কেবলই যদি তাকে তুমি ধ'রে থাক, তাহ'লে সে কিন্তু আর সাঁতার শিখতে পারবে না, মাঝে-মাঝে তাকে ছেড়ে দেওয়াই লাগবে, সেই অবস্থায় সে হয়তো একটু-আধটু জলও খাবে। কিন্তু

এমনি ক'রেই সে সাঁতার শিখবে। আবার যদি দেখ, ছেড়ে দেওয়ার ফলে সে ডুবে যাচ্ছে, তখন তাকে ধরা ছাড়া উপায় কী? এই যে বলছি, এ হ'লো বুদ্ধিকরা কথা। আমার মন চায় না যে তোমাদের কা'রও গায় একটু কাঁটার আঁচড় লাগে, তাই তোমাদের অসুবিধা দেখলে আমি ভিতরে-ভিতরে অধীর হ'য়ে পড়ি, তার দরুন তোমাদের যতখানি struggle (সংগ্রাম) করতে দেওয়া উচিত আমার, তা' দিতে পারি না। বলতে পার, কেন সে সুযোগ দেন না। কিন্তু ঐখানেই আমার স্নেহদৌর্ব্বল্য। আমি সবসময় ভাবি, যত কষ্ট আমার উপর দিয়ে যাক, আর সবাই সুখে থাক। জীবন বড় প্রিয় এবং তা' সবার কাছেই—এই জীবন দীর্ঘতর হোক, নিরাবিল হোক, সুখকর হোক সবার—সেইটেই আমার সত্তার ক্ষুধা। তাই, ক্ষুধিতের মতো হন্যে হ'য়ে ছুটি মানুষের পাছে। আমি জানি, কেউ ব্যর্থ বা ব্যথিত হ'লে সে বেদনা আমাকেই সইতে হবে। তাই নিজের স্বার্থে, নিজের গরজেই যতটুকু পারি করি। কা'রও জন্য প্রাণপণ করলেও আমার মনে হয় না যে, যা' করার সবটুকু করেছি, সবসময় ভাবি, করতে বাকী থাকলো কোন্‌টুকু। আমার অন্তরের ছবিখানা যদি কেউ দেখতে পেতো, তাহ'লে সে বুঝতে পারতো, ভালবাসার কি জ্বালা, ভালবাসার কি দায়? তবে আমি তোমাদের লাখ ভালবাসি না কেন, সেটা তোমাদের সম্পদ্ নয় কিন্তু। তোমাদের তরফের ভালবাসাই কিন্তু তোমাদের মূলধন। ঐটুকু খাটিয়েই তোমরা ত'রে যেতে পার, তরিয়ে দিতে পার মানুষকে। প্রত্যেকের চোখ-মুখ, চেহারা, চাল-চলন, কাজ-কর্ম্মের মধ্যে আমি লক্ষ্য করি, ভালবাসা কতটুকু জাগলো তার মধ্যে। কা'রও মধ্যে যখন দেখি, অকৃত্রিম অনুরাগের একটি পাপড়ি মেলেছে, তখনই যেন আমার অন্তররাজ্যে উৎসব লেগে যায়। কতবার রোমন্থন করি সে স্মৃতি। আমাকে কেউ ভালবাসে কি-না তার পরখ হ'লো কিন্তু তার পরিবেশে; পরিবেশের সঙ্গে ইষ্টানুগ সঙ্গতি নেই, পরিবেশের জন্য স্বতঃদায়িত্বে দরদের সঙ্গে ভাবা নেই, করা নেই অথচ আমাকে ভালবাসে, এমনটা হ'তে পারে না। এই ভালবাসা মানুষের সামর্থ্যকে বাড়িয়ে দেয়, সে যে কতভাবে কতজনের পূরণ করতে থাকে তার লেখাজোখা নেই। মানুষের উপাস্য হলেন পুরুষোত্তম, অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম পূরণস্বভাব-সম্পন্ন মানুষ। পুরুষোত্তমের পূজারী যখন হয় মানুষ তখন থেকেই সে হয় পূরণব্রতী, সেবাব্রতী, তখনই সে পুরুষ-নামের যোগ্য হয়। তার আগে পর্য্যন্ত সে কাপুরুষ। কাপুরুষের স্থান নেই জগতে। সে মানুষের গলগ্রহ হ'তে পারে, কিন্তু কাউকে গলায় গ্রহণ ক'রে বইতে পারে না। এ যেমন আছে, আবার এ-কথাও ঠিক, কেউ যদি অকপট আর্ত্ত হয়, সে-ও কিন্তু মানুষের প্রাণে দয়ার উদ্রেক ক'রে, তার কর্ম্মশক্তিকে সঞ্চালিত ক'রে আত্মরক্ষার উপায় করতে পারে। ভগবান অসহায় করেননি কাউকেও, সব অবস্থায় মানুষের জন্য পথ ক'রে রেখেছেন। যারা কপট, নিষ্ঠাহীন, দোদলবান্দা, তাদেরই মুশকিল

সবচাইতে বেশী। কা'রও জন্য আমার করবার প্রাণ শীর্ণ নয়, কিন্তু যে যেমন impulse (সাড়া) দেয়, প্রাপ্তিও ঘটে তার তেমনতর। অনেকে লেখে, বলে, ভাষার কত চাকচিক্য, কিন্তু তাদের মুখ যা' বলে চোখ তা' কয় না, আবার কতজনে আছে নাংলা, গুছিয়ে কথা বলতে পারে না, কিন্তু সর্ব্ব অঙ্গের ভাষা দিয়ে প্রাণে দাগ দিয়ে যায়।

একটি দাদা জিজ্ঞাসা করলেন—ঠাকুর! আমরা বিপদে-আপদে প'ড়ে আপনাকে যখন আকুলভাবে ডাকি, তখন কি আপনি ডাক শুনতে পান?

শ্রীশ্রীঠাকুর (স্মিতহাস্যে)—তোমাদের অন্তরের ঠাকুর যখন শুনতে পান, তখনই আমার শোনার সামিল হয়। ঠাকুর আমাদের ছেড়ে নেই কাউকে, তিনি সবার সঙ্গেই আছেন। ফল কথা, কেবল তিনিই আছেন বহুরূপে, বহুভাবে। আমরা যেখানে যতখানি বিমুখ তাঁর প্রতি, তিনিও সেখানে ততখানি অপ্রকট আমাদের কাছে। জান্তে, অজান্তে তাঁর সঙ্গেই ঘর করছি আমরা, তাঁর দেওয়া যা'-কিছু সবই চাই আমরা, কিন্তু এমনই অকৃতজ্ঞ যে, তাঁকে চাই না, তবু তিনি বিমুখ হন না আমাদের প্রতি, প্রতীক্ষায় কাল গণেন, কবে চাইব তাঁকে। যে দিন সত্যি ক'রে তাঁকে চাই, সেদিন সব জুড়ে, সব ভ'রে, সব শূন্যতার আকাশে ব্যাপ্ত হ'য়ে তিনিই ধরা দেন আমাদের কাছে। ঠাকুর আমাদের কি যে-সে ঠাকুর! (এই ব'লে গান ধরলেন)—'ও তাঁর গুণের কথা কইব কেমনে? সে যে গুণাতীত পরম রতন।"

বারবার আবেগভরে গানের একটি কলিই গাইছেন। গাইতে-গাইতে চোখের কোণ অশ্রুসিক্ত হ'য়ে উঠলো...........এরপর একটুক্ষণ চুপচাপ থাকলেন। খানিকটা বাদে গূঢ়স্বরে বলছেন—আমিই আমার তল পা'লাম না। পরমপিতা যে কাণ্ড করতিছেন, তিনিই জানেন।

আজ একটা গভীর, গম্ভীর, সুখসমৃদ্ধ রহস্য ঘনিয়ে উঠেছে প্রকাশ্য দিবালোকে এই জালের ঘরে (নিভৃত-নিবাসে), ঠিক যেন ঠাওর পাওয়া যাচ্ছে না—কোথায় ব'সে আছি সবাই, কা'র সামনে ব'সে আছি।

এমন সময় একটা মোটরের হর্ণ শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দেখে আয় তো কে আসলো!

হরিপদদা (সাহা) খবর নিয়ে এসে বললেন—খেপুদা পাবনা যাবেন, তাই ভূপেশদা (দত্ত) গাড়ী নিয়ে এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন আবার পাবনা যাবি কেন রে?

হরিপদদা—তা' তো জিজ্ঞাসা করিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Non-inquisitive blunt (অনুসন্ধিৎসু নিরেট) রকমে যদি চল, তা'তে কিন্তু ধর্ম্ম হবে না। কোন কাজে যদি পাঠাই ভেবে নেবে—কী উদ্দেশ্যে আমি পাঠিয়েছি, এবং সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে, সিদ্ধ করতে

যতটুকু ঝা'-ঝা' করা লাগে, ক্ষিপ্রভাবে ক'রে আসবে। যখন ঝা' করবার তাই যদি পূর্ণভাবে, নিখুঁতভাবে করতে অভ্যস্ত হও, তার ভিতর-দিয়েই ধীরে-ধীরে perfection-এর (পূর্ণতার) পথে এগুতে পারবে, নচেৎ perfection (পূর্ণতা) একটা হাওয়ার নাড়ু। মানুষ ভাবে, কাজকর্ম্মগুলি সাধন-জীবনে গৌণ ব্যাপার। কিন্তু ইষ্টার্থপূরণী কোন কর্ম্মই গৌণ জিনিস নয়। তাই, আধখেচড়া ভাবে তা' করা ভাল না, ওতে নিষ্ঠা ও অনুরাগের ব্যত্যয় হয়। সব কাজে চোখটা নিবি আমার, মনটা নিবি আমার, চিন্তাটা নিবি আমার, ধান্ধাটা নিবি আমার। এইগুলি তোর মধ্যে বসিয়ে নিয়ে উদ্দেশ্যে অমোঘগতি হ'য়ে তোর শক্তি প্রয়োগ ক'রে কাজ হাসিল ক'রে আসবি। এইভাবে চ'লে দেখ্—দেখবি, হাজারো তাফালের মধ্যে থেকে নিয়ত বৈকুণ্ঠে বাস করছিস। আমার কাছে বাবা নগদানগদি উম্‌দাচীজ—এখনই হাতে-কলমে কর, এখনই পাও, এখনই হও। 'তেরা বনত বনত বনি যাই'—এ সব ঢিমেতেতালা কথা আমার ভাল লাগে না।

কথা শেষ হ'তেই হরিপদদা দ্রুত পদে গিয়ে জেনে আসলেন—টাউনে কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে, সেইজন্য খেপুদা যাচ্ছেন, কা'র-কা'র সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে, তা' তিনি কিছু বলেননি।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রীতিস্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাক দিলেন—হরিপদ!

ডেকে একটুক্ষণ হরিপদদার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে রইলেন, চোখমুখ দিয়ে করুণা ও মমতা ঝ'রে পড়ছে, স্নেহস্বরে বললেন—আমার কথায় তোর মনটন খারাপ হয়নি তো? কী জন্য আমি কী কই, তা' বুঝিস তো?

হরিপদদা—আপনার কথায় কোনদিন আমার মন খারাপ হয় না। মন খারাপ যা' হয় সে নিজের চলার ত্রুটির জন্য। দয়া ক'রে আপনি আমার ভুলত্রুটিগুলি মাঝে-মাঝে দেখিয়ে দেন, এটাকেই আমি সৌভাগ্য বিবেচনা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা সবাই নিজেদের দোষত্রুটি নিজেরা যদি ধরতে পার, সেই-ই ভাল। আবার, আমি বা অন্য কেউ ধরিয়ে দিলে ক্ষুব্ধ না হ'য়ে যদি নিজেকে উপকৃত মনে কর ও প্রসন্নচিত্তে আত্মসংশোধনে লেগে যাও, তাহ'লেও বুঝতে হবে, তোমরা মঙ্গলের পথে চলেছ। কেউ নাম-ধ্যান করে কিনা তার একটা মস্ত পরখ হ'চ্ছে এই যে, সে আত্মবিশ্লেষণমুখর কিনা, অকৃতকার্য্যতার জন্য অন্যের ঘাড়ে দোষ না চাপিয়ে নিজেকে দায়ী করে কিনা। এ অভ্যাসই এমন যে, এতে দেখতে-দেখতে সোনা ফলে, এমনতর মানুষের সাহচর্য্যে বহু লোক উপকৃত হয়। দেখ, তুমি-আমি দুনিয়ার কিছু করতে পারি না, ধর, তোমার পাঁচটি ছেলে আছে, তাদের জন্য তুমি একটি সোনার পাহাড় ক'রে রেখে গেলে, তাদের যদি চরিত্র না থাকে, যোগ্যতা না থাকে, ঐ সোনার পাহাড় শেষ করতে তাদের বড় বেশী দিন লাগবে না। কিন্তু তাদের মধ্যে চারিত্র্য ও কর্ম্মদক্ষতার

স্ফুরণ ক'রে দিয়ে যেতে পার যদি, তাহ'লে দেখবে, তারা প্রলয়েও নষ্ট পাবে না। যে অবস্থায়ই পড়ুক, জাপানী ডলের মতো ঘুরে-ফিরে জায়গায় এসে দাঁড়াবে। আর, আশার কথা এইটুকু যে, প্রত্যেক মানুষের ভিতর অল্প-বিস্তর শ্রদ্ধা আছে এবং শ্রদ্ধার্হ দেবচরিত্র দেখলে মানুষের অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধার একটা সদ্‌গতি হয়, আর এর ভিতর-দিয়েই মানুষ চারিত্র্য অর্জ্জনে সমর্থ হয়। সেইজন্য আমি কই, তোমাদের চরিত্র শ্রদ্ধাময় হোক, শ্রদ্ধার্হ হোক, তা'তে তোমাদেরও মঙ্গল, দুনিয়ারও মঙ্গল। এ ছাড়া আর সব ফক্কিকারী। ছেলেবেলা থেকে আমার এক ব্যবসা—সে হ'লো মানুষ-চাওয়া। একটা সাম্রাজ্যের বিনিময়েও আমি একটা মানুষ ত্যাগ করতে প্রস্তুত নই, আবার একটা মানুষকে মানুষ ক'রে তুলতে যদি একটা সাম্রাজ্য ফতুর ক'রে দিতে হয়, তা'তেও আমি কুণ্ঠিত নই। মানুষের শরীর চিরস্থায়ী নয়, যদিও ইচ্ছা করে, এই শরীর নিয়ে বে'চে থাকি অনন্তকাল। যা'হোক, আমি থাকতে-থাকতে যদি দেখে যেতে পারি যে তোরা কতকগুলি মানুষ মানুষ হয়েছিস—এমন মানুষ যারা কোন প্রবৃত্তির কাছে কাবু হয় না, ধর্ম্ম—ইষ্ট, কৃষ্টি যাদের জান-প্রাণ, হাড়-মাস, তাহ'লে জানব মনুষ্যজীবন আমার সার্থক। তখন তোরাই পারবি দুনিয়াকে ঢেলে সেজে নিতে। আমি যা' দিয়ে গেলাম সেই দাঁড়াগুলি যদি ঠিক থাকে, তাহ'লে নিত্যি-নিত্যি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা কম। যেমন শুনেছি, শঙ্করাচার্য্য থেকে সুরু ক'রে এই যে সংসার অসার, মায়াময়, নারী নরকের দ্বার ইত্যাদি কথা ঘোষিত হয়েছে, তা'তে আদৌ ভাল হয়নি। ইষ্টহীন সংসার তো অসারই, মায়াময়ই, কিন্তু যে সংসারে বে'চে থাকতে হ'চ্ছে, বে'চে থাকতে চাই, তাকে অসার ক'রে না রেখে, মায়াবদ্ধ ক'রে না রেখে ইষ্টের সেবায় লাগিয়ে সারী ক'রে তুলি না কেন?—মায়ামুক্ত ক'রে তুলি না কেন? মায়ামুক্ত হওয়া বলতে আমি বুঝি, মায়াকে সীমিত ক'রে না রাখা। ধর, তুমি পুত্রের প্রতি অফুরন্ত মমতাশীল, আমি বলি—পুত্রের প্রতি তুমি অফুরন্ত মমতাশীল থাক, তা'তে ক্ষতি নাই, কিন্তু মমতা ওখানেই যেন সীমিত হ'য়ে না থাকে, তা' ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ুক বৃহৎ বিশ্বের প্রতিটি সন্তানে। একদিন দেখবে, সেই মমতা বিস্তার লাভ ক'রে তৃণলতা, পশু-পাখী, স্থাবর-জঙ্গম সব-কিছুকেই আলিঙ্গন করবে। একতাল লোহা দেখে তাকেও হয়তো চুমু দিতে ইচ্ছা করবে—যেমন দিতে ইচ্ছা করে ছেলের মুখে। কিন্তু এই পরিণতির জন্য চাই ঐ ইষ্টসূত্র—ইষ্টের জন্য যদি তোমার পুত্র হয়, পুত্রস্নেহ হয়, তবে ঐ ইষ্টানুরাগের এরোপ্লেনে চ'ড়ে তোমার পুত্রস্নেহ বিশ্ব-পরিক্রমায় বের না হ'য়ে পারবে না, কারণ, তাঁরই যে সব। আবার, নারীকে নরকের দ্বার কেন ক'রে রাখবে? সে হোক মা, সে হোক সহধর্ম্মিণী, হোক সে ধাত্রী, পাত্রী, বৃদ্ধিদাত্রী। সে স্বামীর বংশানুক্রমিক শুভ-সম্পদগুলিকে মূর্ত্ত ক'রে তুলুক তার গর্ভজাত সন্তানে। সে দেবী হোক, মূর্ত্তিমতী কল্যাণী

হোক। সে নরকের দ্বার হ'তে যাবে কেন? তা'তে তার সার্থকতা কী? অমনতর কথাই আমার মনে হয় খানিকটা obsession (অভিভূতি)-প্রসূত। অবশ্য মূল বক্তা কোন্ প্রসঙ্গে কী উদ্দেশ্যে বলেছেন, সেটা না বুঝে একটা রায় দেওয়া সমীচীন নয়। তিনি হয়তো বলতে চেয়েছেন—নারীকে পুরুষ যেখানে শুধুমাত্র ভোগের ইন্ধন ক'রে ব্যবহার করে, নারী সেখানে নরকেরই দ্বার হ'য়ে ওঠে। আর, সেকথা ঠিকই। কিন্তু এই abnormal (অস্বাভাবিক) জিনিসটার উপর আমরা অতো জোর দিতে যাই কেন? ঋষি-মহাপুরুষের দেশে আমরা তো শ্রীভগবানের বাণী জানি—'ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ' —ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ যে কাম সে কাম তিনিই, তা' অনীশ্বর নয়। আমরা কামকে, কামিনীকে অমন ক'রে নিয়ন্ত্রিত ও পরিশুদ্ধ ক'রে যদি তুলি, তাহ'লেই আমাদের ঘরে-ঘরে আবার বালগোপাল হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াবে। যেভাবে কই, সেইভাবে বিয়ে-থাওয়া ও দাম্পত্যজীবন নিয়ন্ত্রিণ কর সমাজে, দেখ, কেইসান মাল সব আসে। এ বাবা বিজ্ঞান, এর মধ্যে আবোল-তাবোল নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাতোয়ারা হ'য়ে কথা ব'লে চলেছেন, ঝরণার জলের মতো কথাগুলি একটা প্রচণ্ড বেগের সঙ্গে বের হ'চ্ছে। সে-বেগের আবেগ-বন্যায় ভেসে যা'চ্ছে প্রত্যেকের অন্তরের যত মালিন্য, অন্ধকার গহ্বরের যত জীর্ণ জঞ্জাল।

হরিপদদা তামাক সেজে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে রহস্য ক'রে বললেন—যাই কও, তামাকের মতো দোসর কিন্তু কম আছে। ভাই কও, বন্ধু কও, ছেলে কও, মেয়ে কও, বউ কও, সব সময় সকলকে ভাল লাগে না। কিন্তু তামাক ভাল লাগে সব সময়ই, যখন পৃথিবীতে কা'রও সঙ্গ পছন্দ হয় না, একেবারে নিঃসঙ্গ থাকতে ইচ্ছা করে, তখনই বরং তামাকের সঙ্গ বেশী ক'রে ভাল লাগে। খোদার দুনিয়ার আজব কাণ্ড।

বিকালের দিকে ঘুম থেকে উঠে শ্রীশ্রীঠাকুর আপন মনে হাঁটতে-হাঁটতে পোষ্ট-অফিস ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। অনেকে বললেন—একখানা চেয়ার এনে দিই। শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তর করলেন—চেয়ার লাগবি না। আমি একটু স্বচ্ছন্দে ঘুরে-ফিরে বেড়াব, তাও তোরা দিবি না? তোরা ঠাকুর-ঠুকুর যাই বলিস, আমি এ-কথা কখনও ভুলি না যে, আমি গরীব বামুন শিব চক্কোত্তির ছেলে, আমার সবরকম অভ্যাস আছে। এখনও যদি মন করি, হে'টে কুণ্টে (কুষ্টিয়া) চ'লে যেতে পারি, রাতের পর রাত জেগে সমানে কাজ করতে পারি। —এই ব'লে পোষ্ট-অফিস ঘরের রকে খালি মাটিতেই ব'সে পড়লেন। মাটিতে

বসার কী অপূর্ব্ব ভঙ্গী! যখন যেখানে যে-বেশে, যে-অবস্থায় থাকেন, মনে হয়, এমনটি আর দেখিনি—সুন্দর! সুন্দর! অপরূপ সুন্দর! শ্রীশ্রীঠাকুর ডান পা'খানি তুলে বসেছেন, কাপড় উঠে গেছে প্রায় ঊরু পর্য্যন্ত, সেদিকে খেয়াল নেই, আত্মভোলার মতো চারিদিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন। রোদের ঝিলিক এসে পড়ছে তাঁর চোখে, মুখে, গায়ে; মনে হ'চ্ছে জ্যোতিঃর তনয় জ্যোতিঃর কোলে উপবিষ্ট হ'য়ে আছেন। আমাদের মনে হচ্ছিল—এই অবস্থায় একটা ফটো যদি তুলে নেওয়া হ'তো, কত ভাল হ'তো। এই মনোমোহন ভঙ্গি, এই জ্যোতিঃ-বিভাসিত রূপ আমরা কতিপয় মাত্র দেখছি, এই অবস্থার ছবি তোলা থাকলে বিশ্ববাসী দেখতো অনন্তকাল, দেখতো আর মোহিত হ'তো, মোহিত হ'তো আর মূঢ়তা অপসৃত হ'তো, কত ভাল হ'তো!

শ্রীশ্রীঠাকুর ওখানে এসে বসার পর শ্রীশদা (রায়চৌধুরী) তাড়াতাড়ি বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশদাকে বললেন—আপনি ঋত্বিকতা করুন আর যাই করুন, ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের চর্চ্চা কিন্তু বজায় রাখবেনই। কত সস্তায়, কত সুন্দর, মজবুত আরামপ্রদ বাড়ী তৈরী করা যায়, সে ধান্ধা কিন্তু মাথায় রাখবেনই; শুধু বাড়ী নয়, টিউবওয়েল আর স্যানিটারী ল্যাট্রিনও যা'তে ঘরে-ঘরে অল্প খরচের মধ্যে সুন্দর ক'রে করা যায়, তা'ও দেখতে হয়। লোকের জীবনীয় স্বাচ্ছন্দ্য যা'তে বাড়ে, রোগ-মহামারী যা'তে কমে তার ব্যবস্থা করতে হবে, আর মানুষের আয়-উপার্জ্জন বাড়াবার জন্য ঘরে-ঘরে কিছু-কিছু কুটির-শিল্পের প্রবর্ত্তন করা চাই। কুটির-শিল্পের উপযোগী ছোট-ছোট যন্ত্রপাতিও কতকগুলি বের করতে হয়, যা' খাটিয়ে বাড়ীর মেয়েরাও দু'পয়সা উপায় করতে পারে। মানুষ অলস থাকে ততক্ষণ, যতক্ষণ কাজের সুখ টের না পায়। লাভপ্রদ কাজ পেলে মানুষ কেন করবে না? দেশের লোকের অভ্যাস অনেক খারাপ হ'য়ে গেছে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এদের পিছনে খাটলো কে বলুন তো? ফাঁকা কথায় কি কাজ হয়? মানুষগুলির পিছনে লেগে থাকা লাগে। গুরু, পুরোহিত, ঋত্বিক্, ঘটক ও ব্রাহ্মণের এই হ'লো কাজ। আপনি একে বিপ্র, তায় ঘটক, তারপর ঋত্বিক্, তায় আবার ইঞ্জিনীয়ার। আপনার চলনার মধ্যে সবগুলি যদি সুসমঞ্জস হ'য়ে ফুটে ওঠে, কী যে হয় কওয়া যায় না। ....আজ যদি দেশে প্রকৃত ঘটক থাকতো, আর ঘটকের সম্মান যদি ঠিক থাকতো, তবে কি দেশের এই দশা হয়?

শ্রীশদা—ঘটকচৌধুরী আমার পূর্ব্বপুরুষের উপাধি, তদতিরিক্ত আমি তো কিছু জানি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' জানবেন কেন? আপনারা যে এখন up-to-date (আধুনিক) হইছেন! ঘটকরা আগে কত-সব বংশের বংশপরিচয় জানতো,

আর এই জানার ফলে তারা বিয়েথাওয়ার মিল এমন-ক'রে ক'রে দিতে পারতো যা'তে দেশে ভাল-ভাল মানুষের আমদানী না হ'য়েই পারতো না। বাবার কাছে শুনেছি, আগে ঘটকরা বিয়ের ব্যাপারে সব চুলচেরা বিচার করতো, বিচার-সভা বসতো, প্রবীণ মাতব্বর যারা তারা সে-সভায় যোগ দিত, ঘটকের বিচারে ভুল হ'লে ধান দিয়ে তাদের কপাল কেটে দিত। ঐসব ঘটকদের কথা শুনেছি, তারা নাকি mathematical accuracy (গাণিতিক যাথার্থ্য) নিয়ে ব'লে দিতে পারতো, এই ছেলের সঙ্গে এই মেয়ের বিয়ে হ'লে, এই ক'টি সন্তান হবে, তার মধ্যে আবার ক'টি ছেলে, ক'টি মেয়ে তা'ও ব'লে দিতে পারতো, কোন্ সন্তানটি কেমন মেকদারের হবে, তা'ও নাকি ব'লে দিতো। শুনলে রূপকথার মতো মনে হয়, কিন্তু কিছুই অসম্ভব নয়। যুগ-যুগ ধ'রে বংশপরম্পরায় ঐ কাজ ক'রে-ক'রে তাদের এমন একটা অভিজ্ঞতা জন্মেছিল, যার ফলে তারা এমনটা পারতো। আর, এটা তো একটা আজগবী ব্যাপার কিছু নয়। Science of Genetics (জনন-বিজ্ঞান), Science of Eugenics (সুপ্রজনন-বিজ্ঞান), Science of Heredity (বংশানুক্রমিকতা-বিজ্ঞান) ইত্যাদি কথা আমরা তো আজকাল হামেশা শুনি। তাদের ছিল practical knowledge of genetics (জনন-বিজ্ঞান সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান)। ঐ জ্ঞানভাণ্ডার উন্মোচন করতে হয়, আর তার সঙ্গে জুড়ে দিতে হয় genetics, eugenics ও heredity সম্বন্ধে বর্ত্তমান বিজ্ঞান যে-কথা বলছে সেই জ্ঞান। এর ভিতর-দিয়ে যে কত উপকার হ'তে পারে, তা' ব'লে শেষ করা যায় না। বিয়ের ব্যাপারে আগে ঘটকদের অনুশাসন না মেনে উপায় ছিল না, কিন্তু পরে নব্যশিক্ষিত যুবকরা তাদের আর মান্য করতে চাইলো না। ধরেন, আপনি B. Sc. B. E., Engineer—আপনার জন্য মিল ক'রে যদি একটা কাল মেয়ে ঠিক ক'রে দিত, তাহ'লে তো আপনি চটিতং। (শ্রীশ্রীঠাকুর ও উপস্থিত সকলে মৃদু-মৃদু হাসছেন) কিন্তু সহধর্ম্মিণী ও জায়া হিসাবে সেই-ই হয়তো আপনার পক্ষে সর্ব্বোত্তম। কিন্তু ঘটকের কথা যদি না বিকায়, তার মানে-মানে বিদায় হওয়া ছাড়া উপায় কী? এমনি ক'রে আস্তে-আস্তে ঘটকদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক'মে গেছে।

শ্রীশদা—টাকার লোভে ঘটকরা বহু বাজে বিয়েও ঘটিয়ে দিত, অচল চালিয়ে দিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এগুলি হ'লো বিকৃতির কথা। সমাজ তাদের দেখে না; পেটে মারা যায়, তখন তারা করে কী? তাই ব'লে আমি এই মনোবৃত্তি সমর্থন করছি না। তবে আপনারা যদি লাগেন, ভোল ফিরিয়ে দিতে বেশীদিন লাগে না। যেখানে-যেখানে যাবেন, দেখবেন যাদের কুলজী আছে, তারা যেন তা' নষ্ট না করে। কুলজী মানে কুলের genealogical (বংশানুক্রমিক) ইতিহাস।

মানুষ বংশ-গরিমা সম্বন্ধে যদি সচেতন না হয়, সশ্রদ্ধ না হয়, তবে দেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম ইত্যাদি হবে আলগা-আলগা, তার কোন ভিত থাকবে না। আর, বংশ মিলিয়ে বিয়ে না দিলে, দাম্পত্য জীবন ঠিক না হ'লে, শুভসংস্কারসম্পন্ন মানুষ পয়দা না হ'লে—দেশ, দুনিয়া রসাতলে যেতে বসবে। আমাদের দেশে সতীত্বের কত আদর ছিল, একদিন আমাদের দেশে মেয়েরা স্বামীর সঙ্গে সহ-মরণে যেতে পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হ'তো না। জিনিসটা অবশ্য পরে বিকৃতিলাভ করেছিল এবং তা' রহিত হয়েছে ভালই হয়েছে, কিন্তু এর মূল কোথায় সেটা তলিয়ে দেখতে হবে তো? সত্যিই একসময় আমাদের দেশে এমন-সব মেয়ে ছিল যারা স্বামীবিহনে বেঁচে থাকার চাইতে স্বামীর সঙ্গে-সঙ্গে চ'লে যাওয়া কাম্য মনে করতো, আর করতোও তারা তাই। ম'রে যাওয়ার বুদ্ধিকে আমি প্রশংসা করি না বটে, কিন্তু এর পিছনে যে অনুরাগের তীব্রতা আছে তাই-ই হ'লো পরম অমৃত। ঐ একনিষ্ঠ ভক্তি-শ্রদ্ধাই মানুষকে জন্ম-মৃত্যুর ঊর্দ্ধে নিয়ে যেতে পারে, এই-ই তো মুক্তির রাজপথ। তার বদলে কিনা পাশ্চাত্ত্যের নারী-স্বাধীনতা-আন্দোলন আজ আমাদের দেশের মেয়েদের কাছে পরম লোভনীয় ব'লে মনে হ'চ্ছে। নারী-স্বাধীনতা ক'রে-ক'রে তো আজ সেখানে ঘরে-ঘরে অশান্তির আগুন জ্বলছে। আমরা তো মন খারাপ হ'লে আর কোথাও না পারি, ঘরে এসে বৌয়ের কাছে একটু তম্বিতাম্বি করতে পারি। বৌ-ও সেটা বোঝে, ভাবে—এখন ওঁর মন খারাপ, রেগে গেছেন, এখন আমি কোন কথা ক'ব না, ভয়ে-ভয়ে তোয়াজ ক'রে মাথা ঠাণ্ডা করে। পরে আবার দু'জন মিলে হাস্য-রসিকতা করে। দুঃখ-কষ্টের মধ্য-দিয়েও এইভাবে সংসার চলে, শান্তি নষ্ট হয় না। যে-স্ত্রী এমন ক'রে স্বামীকে, তার আপনজনকে সয়, বয়, সেই আবার সংসারে সাম্রাজ্ঞী হ'য়ে ওঠে। তার কথা ছাড়া তখন সংসার চলে না। স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী সকলেই তার মতামত জিজ্ঞাসা করে, দিন যেতে-যেতে তার উপর সব কর্তৃত্ব ছেড়ে দেয়। এইভাবে একটা সংসারের অধীন হ'য়ে, ভালবেসে, সেবা দিয়ে, দুঃখ স'য়ে সকলকে আপনার ক'রে নিয়ে যে আধিপত্য ও স্বাধীনতা অর্জ্জন, তার মধ্যেই তো নারীস্বাধীনতার মধুমর্ম্ম। আমি বুঝি—Co-operative interdependent serviceable run of life is liberty (সহযোগী পারস্পরিক নির্ভরশীল সেবাপ্রাণ জীবনগতিই হ'চ্ছে স্বাধীনতা)। নইলে, পাশ্চাত্ত্যে তো শুনেছি, স্ত্রীর সঙ্গে একটু রূঢ়ভাবে কথা কইলে cruel treatment (নিষ্ঠুর ব্যবহার)-এর অভিযোগে স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে divorce suit (বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা) আনতে পারে। বলেন তো সেখানে পুরুষগুলির কী দুর্দ্দশা! স্ত্রী যদি অন্যায় করে, তা'তেও তো স্বামীরা তাদের শাসন বা সংশোধন করতে পারে না। ভয়ে-ভয়ে চলে, ভাবে ক্ষেপিয়ে কাজ নেই, কোন্ সময় ছেড়ে চ'লে যাবে। তখন কাচ্চাবাচ্চারা আমার বিপদে প'ড়ে যাবে।

কিন্তু এই যে গোঁজামিলের সংসার, সংশয়ের সংসার, এর মধ্যে কি কোন শান্তি থাকে? ওখানকার জীবন আজ তাই বিষিয়ে উঠেছে। শুনছি, ওদেশে নানাপ্রকার মানসিক রোগগ্রস্তের সংখ্যা দিন-দিন বেড়ে যাচ্ছে। এইভাবে যদি চলে, তাহ'লে আরো বাড়বে। আমি বলি—এই আমরা কুঁড়েঘরে পান্তাভাত খেয়ে ওদের তুলনায় এইদিক দিয়ে ঢের ভাল আছি। যে বৌকে খেতে দিতে পারে না, সেও জানে, বৌয়ের উপর তার অধিকার আছে, আর বৌ-ও বোঝে, পেরে ওঠে না, কী করবে, যাহো'ক সে যদি আমার বেঁচে থাকে, তাহ'লে আমার শাঁখাসিন্দুর সুখসোহাগ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না, আর মানুষের দিন চিরকাল একভাবে যায় না, একদিন সুদিনের নাগাল পাবই। তুলসীতলায় পিদিম দিতে-দিতেও সে স্বামী-পুত্রেরই মঙ্গল প্রার্থনা করে। আঁচলটা কানের পাশ দিয়ে টেনে দেয় (হাত দিয়ে দেখালেন), গড় হ'য়ে প্রণাম করে, প্রণাম সেরে উঠে বারবার ভক্তিভরে কপালে হাত ঠেকায়—সংসারের কল্যাণ-কামনায়। মনে-মনে কত সময় ভাবে—উনি তো কত রকমে চেষ্টা করেন, কিছুতেই তো সংসারের সুসার হ'চ্ছে না, হয়তো আমারই কর্ম্ম খারাপ, ভাগ্য খারাপ, আমার কর্ম্মফলে উনি বোধ হয় দুর্ভোগ ভুগছেন, নইলে ওনার মতো মানুষের তো কষ্ট হওয়া উচিত নয়। ফঁৎ ক'রে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে পড়ে নিজের অজান্তে। মনে-মনে বলে—পরমপিতা! আমার সব অপরাধ ক্ষমা কর, আমার কর্ম্মের জন্য অমন ভাল মানুষটিকে, আমার এই নিরপরাধ বাছাদের কোন কষ্ট দিও না। ভেবে দেখেন তো, যে-সংসারে এতখানি প্রীতি, এতখানি মমতা, দারিদ্র্যদীর্ণ হ'লেও তো সে সংসার স্বর্গ। ওই স্ত্রীর হাতের শাকান্নও তো রাজভোগের বাড়া। এটা ভাবের কথা নয়, বাস্তবেও তাই। শ্রদ্ধাদীপ্ত, প্রীতিসিক্ত যে সেবা, তা' মানুষের সত্তাকে স্পর্শ ক'রে সবরকম cell (কোষ)-কেই nourish (পুষ্ট) করে। আবার, স্ত্রী যদি অমনতর অনুরাগিণী হয়, তার প্রেরণায় তার স্বামীর সর্বদিক দিয়ে উন্নতি হবেই। তাই, সংসারে মেয়েদের বলে লক্ষ্মী। কপালে মানুষ যারা, তাদের বৌ লক্ষ্মী হয়। আমার কপাল ভাল, তাই বড় বৌয়ের সঙ্গে বিয়ে হইছিল। এই বড়বৌ-ই কি কর্ত্তামার কাছে কম গাল খাইছে? গালায়ে ভূত ছাড়ায়ে দিতেন। ও চুপ ক'রে থাকতো, টুঁ শব্দটি করতো না। বুঝে-বুঝে হাতের কাজ কা'ড়ে করতো। তা'তে কর্ত্তামা খুব খুশি হতেন। আদর ক'রে খাওয়াতেন। এতসব পাশ ক'রে আ'সে তবে না আজ বড়বৌ বড়বৌ। মেয়েদের বড় university (বিশ্ববিদ্যালয়) হ'লো তাদের শ্বশুরবাড়ী। ঠাকুর-দেবতা, পূজা-পার্ব্বণ, শ্বশুর-শাশুড়ী, জা-জাওয়ালী, দেওর-ভাসুর, ননদ-ভাগ্নে, আত্মীয়-কুটুম্ব, স্বামী-পুত্র, পাড়া-পড়শী, চাকর-বাকর, গরু-বাছুর, গাছ-গাছালি ইত্যাদি সবার ও সব-কিছুর সেবাচর্য্যা নিয়ে সংসার। সব দিক তাল সামলিয়ে সবাইকে খুশি রাখা চাট্টিখানি কথা নয়।

আলস্য থাকলে হবে না, বদমেজাজকে বিদায় দিতে হবে, হীনম্মন্যতাকে বাদ দিয়ে সশ্রদ্ধভাবে, প্রসন্নচিত্তে গুরুজনের শিক্ষা ও শাসন মাথা পেতে নিতে হবে। তবেই মেয়েরা পাশ হ'তে পারবে। আবার, তাদের গর্ভে সন্তানও জন্মাবে তেমনি তুখোড়—অবশ্য যদি বিয়ের ব্যাপারে পূর্ণ সঙ্গতি থাকে। আজকাল এক রেওয়াজ হয়েছে, ছেলেরা বিয়ে ক'রে স্ব-স্ব কর্ম্মস্থলে বৌ নিয়ে একা থাকতে চায়, মেয়েরাও সংসারের দশজনের ঝামেলা সইতে চায় না, স্বামীকে নিয়ে আলাদা থাকতে পারলেই আহ্লাদ অনুভব করে, এ কিন্তু ভাল নয়। দশজনের সংসারে conflict (সংঘাত)-এর মধ্যে থেকে যে যত adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে চলতে পারে, সে তত বড় হয়। তথাকথিত সুখ, আরাম ইত্যাদি জিনিস মানুষের পক্ষে লাভজনকও নয়, লোভনীয়ও নয়। মানুষের পক্ষে লাভজনক ও লোভনীয় জিনিস হ'লো তার ইষ্টানুগ আত্ম-নিয়ন্ত্রণ। আমাদের আর্য্য-হিন্দুসমাজের বিধি-বিধান ঐটেকে লক্ষ্য ক'রে। সবসময় বুদ্ধি—কেমন ক'রে ওর (ইষ্টানুগ আত্মনিয়ন্ত্রণের) scope (অবকাশ ও সুযোগ) বাড়িয়ে দেওয়া যায়। Divorce-এর (বিবাহ-বিচ্ছেদের) মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের বালাই নেই। আমি বলি, একটা বিয়ে যদি মনঃপূত নাই হ'য়ে থাকে, তাই ব'লেই কি বিয়েটা নাকচ ক'রে দিতে হবে? অবশ্য কতকগুলি ক্ষেত্র আছে যেখানে বিয়েটাই সিদ্ধ নয়। যেমন প্রতিলোম বিয়ে শাস্ত্রসিদ্ধ নয়, বিয়েই যদি সিদ্ধ না হয়, সেখানে divorce (বিবাহ-বিচ্ছেদ)-এর কথা আসে না। তবে প্রতিলোম কোন মিলন হ'লে শাস্ত্র বলছে—সেখানে সে-মেয়েকে হরণ ক'রে শ্রেয় বরে অর্পণ করাই পুণ্য কর্ম্ম। কারণ, তার ভিতর-দিয়ে সমাজ মহা অনিষ্টের হাত থেকে রেহাই পায়। তা' ছাড়া আছে 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ, পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধিয়তে।' এ বিধানও আছে মন্দের ভাল হিসাবে। 'মৃতে' কথা আছে ব'লে অনেকে বলেন যে-কোন বিধবার বিবাহ হ'তে পারে। কিন্তু সন্তানবতী বিধবার বিবাহ হওয়া উচিত নয়। বালবিধবা যারা, স্বামীর ছাপ মাথায় পড়তে না পড়তে যেখানে স্বামী মারা গেছে, সেইসব বিধবাদের মাত্র বিবাহ দেওয়া চলতে পারে। বিধান দেওয়া আছে ব'লে প্রত্যেককে যে অন্য পতি করা লাগবে, এমন কথা নয়। তেমন খাঁটি মেয়ে যারা তারা পুনর্ব্বিবাহে রাজী হওয়া তো দূরের কথা, বাগ্‌দত্তা হ'য়ে সেখানে বিয়ে না হ'লে অন্যত্র বিয়ে করতে চায় না। এই রকমটা আমার নিজের ভাল লাগে। গোঁড়ামীওয়ালা নিষ্ঠা দেখলে আমার মাথাটা কেমন যেন শ্রদ্ধায় নোয়ায়ে আসে। তার মধ্যে যেন আমি ভারতের মানচিত্র দেখতে পাই। ভারতের কৃষ্টি যে অমর আয়ু নিয়ে বে'চে আছে ও বে'চে থাকবে সে তাদের দৌলতে। মনে রাখবেন, আপনারা কেতাবী বিদ্যা দিয়ে দেশের উপকার কমই করেছেন। দেশটাকে যুগ-যুগ ধ'রে বাঁচিয়ে রেখেছে কতকগুলি নিষ্ঠাবান, আচারবান, ভক্তিমান,

চরিত্রবান লোক, তাদের মধ্যে নিরক্ষর মেয়েছেলেদের সংখ্যা নগণ্য নয়। আজ আপনারা ফুটানি-টুটানি যা' করেন, তা' তারা যা মা'পে দিছে তার উপর দাঁড়িয়ে। নইলে আর ফুটাতে হয় না। ইউরোপ, আমেরিকায় তো ডাইভোর্স আছে, আগের স্বামীকে সামান্য কারণে ডাইভোর্স ক'রে চ'লে এসে আবার বিয়ে করেছে, এমনতর মেয়েদের গর্ভে ক'টা মানুষের মতো মানুষ জন্মেছে, একটু খোঁজ নিয়ে দেখেন যেন। আমি বাস্তব খবর জানি না, তবে এইটুকু বুঝি, ভাল হওয়ার একটা বিধি আছে; সে-বিধি না মানলে ভাল হ'তে পারে না। দ্বিচারিণী স্ত্রী সুসন্তানের জননী হবে—এ আমি বিশ্বাস করি না। তাদের মধ্যে প্রতিভা কিছু-কিছু থাকতে পারে, কিন্তু তারা যে একনিষ্ঠ হবে না, আত্মনিয়ন্ত্রণ-ব্যাপারে শিথিল ও পরাঙ্মুখ হবে—এ নির্ঘাত কথা। কী চান আপনারা একটু ভাল ক'রে ভাবে দেখেন। আমরা যে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন করতে যেয়ে দেশের মূল ধারা, মূল সম্পদ্ অনেকখানি বরবাদ ক'রে ফেলছি, স্বরাজ পেয়ে তার নিরাকরণ করতে পারব, না এই স্রোতে গা ঢেলে দিতে বাধ্য হব, তাও ভাববার কথা। একবার সত্যেন শাস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুই বামুনের ছেলে, পৈতে পরিস না কেন? সে বললো, দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্য্যন্ত পৈতে পরব না। আমি বললাম—যার জোরে বাঁচবি, কাজ করবি, তাকেই যদি আগে খতম করিস, তাহ'লে কী দিয়ে কী করবি? ও আমার কথা শুনে পরে পৈতে পরেছিল। তথাকথিত আন্দোলনগুলি বিদ্বেষ, অশ্রদ্ধা ও হীনম্মন্যতাকে যতখানি পুষ্ট করেছে, শ্রদ্ধাকে তার সিকি অংশও পোষণ দেয়নি। হাওয়া যদি এইরকম চলতে থাকে তা'হলে সমাজে, শিক্ষাক্ষেত্রে, কর্ম্মক্ষেত্রে, পরিবারে—সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে থাকবে। আমি মুখ্যু মানুষ, আমার কথা শোনেই বা কে? কিন্তু দাসীর কথা বাসী হলি কামে লাগবি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখ ভাবের আবেগে জ্বলজ্বল করছে, কথাগুলি সবার প্রাণে এক অপূর্ব্ব অগ্নিজ্বালা সৃষ্টি করছে। আস্তে-আস্তে লোকের ভিড় বেড়ে গেল। একটি মা খানিকটা পাটালি নিয়ে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বাড়ীর ভিতর দিতে ইঙ্গিত করলেন। আত্মহারা হ'য়ে ব'লে চলেছেন ঠাকুর—ভারতকে রাশিয়া, আমেরিকা বা ইংল্যান্ড ক'রে লাভ নেই। ভারত ভারত হো'ক, তবেই ভারতও বাঁচবে, জগৎও বাঁচবে। আদর্শপরায়ণতার অভাবে পাশ্চাত্য আজ তার সব শক্তি ও সভ্যতা নিয়ে নিজের কবর নিজে খুঁড়ছে, আর ভারতও তাই করতে যাচ্ছে। এতে কোন লাভ নেই। পুরুষোত্তমের পতাকা নিয়ে ভারত আবার জগৎ-সভায় মাথা উঁচু ক'রে একগাট্টা হ'য়ে দাঁড়াক—প্রেম, ভক্তি, জ্ঞানবীর্য্য-বিদ্যার পসরা মাথায় নিয়ে; দুনিয়া এসে ভারতের কাছে তখন নতজানু হ'য়ে ভিক্ষা চাইবে—'তোমরা দাও আমাদের সেই অমৃত যা' সর্ব্বার্থসাধক, যা' অন্তর ও বাহির উভয় লোকেই আমাদের সমভাবে সমৃদ্ধ ক'রে তুলবে। প্রবৃত্তি-দীর্ণ হ'য়ে

অন্তরক্ষতের জ্বালায় আমরা ম'রে যাচ্ছি, আমাদের বাঁচাও!'.........এ-পথে রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যও হস্তামলকবৎ। দুনিয়ার প্রত্যেকটি দেশ তখন বাঁচার গরজে ইংরেজদের উপর চাপ দেবে—তোমরা ভারতের বুকের উপর জোর ক'রে চেপে থাকতে পারবে না। তোমাদের বাঁচার জন্য যদি ভারতের সাহায্য প্রয়োজন হয়, তা' বরং তাদের বল, ভারত আকুণ্ঠিত চিত্তে সাধ্যমতো তোমাদের সাহায্য করবে। কিন্তু যে জাত দুনিয়ার উদ্ধাতা, তাদিগকে শোষণ করতে পারবে না, প্রভুত্ব করতে পারবে না তাদের উপর। শ্রীশ্রীঠাকুর রবিদার (বন্দ্যোপাধ্যায়) দিকে চেয়ে বললেন—আমার এ-সব কথা পাগলামী মতো লাগে, তাই না?

রবিদা—না ঠাকুর! আপনার দয়ায় সবই সম্ভব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! পরমপিতার দয়ায় তোমাদের দিয়েই এটা সম্ভব, যদি তোমরা কর। (আকুল কণ্ঠে)—পরমপিতার দয়াকে নিষ্ফল ক'রে দিও না বাছা!

রবিদা কেঁদে ফেললেন। সকলের চোখ ছলছল ক'রে উঠলো। সাশ্রুনয়নে রবিদা বললেন—যেন পারি দয়াল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর মধ্যে 'যেন' এনো না। বল 'পারব ঠাকুর! আমরাই পারব।' সুখের কথা সাহস ক'রে অন্ততঃ কওয়া শেখ। ক আর কর্ আর ভাব্। দ্যাখ্ না কী হয়!

৩রা মাঘ, শুক্রবার, ১৩৪৮ (ইং ১৭।১।৪২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃত-নিবাসে এসে বসেছেন। তিনি একখানা বই দেখবার জন্য চশমা চাইলেন, কালিদাসীমা চশমাটা এনে দিলেন। এনে দিতে-দিতে বললেন—আজকাল কত ভাল-ভাল ফ্রেমের চশমা বেরিয়েছে, চশমাটা বদলে নিলে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চশমাটা সেই কবে দিয়েছিলেন কলকাতায় ডাক্তার কার্ত্তিক বোস। অনেকদিন ধ'রে ব্যবহার করছি, ছাড়তে ইচ্ছে করে না, তা' ছাড়া কার্ত্তিক বোসের একটা স্মৃতি।

কালিদাসীমা—আপনি পুরোন কিছুই ছাড়তে চান না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার সঙ্গে আমার সম্পর্ক হয়, তাকে আমার ছাড়তে ইচ্ছে করে না। একদিনও যদি আমি কা'রও service (সেবা) পাই, তাকে ভুলতে পারি না। মানুষ সম্বন্ধে যেমন, জিনিস সম্বন্ধেও তেমন। তাই, কারও ব্যবহারের কোন জিনিস যদি কেউ আমাকে ভালবেসে দেয়, তা'ও গ্রহণ করতে আমার মন কুণ্ঠিত হ'য়ে ওঠে। ধর, আমি কোন কাজের জন্য টাকা চেয়েছি, কোন মা যদি তার গায়ের গহনা খুলে দিতে চায়, আমার কিন্তু তা' নিতে মন চায় না, যদিও তার এই উৎসর্গ-প্রবৃত্তি প্রশংসনীয়। নিনড় বস্তুগুলিরও একটা চেতন সত্তা

আছে, তারাও মানুষের স্নেহমমতার তাপ বুঝতে পারে, এমনি ক'রে তাদেরও মানুষের সঙ্গে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে, তারাও তাদের প্রিয় মানুষটির সঙ্গ খোঁজে, তার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হ'লে বেদনা বোধ করে। এগুলি বাড়ান কথা নয়, একটু নজর দিলে এ-সব বোধ করা যায়। আদৎ কথা কী জান? দুনিয়ায় অচেতন নয় কিছুই। ইট, কাঠ, মাটি, পাথর সবই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ।

প্রফুল্ল (বিস্ময়ের সঙ্গে)—সবই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, তবে প্রত্যেকটি রূপেরই বৈশিষ্ট্য আছে। সৎ, চিৎ ও আনন্দের প্রকাশ এক-একটার মধ্যে এক-এক রকমে, এক-এক পর্য্যায়ে। এইরকম ও পর্য্যায়গুলিকে জানা হ'লো বিজ্ঞান। বিশ্ব-দুনিয়াময় অণুপরমাণুর লীলা চলেছে। বিভিন্ন সত্তায় বিভিন্ন সমাবেশ, বিভিন্ন সমবায়। সমাবেশ ও সমবায়ের বিভিন্নতা অনুযায়ী হয় গুণাগুণ ও কার্য্যকারিতার বিভিন্নতা। এই অনুযায়ী আবার হয় বিশিষ্টতার পার্থক্য। সব সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ বলছ অথচ সেই সচ্চিদানন্দ কোথায় কোন্ বিশিষ্টতায় প্রকট তা যদি না জান, তাহলে বুঝতে হবে, তুমি মুখস্থ কথা বলছ, কোন বোধ নেই তোমার, অন্ধ তুমি, নিরেট তুমি। তোমার ঐ তত্ত্বকথা কা'রও কোন কাজে লাগবে না। জ্ঞান বা জানার জন্য চাই কাজ করা। সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে গেলে আবার চাই বিশিষ্টতার বোধ। তা'ছাড়া কাজ হবে না। তাই জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পরসাপেক্ষ—কাজ করতে হ'লে জানা চাই, কেমন ক'রে কী করতে হবে, আবার করতে-করতে জানা যায়, কী করলে কী হয়।

প্রফুল্ল—সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে হ'লে বিশিষ্টতার বোধ দরকার—তার মানে কী? কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, তুমি একটা গরু পুষবে। গরু পুষতে গেলে তোমার জানা চাই—গরু কী ধরণের জন্তু, তার আহার ও বাসস্থান কিরকম হওয়া প্রয়োজন। তা' না জেনে তুমি লুচি খেতে ভালবাস ব'লে যদি গরুকে রোজ লুচি তৈরী ক'রে খেতে দাও, তাহ'লে তা' কিন্তু গরুর রুচবে না। অতো ভাল খাবার দিয়েও তুমি তাকে বাঁচাতে পারবে না। আবার ধর, তুমি বন্ধ ঘরে থাকতে ভালবাস, গরুকে বন্ধ ঘরে দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে রেখে দিলে, তাতেও কিন্তু গরুর হাঁপিয়ে মরার উপক্রম হবে। আবার না হয় ধর, তুমি জান, গরু ঘাস-পাতা, তরকারীর খোসা, ভাতের ফেন এই সব খায়, কিন্তু কী পরিমাণ খাদ্য গরুর দৈনিক প্রয়োজন তা' না জানার দরুন তুমি যদি নিজের খাদ্যের বরাদ্দমতো গরুর খাদ্যের ব্যবস্থা কর, তা'তেও কিন্তু গরু না খেয়ে মরতে বসবে। আবার, তোমার গরুটা কোন্ জাতের তা'ও জানা চাই। ভাগলপুরী গাই যদি হয়, তার খাদ্য-খানা দেশী গাইয়ের মতো হবে না। তাই দেখ, কাজ করতে গেলে বিশিষ্টতার জ্ঞান দরকার হয় কি-না। সব ব্যাপারেই এমনতর। একটা

তরকারির ক্ষেত করতে হ'লেও বিশিষ্টতার জ্ঞান চাই—আলু, মূলো, কচু, কলা, কপি—সবই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভেবে যদি তুমি একইভাবে ফলাতে চাও, তা'তে কিন্তু হবে না। যার যেমনতর nurture (পোষণ) দরকার, তাকে তেমনতর nurture (পোষণ) দিতে হবে, তবে ফল পাবে। যাকে তোমরা অচেতন পদার্থ মনে কর, সেখানেও ঐ কথা। তোমার কাপড়টাকে সোডায় সিদ্ধ কর ব'লে শালটাকে সোডায় সিদ্ধ করতে পার না, তাহলে শাল আর শাল থাকবে না। দুনিয়ায় বিশিষ্টতা নিয়েই মানুষের কারবার। প্রত্যেক যা'-কিছু ও যে-কেউই বিশিষ্ট, তার পালন, পোষণ ও বর্দ্ধনও করতে হবে বিশিষ্ট রকমে, তবেই তার বৈশিষ্ট্য বজায় থাকবে। বৈশিষ্ট্য ভেঙ্গে ফেললে তার সত্তায় অপঘাত হানা হবে, তার যা' দেয় তা আর পাবে না। মহা ক্ষতি হ'য়ে যাবে। আজকাল অনেকেই বামুন অর্থাৎ বিপ্র হ'তে চায়। আমি বলি—তা'তে তোর লাভ কী? ক্ষত্রিয় যদি প্রকৃত ক্ষত্রিয় হয়, বৈশ্য যদি প্রকৃত বৈশ্য হয়, শূদ্র যদি প্রকৃত শূদ্র হয়, তার ঠেলাতেই তো দেশশুদ্ধ নিজেরা বড় হ'য়ে যেতে পারে। তা' না! নিজেদের বিপ্র ব'লে জাহির করতে চায়। ওতে কোন তরফ থেকে সুবিধা নেই। বিপ্র যতই মহান হোক, শুধু বিপ্র দিয়ে সমাজ চলবে না। সমাজের আছে বিচিত্র প্রয়োজন, শুধু বিপ্রকে দিয়ে সব প্রয়োজন সিদ্ধ হ'তে পারে না। তাই, প্রত্যেকটি বর্ণের অস্তিত্ব চাই, উন্নতি চাই। সব বর্ণের সমবায়ী প্রচেষ্টার ভিতর-দিয়েই সমাজ বড় হ'তে পারে। তা'-ছাড়া বৈশিষ্ট্যকে বর্জ্জন ক'রে, ঢং ক'রে অন্য কিছু সাজার বুদ্ধি ভাল না। অনেক বিপ্র আছে, মানুষের কাছে প্রিয় হবার জন্য অসংস্কৃত ও অসদাচারী যে-কোন লোকের বাড়ী গিয়ে পাতা পেতে বসতে দ্বিধা করে না। লোকের কাছে বড়াই ক'রে বলে, আমি liberal (উদার-বুদ্ধিসম্পন্ন), আমার কাছে ওসব superstition (কুসংস্কার) নেই। আমার কিন্তু শুনে মনে হয়, এরা অত্যন্ত narrow (সংকীর্ণ) ও superstitious. Narrow (সংকীর্ণ) এইজন্য বলছি যে, ব্যক্তিগত বাহবার খাতিরে, আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকীর্ণ স্বার্থে সে তার পিতৃপুরুষের সদাচারের ধারাকে পদদলিত করতে কুণ্ঠিত হয় না, আর superstitious (কুসংস্কারসম্পন্ন) এইজন্য বলছি যে, তার ধারণা যে বর্ণাশ্রম, যা' কিনা জাতির উন্নতির মেরুদণ্ড, তাই ভেঙ্গে দিতে পারলেই জাতির একতা ও কল্যাণ হবে। এর চাইতে মূঢ় কুসংস্কার আর কী থাকতে পারে? Free thinking-এর (স্বাধীন-চিন্তার) নাম দিয়ে, হীনম্মন্যতা-প্রসূত বৈশিষ্ট্যবর্জ্জনী উচ্ছৃংখল মতবাদের প্রশ্রয় দিয়ে আমাদের তথাকথিত শিক্ষিতেরা যতখানি কুসংস্কারাপন্ন হ'চ্ছে, আমাদের দেশের নিরক্ষরেরা কোনদিন ততখানি কুসংস্কারাপন্ন হয়নি। তাদের শ্রদ্ধা ছিল, ভক্তি ছিল, আস্থা ছিল, নিয়ম ছিল, আচার ছিল, নিষ্ঠা ছিল। কোন-কোন জায়গায় যুক্তি-বিচার ছিল না, মাত্রাহীন

বাড়াবাড়ি ছিল, তা'তে যে ক্ষতি হ'তো, তার একটা সীমা আছে, সংশোধনও আছে। কিন্তু অজানা যুক্তিবিচারের নামে হীনম্মন্যতা ও প্রবৃত্তিপরায়ণতাই যেখানে প্রভু ও গুরুর আসনে আসীন, যেমনতর লোকের লেখাই হোক, ইংরেজী ভাষায় quotation (উদ্ধৃতি) হ'লেই তা' যেখানে শাস্ত্রবাক্য, তার দ্বারা যে ক্ষতি হয় ও হ'চ্ছে তার কোন সীমা-সংখ্যা নেই, জাহান্নমের আগে তার পরিসমাপ্তি ও সংশোধন হ'তে পারে কিনা জানি না। সেকালে অনিয়ন্ত্রিত লোকের লেখাকে ও মতবাদকে মানুষ কোন মূল্য দিত না, তা' যতই জোরালো হোক, যতই চিত্তাকর্ষক হোক। তখন ঋষিরাই ছিলেন সমাজের নিয়ন্তা; মানুষের প্রবৃত্তি যা'তে উস্কানি না পায়, তার সদ্বৃত্তি যা'তে স্ফুরিত হয়, সেই ছিল তাঁদের বুদ্ধি। শিক্ষা-দীক্ষা, বিয়ে-থাওয়া, সমাজব্যবস্থা ইত্যাদির কাঠামো ছিল তেমনতর। তাঁরা মানুষের প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করেননি, বা তাকে নিরুদ্ধও করতে চাননি, কিন্তু চেয়েছেন, কী ক'রে তাকে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে সুফলপ্রসূ ক'রে তোলা যায়, ব্যষ্টিসহ সমষ্টির বাঁচা-বাড়ার উপযোগী ক'রে তোলা যায়,—এই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। ঋষির অনুশাসন যতদিন বলবৎ ছিল সমাজে, ততদিন সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হ'তো কম। কিন্তু আজ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সম্মুখীন হ'য়ে সবই যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষাকে আমি দোষণীয় বলি না। দোষণীয় বলি শিক্ষার বদহজমকে, আত্ম-অবজ্ঞাকে। মানুষ যদি স্বকীয় কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যকে আচ্ছাসে পাকড়ে ধ'রে আত্মস্থ না থাকে, তাহ'লেই এমনতর বিপর্য্যয় দেখা দেয়। সে তখন বাইরের জিনিসটা assimilate (আত্মীকৃত) ক'রে আত্মপুষ্টি সংগ্রহ করতে পারে না, বরং তার খোরাক হ'য়ে পড়ে। আমাদের হয়েছে সেই অবস্থা। তাই পাশ্চাত্য শিক্ষার ভাল দিকটা আমরা গ্রহণ করতে পারিনি। ওদের efficiency (দক্ষতা), inquisitiveness (অনুসন্ধিৎসা), industrious habits (শ্রমপরায়ণতার অভ্যাস), practicality (বাস্তবতাজ্ঞান), determination (সঙ্কল্প), will (ইচ্ছাশক্তি), scientific trend (বৈজ্ঞানিক ধারা), sense of national prestige (জাতীয় মর্য্যাদাবোধ) আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়নি। আমরা না জলের, না স্থলের, না উভচর, আমরা যেন ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে ঝুলছি। আমাদের অনেকের পায়ের তলার মাটি গেছে স'রে, তাই আমাদের নিজস্ব যা' তা' ছাড়া চমকপ্রদ নতুন কিছু পেলেই আমরা হ্যাংলার মতো কাণ্ড করতে থাকি। লজ্জায়, ঘৃণায়, আপসোসে আমার বুকখানার মধ্যে কেমন যেন করতে থাকে। আবার মজা এমন, সঙ্গীতহীন কতকগুলি বাজে কপচানি মাথায় পুরে তারা নিজেদের মনে করে খুব শিক্ষিত। অহঙ্কারে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। অথচ পরের চাকর না হ'লে স্বাধীনভাবে পেটের ভাত জোগাড়ের মুরোদ নেই। ফলকথা, শ্রদ্ধা না থাকলে মানুষ অন্তঃসারশূন্য হ'য়ে পড়ে। মানুষের

শ্রদ্ধার ভাণ্ডার শূন্য ক'রে দিয়ে, হৃদয়কে শুকিয়ে তুলে, মগজ ও যুক্তি-বুদ্ধিকে যতই পুষ্ট করা যাক না কেন, তা'তে কল্যাণ নেই মানুষের। আমার সোনার দেশ শ্মশান ক'রে ফেললো পাঁচ ভূতে মিশে। যে-দেশে ঘরে-ঘরে দেবতা জন্মাতো, সে-দেশে বিশ গাঁও খুঁজে আজ একটা মানুষের মতো মানুষ পাওয়া যায় না। অথচ জানি, ভোল ফিরিয়ে দেওয়া কঠিন কিছু নয়, মন করলেই হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি শাণিত তীব্রতা নিয়ে সবার অন্তরে বিদ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। ভালের ঘরের পরতে-পরতে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে আছে তার অনুরণন। আজও যদি কেউ সেখানে গিয়ে মনের একতানতা নিয়ে ধ্যানতন্ময় হ'য়ে প'ড়ে, সে টের পাবে, কত প্রেরণামন্ত্র লীন হ'য়ে আছে ঐ পুণ্য-প্রকোষ্ঠের প্রাণবেদীতে।

সবাই স্তম্ভিতের মতো নির্ব্বাক হ'য়ে আছেন। মন স্থির, নিঃশ্বাসের গতি স্তিমিত, অবিন্যস্ত ও বিক্ষিপ্ত চেতনা একায়িত ও কেন্দ্রীভূত হ'য়ে তার আরামের ভূমিতে অধিষ্ঠিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর আনমনাভাবে চেয়ে আছেন বাইরের দিকে। হঠাৎ প্যারীদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কাজলার সর্দ্দি কেমন?

প্যারীদা—কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর মাকেও একটু ওষুধ খাইয়ে দিস, তার আবার সর্দ্দি না করে।

প্যারীদা—আচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন ক'টা বাজে?

হরিপদদা—সাড়ে আটটা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অন্যদিন কেষ্টদা আসে, আজ তো আসলো না।

প্রফুল্ল—ডাকব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, ডাকবার দরকার নেই। হয়তো কাজকাম করতিছে।......... এতগুলি মানুষকে nurture (পোষণ) দেওয়া, mould (গঠন) করা তো কম কথা নয়। কেষ্টদার কাছে সবসময় এক দঙ্গল লোক থাকেই। যখন যারা যায়, তাদের একেবারে যাজনে মাৎ ক'রে রাখে। মানুষটার নেশাই এই। ঐরকম নেশাপাগল লোক লাগে। গোপালেরও খুব নেশা ছিল। গোপাল যেয়ে কেষ্টদার আর দোসর নেই। তোর ও বীরেনের science (বিজ্ঞান) পড়া থাকলি ভাল হ'তো। Science (বিজ্ঞান) পড়লে concrete (বাস্তব)-এর দিকে নজর যায় বেশী ক'রে।

প্রফুল্ল—কতসময় কতরকম কাজের কথা আপনি কন, তাই মনে হয়, আপনার কাজ করতে গেলে সবজান্তা হওয়া দরকার, নচেৎ আপনার কাজ করা সম্ভব নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সবজান্তা হ'য়ে কেউ কাজে নামে না। কাজ করতে-করতে

সবজান্তা না হ'লেও বহুজান্তা হ'য়ে ওঠে মানুষ। সেইজন্য মানুষকে গোড়ায় একজান্তা হ'তে হয়, তখন সেই একের খাতিরে, তাঁর পোষণপূরণের ধান্ধায় সে সব-জানার পথে এগিয়ে যায়। জ্ঞানবিদ্যের কচকচি যা' কও, ও-সব কিছুই কিছু না। মূল বস্তু হ'লো তাঁ'তে টান, নাংলা টান, এর মধ্যে কোন কারচুপি থাকবে না, কোন মতলব থাকবে না। ইষ্টকে সুখী করব, তাঁকে শান্তি দেব, তাঁর সন্তোষ যা'তে হয়, তৃপ্তি যা'তে হয় তাই করব আমার সারা জীবন দিয়ে, দুনিয়াটা দিয়ে। আত্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কথা শুনতে কত বিরাট ব্যাপার মনে হয়, কিন্তু মানুষ ভালবাসার দায়ে ছাড়তে না পারে, করতে না পারে, ধরতে না পারে এমন কিছু নেই। লহমায় মানুষের রূপ বদলে যায়, চণ্ডাশোক প্রিয়দর্শন হয়, রত্নাকর হয় বাল্মীকি। হ্যাঁ, চেহারাই বদলে যায়—রুক্ষ, ক্ষুব্ধ, বিরক্ত চোখমুখ কোমল, কমনীয় হ'য়ে ওঠে, দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছা যায়। বাইরে গিয়ে যাজন যে করবে, এই ভালবাসার চেহারা নিয়ে গিয়ে দাঁড়াও, দেখবে অর্দ্ধেক ফর্সা। আমাদের মন যখন যে ভাবভূমিতে থাকে, চেহারার মধ্য-দিয়ে তার একটা aura (জ্যোতিঃ) বেরোয়, অন্যের কাছে গেলে পরস্পরের aura (জ্যোতিঃ)-র মধ্যে interaction (পারস্পারিক ক্রিয়া) হয়। প্রবৃত্তি-মুখী মানুষের aura (জ্যোতিঃ) অন্যকেও প্রবৃত্তির দিকে টানে। তাই তোমাদের ইষ্টপ্রাণতার aura (জ্যোতিঃ) যেন এতখানি শক্তিমান হয়, গাঢ় হয়, যার কাছে লাখ প্রবৃত্তি-পরায়ণতা নিষ্প্রভ হ'য়ে যায়, ফিকে হ'য়ে যায়। সেইজন্য যাজন করতে গেলে যজন খুব ভালভাবে করা লাগে, তা'ছাড়া একঘণ্টা যজন করলাম, একঘণ্টা যাজন করলাম, পাঁচ মিনিট ইষ্টভৃতি করলাম, আর বাদবাকী সময় আমার চিন্তা, চলা-বলায় ইষ্টের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, এতে কিন্তু নোঙর ফেলে দাঁড় টানার মতো হবে, চরিত্র শোধরাবে না। Wholetime (সর্ব্বক্ষণ) ঠাকুরের মানুষ হ'য়ে চলা লাগবে, সে খেতে, শুতে, বসতে, চলতে, ফিরতে। 'অর্থোপার্জ্জন-কর্ম্মে' রত থাকি যখন, তখন দেখতে হবে ধর্ম্মোপার্জ্জন কতখানি হ'চ্ছে তার ভিতর-দিয়ে, স্ত্রী-সম্ভোগে রত থাকি যখন, তখন দেখতে হবে ইষ্ট-সম্ভোগ অর্থাৎ মঙ্গল-সম্ভোগ কতখানি হ'চ্ছে তার ভিতর-দিয়ে। ফলকথা, আমার জীবনের যাবতীয় যা'-কিছু অবিচ্ছিন্নভাবে ইষ্টার্থে পরিচালিত হ'চ্ছে কিনা তার উপর খবরদারী করতে হবে সর্ব্বক্ষণ। এমনতর একমুখী হ'য়ে জীবনযাপনের ফলে চরিত্রের মধ্যে আসে integration (সংহতি), তার ফলে গজিয়ে ওঠে ব্যক্তিত্ব, সেই ব্যক্তিত্ব প্রভাবিত করতে পারে অন্যকে। নইলে, যুক্তি-বিচার দিয়ে মানুষকে তুমি কতটুকু বোঝাবে? প্রত্যেক জিনিসের for-এ (অনুকূলে) যেমন যুক্তি আছে, against-এও (প্রতিকূলেও) তেমনি যুক্তি আছে। গোড়ার কথা হ'লো তার শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করা, অন্তরকে আকর্ষণ করা, আর চরিত্র না থাকলে, ব্যক্তিত্ব না থাকলে তা' পারবে না। কথায় বাজীমাৎ

করার জন্য হাজারো জায়গা থেকে হাজারো লোক বেরিয়ে পড়েছে। আচরণহীন উপদেশ শুনে-শুনে মানুষের ঘেন্না ধ'রে গেছে। লোকে সেয়ানা হ'য়ে গেছে, ফাঁকিজুকির কারবার বেশীদিন টেকে না বাপু! তাই কইঃ তোমরা যেমন সাচ্চা মাল, সাচ্চা খবর নিয়ে মানুষের দুয়োরে যাচ্ছ, তোমাদের চরিত্রটিকেও তেমনি সাচ্চা ক'রে তোল। তোমাদের মধ্যে মেকী জিনিস থাকলে মানুষ মনে করবে, তোমরা যে জিনিসের বার্ত্তা ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছ তাও মেকী। দেখো, নিজের চলার দোষে মানুষকে পরমপিতা হ'তে বঞ্চিত ক'রো না। ভাল করতে এসে মন্দ ক'রো না, মানুষের ক্ষতি ক'রো না। বরং নিজের মধ্যে কোন unadjusted, glaring (অনিয়ন্ত্রিত, অতিদুষ্য) গলদ যদি থাকে, যার দ্বারা মানুষ আচমকা shocked (আহত) হ'তে পারে, তা' প্রয়োজনমতো আগে থাকতে খোলাখুলি জানিয়ে রাখা ভাল। এইভাবে বলতে হয়—'দেখেন দাদা! কথা আমরা অনেক শিখেছি, কিন্তু ঠাকুর যেমন বলেন তেমনভাবে চলতে শিখিনি। আপনি হয়তো আমার মুখে ঠাকুরের কথা শুনে কত খুশি হয়েছেন। ভেবেছেন, আমার চলন-চরিত্রও ঠাকুরময়, কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে তা' নয়। ছেলেবেলা থেকে আমি বড় রাগী, রেগে গেলে আমার জ্ঞান থাকে না, আগের থেকে রাগ অনেকটা কমেছে, কিন্তু এখনও মাঝে-মাঝে বেসামাল হ'য়ে পড়ি। আমার জন্য পরমপিতার কাছে রোজ একটু প্রার্থনা করবেন—যা'তে আমি এই দোষটা ত্যাগ করতে পারি। আর, আপনার সঙ্গে চলতে-ফিরতে রাগের বশে বেফাঁস যদি কখনও কিছু ব'লে ফেলি বা ক'রে ফেলি, তা'তে আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না কিন্তু। রাগের মাথায় আমার কিছু ঠিক থাকে না, পরে অনুতাপে জ্বলে মরি।' মানুষ যদি শুভার্থী ও অকপট হয়, দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও অন্যের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে সে। নইলে সাধুতা নেই সাধুতার ভড়ং আছে, আর সাধুর প্রাপ্য শ্রদ্ধা আদায় করার কারসাজি আছে, এতে মানুষ বিরক্ত হ'য়ে যায়।............কথায় কয়—'ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা।' তোমরা এমন সাধু হও, এমন সজ্জন হও, যাদের সঙ্গে মুহূর্ত্তমাত্র সঙ্গ ক'রেও মানুষ ত'রে যেতে পারে সেটা শুধু মৃত্যুর পর পরকালের ব্যাপারে নয়, ইহকালে—ভবলোকে যা'তে প্রবৃত্তিবশ হ'য়ে তাকে নাকানি-চুবানি না খেতে হয়, সে যা'তে সদ্ভাবে জীবনটাকে উপভোগ করতে পারে আর দশজনের সঙ্গে, তা' ক'রে দেওয়া চাই। তাই বুঝে দেখ—তোমাদের কতখানি সাধনা দরকার।

প্রফুল্ল—ঠাকুর! আপনি যে বিপ্রের যেখানে-সেখানে খাওয়ার বিষয় অতো নিন্দা করলেন, কিন্তু অন্য বর্ণের অন্ন খেলেই কি বিপ্রের জাত যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তা' বলব কেন? আমি বলেছি, অসংস্কৃত ও অসদাচারী যারা, তাদের হাতে খাওয়া ঠিক নয়। দ্বিজ-সংস্কারী যারা, সদাচারী যারা, তাদের পরস্পরের অন্ন পরস্পর খেতে পারে। তবে এ নিয়ে কোন জোরাজুরি

চলে না। ধর, তুমি উপনয়ন নিয়েছ ও মোটামুটি সদাচার পালন ক'রে চল, তাই ব'লে তোমার বাড়ীতে কোন বিপ্র আসলে যে বুড়ী তাকে রান্না ক'রে খাওয়াবে, সে কিন্তু ঠিক নয়। তার আলাদা রান্নার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়াটাই সমীচীন। যদি সে নাছোড়বান্দা হ'য়ে তোমাদের হাতে খেতে চায়, তাও প্রতিনিবৃত্ত করতে বিশেষভাবে চেষ্টা করা উচিত। যদি দেখ, তা'তে সে খুব ব্যথিত হ'চ্ছে, সে-ক্ষেত্রে এমনতর খাদ্য দিতে পার যা'তে তোমার বা তার বৈশিষ্ট্য ব্যাহত না হয়। কিন্তু তোমাদের তরফ থেকে বিপ্রকে পক্ক অন্ন খাওয়াবার আগ্রহ অপরাধজনক। আমার মনে হয়, কোন সদাচারী বিপ্রের বাড়ীতেও যদি কোন সদাচারী বৈশ্য যায়, বিপ্রেরও তাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, সে স্বপাক খাবে কিনা, তাকে আলাদা পাকের ব্যবস্থা ক'রে দেবে কিনা। তা'তে বৈশ্য হয়তো বলবে—সে কি কথা? আপনাদের প্রসাদ পাবার জন্যই তো এসেছি। তখন তাকে নিশ্চিন্ত মনে অন্ন দেওয়া চলে। আর, বৈশ্য যদি স্বপাকী হয়, তবে বিপ্রও তার আলাদা পাকের ব্যবস্থা ক'রে দেবে—সশ্রদ্ধভাবে, সাগ্রহে। নিজের ও অপরের বৈশিষ্ট্যকে শ্রদ্ধা ও সংরক্ষণ ক'রে চলাই সভ্যতার একটা গোড়ার কথা। বিপ্র যদি উদারতার নামে নিজের বৈশিষ্ট্য খোয়ায় তা'তে তার যেমন অকল্যাণ, অন্যেরও তেমনি অকল্যাণ। বিপ্রের যদি শ্রদ্ধাকর্ষী আচার না থাকে, তবে বিপ্রেতর বর্ণের শ্রদ্ধা সে আকর্ষণ করতে পারবে না, তা'তে সে তাদের উপকারে লাগতে পারবে না। শ্রেয়ের প্রতি শ্রদ্ধাই মানুষের উৎকর্ষের একমাত্র পথ। তাই, শ্রেয় হ'য়ে যে জন্মেছে, তার চলন এমন হওয়া চাই যা'তে অন্যের অন্তরে শ্রদ্ধার উদ্বোধন হয়। তা'তেই সবার কল্যাণ। এয়ারী সার্ব্বজনীনতায় মানুষের কল্যাণ হয় না। নব্যযুবকেরা হয়তো বলবে—এ-সব বুর্জোয়া মনোবৃত্তির পরিচায়ক। কিন্তু আমি কই—বাপু! আমাদের যত গালাগালিই দাও, ভেবে দেখ—আমরা যা' কই তা'তে ব্যক্তিগতভাবে তোমার সুবিধা বজায় থাকে কিনা। আর আমি হলপ ক'রে বলতে পারি—আমাদের যা' কথা তা' মেনে চললে কোন সত্তারই অসুবিধা হবার কথা নয়, অবশ্য সবার প্রবৃত্তির পক্ষে তা' রুচিকর না-ও হ'তে পারে। কিন্তু ভেবে দেখবি তো পাগল! সত্তার জন্য প্রবৃত্তি, না, প্রবৃত্তির জন্য সত্তা? প্রবৃত্তির তাঁবেদারি যদি করিস সত্তাকে দিয়ে, তুই দাঁড়াবি কোথায়? বাঁচতে তো চাস, না, মতলব অন্য কিছু?

৩রা মাঘ, শুক্রবার, ১৩৪৮ (ইং ১৭।১।৪২)

বেলা চারটে আন্দাজ হবে। শ্রীশ্রীঠাকুর বেড়াতে বেরিয়েছেন। সঙ্গে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্যারীদা (নন্দী), বিরাজদা (ভট্টাচার্য্য), যোগেশদা (চক্রবর্ত্তী), নিবারণদা (বাগচী), শরৎদা (সেন), শশধরদা (সরকার), ইন্দুদা (বসু),

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), সরোজিনীমা, রেণুমা, কুমারখালির-মা, লীলামা, দুলালীমা, মানদামা (প্রফুল্লর মা) এবং আরো বহুলোক। শ্রীশ্রীঠাকুর মহানন্দে গল্প করতে-করতে এগিয়ে চলেছেন। ভক্তবৃন্দও তাঁর সান্নিধ্য পেয়ে পরম পুলকিত। সবারই চোখ-কান তাঁতেই নিবদ্ধ। গাঁয়ের পথের সরু গলি, পাশাপাশি অনেক লোক একসঙ্গে এক লাইনে যাওয়া যায় না, তাই অনেককে জায়গায়-জায়গায় শ্রীশ্রীঠাকুর থেকে খানিকটা পিছনে প'ড়ে যেতে হ'চ্ছে। অনেকেরই প্রয়াস অন্যকে পিছনে ফেলে হুড়োহুড়ি ক'রে এগিয়ে যাবার। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল যাঁরা তাঁরা এর দরুন অসুবিধায় প'ড়ে যাচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইটে লক্ষ্য ক'রে বললেন--আমার হিসাব উল্টো ধরণের। আমি ভাবি, অন্যকে সুবিধা-সুযোগ যতখানি দিতে পারলাম, আমি ততখানি জিতে গেলাম। অনেকে এর দরুন আমাকে মনে করে আমি বোকা, কিন্তু তা' মোটেই না, আমি ওদিক দিয়ে সেয়ানা আছি, স্বার্থবুদ্ধি আমার ষোল আনা। আমি দেখি, মানুষকে সুবিধা দিলে সে খুশি হয়, সেই খুশির একটা অভিব্যক্তি সাধারণতঃ দেখা দেয় তার মুখে। আর, একজনের জীবনীয় খুশির কারণ হলাম, এতে নিজের অন্তঃকরণটা যতখানি হৃষ্টপুষ্ট হ'য়ে ওঠে, নিজে সুবিধা পেয়ে তা' হয় না। তাই ওইখানেই তো আমার করার দাম উঠে গেল। পরে সে কী করলো-না-করলো তার জন্য আমি মাথা ঘামাই না। আর, আমি কোন প্রত্যাশাই রাখি না। প্রত্যাশা রাখতেই বা যাব কেন? যে-অবস্থায় যার জন্য যা' না করলে নয়, আমি তাই করি। আমার বাঁচার জন্যই সেটা করি। আমি প্রত্যক্ষভাবে টের পাই--কারও সত্তা ক্ষুণ্ণ হ'লে আমিই ক্ষুণ্ণ হ'য়ে পড়ি। তাই নিজের দায়ে করি। আমি কি পাগল না বেকুব যে নিজের ক্ষতি হ'তে দেব? নিজের ভাল নিজে করব না? তাই, জ্ঞানবুদ্ধি-সাধ্যিতে যতটুকু কুলোয় ক'রে যাই।

যেতে-যেতে গেষ্টহাউসের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে একটু বেঁকে কেষ্টদার দিকে চেয়ে বলছেন--দ্যাখেন কেষ্টদা! আমি যে পারিপার্শ্বিকের সেবার কথা বলি, সেটা কিন্তু নীতিকথা হিসাবে নয়। বাস্তব ব্যাপার হ'লো, পরিবেশই আমাকে বাঁচাবার মালিক, তাই বাঁচা-বাড়াই যদি ধর্ম্ম হয়, তবে পরিবেশকে বাঁচান-বাড়ানর জন্য যা'-যা' করণীয় তা' আমাকে করতেই হবে। এ হ'লো অকাট্য কথা--এর মধ্যে কোন philosophy (দর্শন) নেই, কোন ism (বাদ) নেই। বোধহীন যে, তারও সত্তায় হাত রেখে এটা বুঝিয়ে দিতে পারেন। এর মধ্যে কোন philosophy (দর্শন) নেই, কোন ism (বাদ) নেই বলছি, তা'ও যেমন সত্য, আবার কোন philosophy (দর্শন), ism (বাদ), ideology (মতবাদ), politics (পূর্ত্তনীতি) বা moral principle (নীতি) যদি থাকে, যা' কিনা মানুষের কাজে লাগতে পারে, তা' ঐ সত্যকে ভিত্তি ক'রেই। এইখানে দাঁড়ালে টের পাবেন--আমি যাজন ও দীক্ষাদানের কথা

অতো ক'রে কই কেন?

বাঁচার ব্যাপারে ইষ্টানুসরণ ও পরিবেশকে বাঁচান-বাড়ানর উপযোগী সেবাদানের অপরিহার্য্য প্রয়োজনের বিষয় যে মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝেছে, তার কি যাজন না ক'রে উপায় আছে, মানুষকে সেবা না দিয়ে উপায় আছে? ইষ্টপ্রাণ, বুঝমান ও চরিত্রবান লোক যদি হয়, সে হবে আপনারা যাকে যাজনজৈত্র কন, তাই। চরিত্রবান মানে আচারবান, অভ্যাসবান—ইষ্টের অনুগামী হবে সে চলনে, চরিত্রে, অভ্যাসে, আর পরিবেশের সেবা হবে তার আত্মসেবার সামিল—সেটাও শুধু মাথার বুঝে নয়—চলনে, চরিত্রে, অভ্যাসে। তখন তার জেল্লা হবে এমন যে আগুন দেখলে পোকামাকড় যেমন তা'তে ঝাঁপ না দিয়ে পারে না, তাকে দেখলেও লোকে তেমনি কাছে ছুটে না এসে পারে না। তার আকর্ষণ হবে এমন যে, চুম্বকে যেমন ক'রে লোহা টানে, সে-ও তেমনি ক'রে সবাইকে টানবে। মানুষের বাড়ীতে গেলে তাদের কুকুরটা, বিড়ালটা, গরুটা পর্য্যন্ত তার গা ঘেঁসে এসে দাঁড়াবে। এর কোনটা কাব্যকথা নয়, বাড়ান কথা নয়; ক'রে দেখেন, কাঁটায়-কাঁটায় মিলে যাবিনে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্ব্ব অঙ্গ দিয়ে যেন এক অপার্থিব প্রেরণার স্ফুলিঙ্গ নির্গত হ'চ্ছে, তা' উপস্থিত সকলকে স্পর্শ ক'রে তাতিয়ে তুলছে, মাতিয়ে তুলছে, একটা সর্ব্ববিগাহী সুখ-বেঘোরে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পেছন ফিরে একবার তাঁর মেদুরমধুর অমৃতদৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন সবার উপর দিয়ে, পরে সহজভাবে বললেন—চল!—এই ব'লে হাঁটতে সুরু করলেন। সবাই চললেন পিছনে।

কেষ্টদা আগের কথার জের টেনে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, আপনি যে আমাদের জন্য এত করেন, এর বিনিময়ে আপনি কি কিছুই প্রত্যাশা করেন না আমাদের কাছ থেকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি যে পণ্ডিতের জন্য এত করেন, আপনি পণ্ডিতের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করেন?

কেষ্টদা—প্রত্যাশা আর কিছু করি না—ভাবি, ও সুস্থ ও দীর্ঘজীবী হো'ক, সুশিক্ষিত হো'ক, মানুষ হো'ক, আপনার কাজে লাগুক, আমি যা' পারলাম না, ও তা' পারুক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে দেখুন, আপনার নিজের জন্য কোন চাহিদা নেই ওর কাছ থেকে। এ কথা আপনি কখনও ভাবেনও না যে ও আপনাকে কামাই ক'রে খাওয়াক। ওর ভালটাই আপনার একমাত্র চাহিদা। আর চান আপনার ধারাটা, আপনার বংশের ধারাটা বজায় থাকুক ওর ভিতর। তাই বলে সন্তান। গানের যেমন তান, মানুষেরও তেমনি সন্তান। তান যেমন গানের রেশ টেনে গানকে বাঁচিয়ে রাখে, সন্তানধারাও তেমনি মানুষের জীবনকে অমর ক'রে রাখে। তান

যেমন গানের বিস্তার, সন্তানও তেমনি আপনার-আমার আরোতর বিস্তার। তান ও সন্তানের root meaning (ধাতুগত অর্থ) কী কেষ্টদা?

কেষ্টদা—দুটোই এসেছে তন্-ধাতু থেকে! তন্-ধাতু মানে বিস্তার।

শ্রীশ্রীঠাকুর (উল্লসিত হ'য়ে)—সত্যি তাই?

কেষ্টদা হেসে বললেন—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—দেখেন শালা, মুখ্যু হ'লি কি হয়? পরমপিতা কেমন যেন ধরায়ে দেন। বাংলা অনেক কথার প্রচলিত মানে যা' তার কিছু-কিছু হয়তো জানি, কিন্তু তা'তে সবসময় যেন মন ভরে না। তখন নিজে-নিজে অনেকসময় এক-একটা কথা নিয়ে জাবর কাটি, হঠাৎ তার প্রাণের ধুকধুকিটা যেন টের পেয়ে যাই। তখন আবার আপনাদের অনেকসময় dictionary (অভিধান) দেখতে বলি, প্রায়ই দেখি, পরমপিতার দয়ায় মিলে যায়। কোন-কোন সময় আপনারা dictionary (অভিধান) দেখে যখন পান না, তখন দেখেন না আমি জোর দিয়ে বলি—খুঁজে দেখেন, আছে,—সে বলি কিসের জোরে? জোর আমার কেবল এক জোর—পরমপিতার জোর। আমি তাঁর হাতধরা হ'য়েই আছি, আমার যে আর কোন সম্বল নেই। আপনারা বিদ্বান, বুদ্ধিমান, আপনারা আর পাঁচটা জিনিসের উপর নির্ভর করতে পারেন। কিন্তু আমার তিনি ছাড়া আর কে আছে, আর কী আছে? আমার তাই তাঁকে বিস্মরণ হওয়া পোষায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাঁটতে-হাঁটতে কাশীপুরের রাস্তার দিকে বেশ খানিকটা এসেছেন। দিনমণি তখন অস্তাচলে, গ্রাম্য প্রতিবেশে কেমন একটা নীরব, নিথর ভাব। কাশীপুরের মাঠের বিরাট বটগাছটার অন্ধকার-আঙ্গিনায় কি যেন একটা গহীন গোপন রহস্য কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। মনটা আপনা থেকে কেমন যেন করুণ, উদাস হ'য়ে ওঠে। তার উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলির মধ্যে এক অন্তর্গূঢ় আর্ত্তি ও আত্ম-নিবেদনের আকুল ইঙ্গিত। সবাই স্তব্ধ হ'য়ে আছেন, কারও মুখে কোন কথা নেই। শ্রীশ্রীঠাকুরের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে হেঁটে চলেছেন সবাই।

'কি রে গন্ধ! কোনে যাস'—

প্রাণকাড়া মধুর কণ্ঠে ধ্বনি তুললেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

গন্ধ সরকারও খুশিতে উছলে উঠে বললো—যাব আর কোনে? আপনাকে দেখে বা'র হ'লেম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' বেশ! ছাওয়াল-পাওয়াল ভাল আছে তো? ধান-কলাই কেমন পালু?

গন্ধ—ছাওয়াল-পাওয়াল আল্লা ভালই রাখেছে। মাঝে ছোটডার বড় সর্দ্দি হইছিল, তা' আশ্রম থেকে ওষুধ আনে দিছি, এখন কম পড়েছে। আর, ধান-কলাইয়ের অবস্থা এবার সুবিধে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আউসের খন্দ জোর লাগা। খা'টে খালি মানুষের অভাব

কোথায়? তোর ছোট্ট সংসার, একটু মাথা খাটিয়ে পরিশ্রম করলি ভা'সে যায়, আরো পাঁচজনরে খাওয়াতি পারিস। এক-একজন তো শুনি, গরুর গাড়ী বা টমটম চালায়ে বা ছোটখাট গেঞ্জীর ব্যবসা ক'রে কতো পয়সা কামায়। তোর বুদ্ধির কাছে তো তারা দাঁড়াতি পারে না। তুই একটা-কিছু নিয়ে লাগলিই হয়।

গন্ধ—কিছু করতে গেলেই টাকা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—টাকার কি অভাব হয় নাকি মানুষের?

এরপর গন্ধ চ'লে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুরও আশ্রমের দিকে ফিরলেন। চলতে-চলতে কেষ্টদার দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন—সবার ঐ এক সুর। কিছু করতে গেলে টাকা লাগে, সুযোগ-সুবিধা লাগে। তা' পাই কোথায়? কিন্তু আপনি তাদের টাকা ও সুযোগ-সুবিধা দিয়ে দেখেন, অনেকেই তার সদ্ব্যবহার করবে না। যেজন্য টাকা নেবে সেজন্য টাকা খরচ না ক'রে হয়তো অন্য ব্যাপারে খরচ ক'রে ফেলবে, কিংবা মনে ঐ মতলব রেখে বাইরে অন্য কথা ব'লে টাকা নেবে। ফলকথা, অনেকের ভাঁওতা দিয়ে খাবার বুদ্ধি থাকে, কিন্তু ওটা যে কত কঠিন ও কষ্টকর তা' বোঝে না। ভাঁওতা ক'জনকে ক'দিন দেওয়া যায়? তখন যে সবাই ঘেন্না করতে থাকে, দূর-দূর করতে থাকে। সে কি কম গ্লানি? কম কষ্ট? তার চাইতে সৎ-ভাবে পরিশ্রম ক'রে খাওয়া ঢের সোজা। কতকগুলি মানুষ আছে, তাদের গোলামী ক'রে জীবন-যাপন করা ছাড়া উপায় নেই। সেবায় মানুষকে লাভবান ক'রে যে পেটের ভাত জোগাড় করা যায় এ-কথা তারা বিশ্বাসই করে না। বিশ্বাস করে না ব'লেই ভাঁওতা দিয়ে, ধাপ্পা দিয়ে দিন চালাতে চায়। এর মূলে আছে pauperism (দারিদ্র্যব্যাধি)। আবার, নিজেরা pauper (দারিদ্র্য-ব্যাধিগ্রস্ত) ব'লেই সবসময় অশ্রদ্ধাপরায়ণ ও ঈর্য্যাপরায়ণ হয়। কোন মানুষকে বহুলোক শ্রদ্ধার চোখে দেখে—এমনটা দেখলেই তাদের চোখ টাটায়। তাকে তখন হেয় প্রতিপন্ন না করতে পারলেই সে যেন মহা ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়ে পড়ছে। কোন লোক সততা ও দক্ষতার জোরে ধনী বা কৃতী হয়েছে শুনলে সে তখনই বলবে, মশায়! রেখে দেন, পরকে ঠকিয়েছে কত, শোষণ করেছে কত, সর্ব্বনাশ করেছে কত, দাবিয়ে রেখেছে কত তা' তো জানেন না। অমন কৃতকার্য্যতার কোন দাম নেই। আর, লোকটা ইতর, খোশামুদের একশেষ, স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য দরকার হ'লে মানুষের পা চাটতে পারে। কিন্তু যার সম্বন্ধে এই মন্তব্য করছে, সে আদতে হয়তো বিনয়ী ও শ্রদ্ধাবান, প্রত্যেককে যথাযোগ্য মর্য্যাদা ও সম্মান দিয়ে চলে। তাহ'লে কি হবে? যাকে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা। অবজ্ঞা যেখানে থাকে, সেখানে মানুষের গুণটাও দোষ ব'লে প্রতিভাত হয়। আবার, নিজেরা কতকগুলি অবগুণে আবদ্ধ ও আসক্ত ব'লে সেইগুলির সমর্থনে বড়-বড় গালভরা নীতিকথা বলে, তদনুপাতিক দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করে। Communism (সাম্যবাদ) কী আমি

জানি না, কিন্তু Communist (সাম্যবাদী)-দের দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে আপনাদের কাছে যা' শুনি, তা'তে আমার মনে হয়, তথাকথিত Communism (সাম্যবাদ)-এর সঙ্গে pauperism-এর (দারিদ্র্যব্যাধির) যোগ থাকা অসম্ভব নয়। ফলকথা, নিজের দুঃখ-দৈন্যের জন্য নিজেকে দায়ী না ক'রে যেখানে অন্যকে দায়ী করার বুদ্ধি, সেখানেই আছে pauperism (দারিদ্র্যব্যাধি)। ওতে দুঃখ কায়েম হয় বই ঘোচে না।

কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রমে ফিরে তাসুতে গিয়ে বসলেন। কেষ্টদা এবং আরো কয়েকজনও তাসুর ভিতরে গিয়ে বসলেন।

কেষ্টদা—আপনি তো বলেন, পরিবেশের জন্য তুমি দায়ী, সেই কথা উল্টিয়েই তো পরিবেশ বলতে পারে—আমাদের দুঃখ-কষ্টের জন্য অমুক দায়ী।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—উল্টা বুঝিলি রাম! অন্যের যদি সত্যিকার দোষও থাকে, তার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে আমার তো কোন লাভ নেই। আমার করতে হবে আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের সঙ্গে-সঙ্গে অন্যকেও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তা'তেই আমি লাভবান হব। আমার দুঃখ-কষ্টের জন্য অন্যে যতটা দায়ী হো'ক বা না হো'ক মূলতঃ আমিই দায়ী। আমার দায়িত্বটা এড়িয়ে অন্যকে যতই দায়ী করতে থাকব, ততই তারা ক্ষিপ্ত হবে, তাদের দিয়ে কোন সুবিধা পাব না। তাই ওটা পথ নয়। সেইজন্য আমি দায়ী করি নিজেকে, এবং প্রত্যেককে বলি, তুমি দায়ী কর নিজেকে। এই ভূমিতে না দাঁড়ালে কোন সংশোধনও হবে না, সমাধানও হবে না। এই আমাদের আর্য্যদাঁড়া, আমাদের ধর্ম্ম ও কৃষ্টি চিরদিন এই কথাই বলছে। তাই ব'লে অন্যায় ও অসতের সঙ্গে আমাদের আপোষরফা নেই। পরিবেশের ভিতর সমাজবিরোধী যা', সত্তা-বিরোধী যা' তা' আমাদের রুখতেই হবে। নইলে অধর্ম্মের প্রশ্রয় দেওয়া হবে। তা'তে অধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হবে, ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হবে না। তা' আমরা হ'তে দেব না। অধর্ম্ম বা অন্যায়কে আমরা কখনও প্রশ্রয় দেব না—সে নিজেরও না, অন্যেরও না। নিজের অধর্ম্ম ও অন্যায়ের জন্য নিজেকে শাসন করব না, তাকে দুধকলা দিয়ে পুষে রাখব, আর অন্যের অন্যায় ও অধর্ম্মের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হ'য়ে দাঁড়াব, তা'তে কিন্তু কাজ হয় না। তা'তে মানুষ শোধরাবে না। যে নিজেকে শাসনে সংযত করতে পারে না, সে অন্যকে শাসন করবেই বা কিভাবে, আর সংযতই বা করবে কিভাবে? আত্মশাসন, আত্মনিয়ন্ত্রণের অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা যাদের আছে, তারাই পারে অন্যকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করতে। অসৎকে নিরোধ করার একটা রীতি আছে, সে-রীতি আয়ত্ত হয় না যদি নিজের ভিতরকার অসৎ যা'-কিছু তা' নিরোধ না করা যায়। আবার, প্রত্যেকে আমার মতো নয়, প্রত্যেকেই বিশিষ্ট, তাই অন্যের ভিতরকার অসৎকে নিরোধ করতে হবে তার বিশিষ্ট রকমে স্থান, কাল, পাত্র ও অবস্থা সম্যক্ বিবেচনা ক'রে।

কাউকে যদি সংশোধন করতে চান, তাকে বুঝতে দিতে হবে যে আপনি তার মঙ্গলস্বার্থী, তা'তে সে আপনার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হবে। তার শ্রদ্ধা যখন জাগবে আপনার প্রতি, তখনই সে আপনার কথা ধরতে পারবে, মাথায় নিতে পারবে।

কেষ্টদা—আপনিই তো বলেছেন—

'জন্মগত ভ্রষ্ট যারা
সৎ বা দয়ায় হয় না বশ,
ভয়েই কেবল অনুগত
শুভের পথে পায় না রস।'

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-কথা ঠিক। কিন্তু সৎ বা দয়ায় যারা বশ হ'তে পারে, যারা জন্মগত ভ্রষ্ট নয়, তাদের প্রতি সদ্ভাব ও দয়া না দেখিয়ে, তাদিগকে ভয় দেখিয়ে অনুগত ক'রে রেখে আপনার তো কোন লাভ নেই। ভয়ের দাপটে কাউকে যদি আপনি শুধুমাত্র নিস্তেজ ক'রে রাখেন, তা'তে তো আপনার কোন সুবিধা নেই। মানুষের ভিতর ভাল যতটুকু আছে তাকে স্ফুরিত, সলীল ও সক্রিয় ক'রে তুলতে গেলে চাই ভালবাসা। ভালবাসা ছাড়া প্রাণ জাগে না, শক্তি জাগে না, মানুষের অন্তর্নিহিত শুভ-সম্ভাবনা নিত্য নব-নব মূর্চ্ছনায় মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে না। তবে অনেক ক্ষেত্রে ভালবাসা ভয়-মিশ্রিত হওয়া প্রয়োজন। নইলে কার্য্যকরী হয় না। আবার, শুধু ভয়ও কার্য্যকরী হয় না, তা' যদি হ'তো, তবে এত জেলখানা, দ্বীপান্তর ও ফাঁসির ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াময় এত পাপ ও অপরাধ কেন? শাসনের শত কঠোরতা সত্ত্বেও তো তা' কমছে না! কমবে কি? অপরাধ ক'রে যারা জেলে যায় তারা তো সেখানে অপরাধীর সঙ্গই বেশী ক'রে পায়। সরকারী কর্ম্মচারীদের কাছ থেকেও সাধারণতঃ এমন প্রেরণা পায় না, যা'তে ক'রে তাদের অন্তর্নিহিত ঘুমন্ত মানুষটি জাগ্রত হ'য়ে ওঠে, বরং উল্টোই শোনা যায় অনেক ক্ষেত্রে। দোষের প্রতি কঠোর হ'লেও দোষীর প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হ'তে হবে। তার মধ্যে ভাল যেটুকু আছে, সুকৌশলে সেইটুকু জাগিয়ে তুলতে হবে। পাপ করে যে, অপরাধ করে যে, সে কেন তা' করে সেটা বুঝতে হবে। কোন-কোন ক্ষেত্রে জন্মগত দোষ থাকে, কোন-কোন ক্ষেত্রে সঙ্গগত, শিক্ষাগত দোষ থাকে। সঙ্গগত, শিক্ষাগত যে দোষ, তা' ছাড়ান কঠিন নয়, জন্মগত দোষ থাকলে তা' শোধরান মুশকিল। সেক্ষেত্রে শাসন ও সোহাগ দুইয়ের ভিতর-দিয়ে এমন ক'রে তাকে ব্যাপৃত ক'রে বেড়া দিয়ে রাখতে হয় যা'তে খারাপ করার ফুরসুৎ যথাসম্ভব কম পায়। তার মধ্যেও অকাম করতে ছাড়ে না, অকাম করলেও যা'তে বেশী অনিষ্ট করতে না পারে তেমনতর check (প্রতিবন্ধক) রাখা লাগে। আমার মনে হয়, অনেকগুলি অপরাধপ্রবণতা বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। যারা তেমনতর অপরাধী, তাদের sterilise

(জননশক্তিরহিত) ক'রে দেওয়া ভাল, যা'তে তারা বংশবৃদ্ধি ক'রে সমাজের আরো ক্ষতি করার সুযোগ না পায়। বিয়ের গোলমালের ভিতর-দিয়ে বহু পাপ, বহু অপরাধ সমাজে ঢুকে গেছে ও যাচ্ছে। তাই সমাজ ও রাষ্ট্রের একটা প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে—বিবাহ সুনিয়ন্ত্রিত করা, যার ফলে কুজনন তিরোহিত হ'য়ে সমাজে সুস্থ দেহমনওয়ালা জাতকের সংখ্যা বেড়ে যায়।

কেষ্টদা—দেশে নেতৃস্থানীয় যারা, তাদের ঔদাসীন্য এই দিকেই তো সবচেয়ে বেশী। বরং বিবাহ-বিষয়ে শাস্ত্র-সম্মত সুনিয়ন্ত্রণের বিরোধী অনেকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে অজ্ঞতা। অন্য বিষয়ে ঠেকে শেখা চলে, কিন্তু এ-বিষয়ে ঠেকে শিখতে গেলে জাতির সমূহ সর্ব্বনাশ। রক্তের বিপর্য্যয়, জননের বিপর্য্যয় সবচাইতে বড় বিপর্য্যয়। এ বিপর্য্যয়ের সমাপ্তি হয় না একপুরুষে, বংশপরম্পরায় এ বিপর্য্যয় গুণিত হ'য়ে চলে। তাই খুব সাবধান!............ আমার কাছে জিজ্ঞাসা করছিলেন, আমার কোন প্রত্যাশা আছে কিনা আপনাদের কাছ থেকে। সত্যি কথা বলতে কি—আপনাদের মঙ্গল হো'ক, আপনাদের দিয়ে সকলের মঙ্গল হো'ক, এই ছাড়া আমার আর কোন প্রত্যাশা নেই আপনাদের কাছ থেকে। দুনিয়ার সামনে এমন সর্ব্বনাশ আসছে, যার তুলনায় এই মহাযুদ্ধ, লোকক্ষয়, সম্পদের ক্ষয় কিছুই নয়। গতিক দেখে মনে হয়—মনুষ্যত্বের মূল বুনিয়াদ লোপ পেয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। তাই দীক্ষা, শিক্ষা ও বিয়ে এই তিনটে জিনিস ঠিক ক'রে দেন আপনারা। হোমরা-চোমরা লোকগুলি কী বলে, কী করে, কী বোঝে, কী চায়—আমি কিছুই ঠাওর পাই না। আপনাদের আর কোন গুণ থাক বা না থাক, আপনাদের বুঝটা পরমপিতার দয়ায় ঠিক আছে। সেই বুঝ-অনুযায়ী আমি থাকতে-থাকতে সবটার কাঠামো যদি ঠিক ক'রে গ'ড়ে দিয়ে না যান, তাহ'লে আমি কোন দিক দিয়ে ভরসা দেখি না। শিষ্য ও সন্তান—বড়খোকাই হো'ক, মণিই হো'ক বা কাজলই হো'ক বা আপনারাই হোন—আপনাদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই আমি আশা করি যে আপনারা নিজেদের জীবনে ও চরিত্রে আমাকে বহন ক'রে নিয়ে বেড়াবেন এবং অন্যের কাছেও আমাকে পৌঁছে দেবেন—অবিকৃতভাবে, অবশ্য প্রত্যেকে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী। আর, আমাকে বহন করা ও পৌঁছে দেওয়া মানে, আমার mission (আদর্শ ও উদ্দেশ্য)-কে বহন করা ও পৌঁছে দেওয়া, আর আমার mission (আদর্শ ও উদ্দেশ্য) মানে সকলের mission (আদর্শ ও উদ্দেশ্য)। জীবনীয় প্রতিটি যা'-কিছুর ইষ্টানুগ সত্তাসম্বর্দ্ধনাই আমার mission (আদর্শ ও উদ্দেশ্য)।

শেষের দিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কণ্ঠস্বরে একটা আর্ত্ত বেদনার ঝংকার ফুটে উঠলো। কথা থেমে গেল, কিন্তু তার রেশ বারে-বারে সকলের প্রাণের দ্বারে ঘা মেরে যেতে লাগলো। সবাই অভিভূতের মতো ব'সে রইলেন, আর থেকে-থেকে

লণ্ঠনের আলোয় তাঁর করুণ, মধুর, উজ্জ্বল ও উদ্বেল মুখখানি দেখতে লাগলেন। পদ্মাচরের ঝিঁঝিঁ ডাক তাদিগকে মাঝে-মাঝে স্থানকাল সম্বন্ধে সচেতন ক'রে দিতে লাগল।

২৯শে মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৮ (ইং ১২।২।৪২)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে আশ্রম-প্রাঙ্গণে বাবলাতলায় একখানি বেঞ্চের উপর ব'সে আছেন। সামনে নীচেয় বসেছেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), বঙ্কিমদা (রায়) প্রভৃতি।

কেষ্টদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আপনি যা'-যা' করতে বলছেন, তা' করতে যে মেক্‌দারের যতজন কর্ম্মী প্রয়োজন, তা' তো আমরা পেয়ে উঠছি না, সে ক্ষেত্রে করণীয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার যারা আছে, তাদেরই তৈরী ক'রে তোলেন, দেখেন, এরাই কত করতে পারবে এবং এদের দিয়ে আবার কত কর্ম্মী জোগাড় হবে।

কেষ্টদা—ঘ'সে-মেজে খুব বেশীদূর অগ্রসর হয় ব'লে মনে হয় না। এক-একজনের পিছনে খেটে দেখেছি, কিন্তু কতকগুলি মানুষ আছে, তাদের যেন কিছুতেই চেতান যায় না, ঢিমেতেতালা ঢিলে রকমে চলে, তীব্র তরতরে হ'য়ে ওঠে না কিছুতেই। আর, উঠলেও তা' বেশী সময় স্থায়ী হয় না, তারা তাদের নিজস্ব রকমে এসে দাঁড়ায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবার কাছ থেকে সবটা আশা করবেন না। যাকে দিয়ে যতটা সম্ভব তাই যদি পান, তাহ'লে নিজেকে ভাগ্যবান বিবেচনা করবেন। তাই প্রত্যেককে সবসময় প্রবোধনা জোগাবেন, সে যা'তে ঝিমিয়ে না পড়ে। প্রবৃত্তি-পরায়ণতা মানুষের কর্ম্মশক্তিকে চুরি ক'রে খেয়ে ফেলে। তাই নজর রাখবেন, কর্ম্মীরা যেন প্রবৃত্তির দিকে ঢলে না পড়ে। নামধ্যান, আত্মবিশ্লেষণ ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অভ্যাসটা তাই খুব পাকা ক'রে দেবেন। আপনার কাছাকাছি একটা বড় ঘর করতে হয়। সেখানে কর্ম্মীদের রাখবেন। তারা আপনার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা, ওঠা-বসা করবে। আপনি হয়তো রাত তিনটের সময় উঠে নাম করেন। সঙ্গে-সঙ্গে ওদেরও তুলে দেবেন। ওরাও উঠে ব'সে না করবে। আপনি হয়তো বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবতের কত জিনিস আবৃত্তি করেন। ওরাও যদি রোজ-রোজ করতে থাকে, ওদেরও কত জিনিস মুখস্থ হ'য়ে যাবে। আর, একসঙ্গে নানাবিষয় পড়বেন, আলাপ-আলোচনা করবেন। প্রত্যেককে একটা ক'রে নোট-বই করতে বলবেন, প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি তা'তে টুকে নিতে বলবেন। মাঝে-মাঝে ওদের হয়তো নিয়ে গেলেন বিশ্ব-বিজ্ঞানে, হাতে-কলমে করিয়ে-করিয়ে নানা জিনিস ধরিয়ে দিলেন। একসঙ্গে গান করলেন, একটা বিষয় দিয়ে পাঁচ জনকে বক্তৃতা করতে বললেন। বক্তৃতার পর নিজেদের মধ্যে আলোচনা

করলেন—কোন্ point (দিকটা) কিভাবে বললে আরো effective (কার্য্যকরী) হ'তো। Facts, figures ও quotation (তথ্য, সংখ্যা ও উদ্ধৃতি) কেমন ক'রে বক্তৃতার মধ্যে সমাবেশ করতে হয়, তাও দেখিয়ে দিলেন। লোকের প্রচলিত ভুল ধারণা ও ঝোঁকগুলির নিরসন করতে গেলে, তাদের না-চটিয়ে কিভাবে বুঝ গজিয়ে দিতে হয়, তাও দেখিয়ে দিলেন। ধরেন, একটা meeting-এ (সভায়) audience-এর (শ্রোতৃবৃন্দের) মধ্যে কম্যুনিষ্ট আছে, মুসলিম লীগের লোক আছে, হিন্দু মহাসভার লোক আছে, কংগ্রেসী আছে, সনাতনী আছে, শিক্ষিত আছে, অশিক্ষিত আছে, বৈষ্ণব আছে, শৈব আছে, শাক্ত আছে, রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত আছে, নানা গুরুর কাছে দীক্ষিত লোক আছে—এমনতর একটি জটিল সমাবেশের মধ্যে ১৫ মিনিটের মধ্যে সৎসঙ্গের সব কথা ব'লে যদি সকলকে সশ্রদ্ধ ক'রে তুলতে হয়, তাহ'লে কিভাবে বলা লাগবে, তাও হয়তো ধরিয়ে দিলেন। তা' ছাড়া, আপনি নিজেও ওদের কাছে রকমারী কূট প্রশ্ন ক'রে দেখবেন, কে কী জবাব দেয়। যার যেখানে গোল আছে, সেগুলি আবার শুধরে দেবেন। মাঝে-মাঝে এক-একটা বিষয় নিয়ে লিখতে দেবেন, কে কেমন লিখলো সেটা আবার দেখবেন ও সংগঠনমূলক সমালোচনা করবেন। নিজেদের পরস্পরের মধ্যে ব্যবহার কেমন করে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। যার যে গলদ লক্ষ্য পড়ে, সেগুলি মিষ্টি ক'রে ধরিয়ে দেবেন, শুধরে দেবেন। ভাল যার যা' আছে, তার জন্য তাকে মাত্রামতো প্রশংসা করবেন, সেই ভালটাকে সে আরো কতখানি বাড়িয়ে তুলতে পারে, তাও তাকে ধরিয়ে দেবেন। প্রত্যেককে অবিরাম সাধনার উপর রাখবেন, নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলনের উপর রাখবেন। প্রত্যেকের সঙ্গে এমনভাবে চলবেন যে, সে যেন আপনাকে পরম আপনার জন ব'লে বোধ করে। আপনার কাছে তার যেন কিছুই গোপন না রাখে। এমনিভাবে প্রত্যেকে নিজেকে যতখানি খুলবে আপনার কাছে, আপনারও তাদিগকে চালনা করবার সুবিধা হবে ততখানি। আর, সবার সঙ্গে একভাবে ব্যবহার করলে চলবে না, প্রত্যেকেরই জীবনের একটা অন্তরতম সুর থাকে, বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী থাকে, বিশিষ্ট চাহিদা থাকে, বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে, জৈবী প্রকৃতি থাকে, কৌলিক ধাঁজ থাকে। সেইটে কার বেলায় কী তা' আবিষ্কার করা লাগবে এবং সেইভাবে তার সঙ্গে চলা লাগবে। আমার দেখেন না, এক-একজনের সঙ্গে কথাই বেরোয় এক-এক রকমের! ও আমি ভেবে-চিন্তে করি না। মানুষটা, তার অবস্থা এইগুলিই যেন dictate করে (ব'লে দেয়), তাকে কী বলা লাগবে, তার সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করা লাগবে। তাই ও-কথা ঠিকই যেমন বলাও তেমনি বলি, যেমন করাও তেমনি করি। আপনাদেরও চিন্তা ক'রে করতে-করতে আপসে-আপ অমনতর হ'য়ে যাবে। আর, এটা হয় তখনই যখনই ইষ্টচেতনা, মঙ্গলবুদ্ধি পেয়ে বসে আমাদের। তখন উপকারী বা উপদেষ্টার 'অহং' থাকে না। কারও ভাল

করতে পারলে আমিই ব'র্ত্তে গেলাম, এমনতর ব্যাকুল আগ্রহ যদি থাকে তাহ'লে নিজের কথা জোর ক'রে অন্যের উপর চাপাবার বুদ্ধি হয় না। তখন বরং perfect observation (নিখুঁত পর্য্যবেক্ষণ) আসে ও placing (পরিবেশন)-ও ঠিক হয়। যাজনের বেলায়ও ঐ ব্যাপার। যাজক হবে মঙ্গল-পাগল মানুষ, তার সবসময় বুদ্ধি থাকবে, কেমন ক'রে মানুষকে মঙ্গলের অধিকারী ক'রে তোলা যায়। সর্ব্বমঙ্গলময় পুরুষ হ'লেন ইষ্ট। তাই, ইষ্টকে কার মধ্যে কেমন ক'রে স্থাপন করা যায়, এই তার বুদ্ধি। সঙ্গে-সঙ্গে তার বুদ্ধি থাকে প্রত্যেকের নানা অভাব, দুঃখ, কষ্ট, অসুবিধা ও সমস্যা সে কতভাবে কতখানি তখন-তখনই ঘোচাতে পারে। এই যে সক্রিয় আঁকুপাঁকু, তা' তার জ্ঞান ও শক্তির দরজা খুলে দেয়। সে পারেও অনেক-কিছু করতে। সে শুধু কথা কয় না, যেখানে যায় মানুষের সুখ-সুবিধার জন্য উদ্দীপ্ত আগ্রহে করতেই থাকে। আর কিছু না পারলেও অন্ততঃ তার দরদী স্পর্শ দিয়ে মানুষের প্রাণে তখন-তখনই একটা নূতন উল্লাস জাগিয়ে তোলে। যার কাছে যায় মুহূর্ত্তের জন্য হ'লেও সে জীবনে এক নূতন স্বাদ বোধ করে। এও কি বড় কম কথা? তাই কই, আপনার কাছে রেখে কর্ম্মিগুলিকে এই পাগলা নেশায় অভ্যস্ত ও আচরণশীল ক'রে ছেড়ে দেন। এই যেন হয় তাদের সহজ জীবন। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র সুখ-সুবিধা ও স্বার্থের কথা তারা যেন ভাবতেও ভুলে যায়। স্বার্থ বলতেই যেন তারা বোঝে—সৎসঙ্গের স্বার্থ, পরিবেশের স্বার্থ, দশের স্বার্থ, দেশের স্বার্থ, জগতের স্বার্থ। এমন ছোপ লাগায়ে দেবেন এদের ভিতরে যেন কিছুতেই তা' ফিকে হ'য়ে না যায়—যারে কয় পাকা রং। তখন দেখবেন, আপনার এই অগণ্য, নগণ্য কর্ম্মীদের কাছেই সকলে এসে গড়াগড়ি দেবে। চরিত্র এইসান চীজ যার কাছে পশুপক্ষী, মানুষ-দেবতা সবাই কাবু হ'তে বাধ্য। এই কাবু জোরের কাবু নয়, এ-কাবু শ্রদ্ধার কাবু। তবে একটা কথা মনে রাখবেন—আপনাদের জীবন যদি এইভাবে না রঙায়, আপনাদের স্বাভাবিক চলনে এটা যদি ফুটে না ওঠে, আপনাদের বাচনিক যাজনে যতই জেল্লা থাক না কেন, তা' কিন্তু স্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী ফল ফলাতে পারবে না। নিজেদের সত্তা না জাগলে অন্যের সত্তাকে জাগাতে পারবেন না।

বঙ্কিমদা ইতিমধ্যে উঠে গেছেন। তবে বীরেনদা (মিত্র), দেবী (চক্রবর্ত্তী), উমাদা (বাগচী), সতীশদা (দাস), অক্ষয়দা (পুততুণ্ডু), মণিদা (ঘোষ), প্রভৃতি আরো অনেকে এসে বসেছেন। কেষ্টদা বললেন—কর্ম্মীদের অতোখানি ক'রে তুলতে গেলে আমার যা' হওয়া প্রয়োজন, আমি তো তা' হ'তে পারিনি এখনও। তাই আমার কাছে থেকে আর কতটুকু পাবে তারা? তবে আমার কাছে যারা থাকে, সবসময়ই চেষ্টা করি তাদিগকে আপনার কাছে ঠেলে দিতে। আর, বরাবর করবও তাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কাছে নিয়ে এসে বসবেনই। তবে আমার কি আর আগের মতো খাটার ক্ষমতা আছে? তা ছাড়া, দেখতেই তো পাচ্ছেন, ইচ্ছা থাকলেও বেশী সময় ওদের পিছনে দেবার উপায় নেই। কতরকম ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হয়। বেশ কিছুদিন পর্য্যন্ত এক-একজনের পিছনে লাগা-জোড়া খেটে তাকে সর্বদিক দিয়ে পোক্ত ক'রে দিতে হয়, চালচলনের মধ্যে বেমিছিল যেগুলি আছে সেগুলি দুরস্ত ক'রে দিতে হয়। ধরেন, একজনের অনেক সদ্‌গুণ আছে, তার সঙ্গে go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) আছে, কথার ঠিক রাখে না, টাকা-পয়সা নিয়ে গোলমাল করে। তাকে চোখে-চোখে রেখে ওগুলি যদি ছাড়িয়ে না দেন, তাহ'লে দেখতে পাবেন, তার বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও সে field (কর্ম্মক্ষেত্র) নষ্ট করছে। এইরকম এক-একজনের এক-একটা গোলমাল আছে। নিবিষ্ট নজরে এগুলির প্রতিকার করতে না পারলে দেখবেন কর্ম্মীরা তো deteriorate করবেই (অধোগতিসম্পন্ন হবেই), তা'ছাড়া বিভিন্ন স্থানে যারা দীক্ষিত হ'চ্ছে ও হবে তারাও educated (শিক্ষিত) হবে না। সত্যিকার শিক্ষা তো কেউ কোথাও পাচ্ছে না, আমি ভাবি, আমার ঋত্বিক্‌গুলি যদি শিক্ষিত হয়, অর্থাৎ তাদের অভ্যাস, ব্যবহার যদি নিয়ন্ত্রিত হয়, তাদের অবগুণের নিরসন হ'য়ে সদ্‌গুণগুলি যদি প্রকট ও পরিক্রিয় হয়, তবে মানুষ তাদের দিয়ে অনেকখানি শিক্ষা পাবে। আমার সব কল্পনা ভেস্তে যাবে যদি ঋত্বিক্‌রা মানুষ না হয়। আর, আমি যে সংহতির কথা বলি, তাও নষ্ট হ'য়ে যাবে যদি ঋত্বিক্‌রা সুগঠিত না হয়। তখন নিজ-নিজ স্বার্থের খাতিরে একে অন্যকে লোকের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করবে, এতে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। তা'ছাড়া, সংহতির মূলে থাকে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাকে আশ্রয় ক'রে সংহতি সবল হয়। ধরেন, আপনাকে অনেকে শ্রদ্ধা করে, তখন আপনাতে শ্রদ্ধাবান যারা তাদের মধ্যেও একটা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে। সংহতির মূলে আছে এই জিনিসটি। কিন্তু আপনার প্রতিনিধি যারা, তাদের চলন যদি মানুষের শ্রদ্ধাকে উদ্দীপ্ত না ক'রে ক্ষতবিক্ষতই ক'রে তোলে, তখন আপনার প্রতি শ্রদ্ধার দরুন যাদের ভিতর একটা সংহতির ভাব ফুটে উঠেছিল, সেই সংহতিই অনেকখানি বিপর্য্যস্ত হ'য়ে উঠবে। তাই, কর্ম্মীদের ঠিক করা একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য, একদিক দিয়ে দেখতে গেলে প্রত্যেকটি সৎসঙ্গীই কর্ম্মী, কারণ, যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি প্রত্যেকেরই করণীয়। তাই, right instinct-এর (অর্থাৎ সুষ্ঠু সহজাত-সম্পদ্‌-বিশিষ্ট) সৎসঙ্গীদের দিয়ে কর্ম্মীদেরও moulding (নিয়ন্ত্রণ) হ'তে পারে, এ বিশ্বাসও আমি রাখি। তবে লোকশিক্ষকের তকমা নিয়ে যারা যাচ্ছে, তাদের একটা minimum standard (নিম্নতম মান) থাকা চাই-ই। আচার্য্য-হিসাবে আপনি সেইটুকু ক'রে দেন। তারপর দেখবেন sincere

(অকপট) যারা, তারা কর্ম্মক্ষেত্রে প'ড়ে প্রয়োজনের তাগিদে আপনিই ঠিক হ'য়ে যাবে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাক খেলেন। কেষ্টদা বাড়ীর দিকে গেলেন।

যশোহর থেকে একটি মা এসেছেন, তিনি বললেন—বাবা! আমার বাড়ীতে অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে। সবাইকে এত যে সাবধানে রাখি, কিন্তু কিছুতেই সুস্থ রাখতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী অসুখ?

উক্ত মা—কারও জ্বর, কারও সর্দ্দিকাসি, কারও পেট খারাপ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ডাক্তার দিয়ে ভাল ক'রে চিকিৎসা করান লাগে। আর, বেশ ক'রে সদাচার পালন ক'রে চলতে হয়। এক-একজনের বাড়ীঘর, হেঁসেল, ভাড়ার ঘর কেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিমছাম থাকে, আবার, কোন-কোন বাড়ীতে সব অগোছাল, এলোমেলো, অপরিষ্কার থাকে। সব এমন ঝকঝকে-তকতকে রাখবি যে দেখে যেন সবার মন প্রসন্ন হ'য়ে ওঠে। অনেকে রাঁধতেই জানে না, ভাবে, কতকগুলি তেল-মসলা ঢালতে পারলেই বুঝি রান্না ভাল হয়, তা' কিন্তু নয়। রান্না হওয়া চাই সহজ, সাদাসিদে অথচ রুচিকর। আবার, স্বাস্থ্য বুঝে আহার্য্য দিতে শিখতে হয়। তখন সেটা একই সঙ্গে ওষুধ ও পথ্যের কাজ করে। ধর, একজনের ম্যালেরিয়া, তাকে যদি মাঝে-মাঝে পুরোন তেঁতুলের টক ক'রে দাও, তা'তে তার ভাল হবে। ছেলেটির হয়তো পেট খারাপ, তাকে কুলেখাড়ার ঝোল ক'রে দিলে, থানকুনী-পাতার শুক্তো ক'রে দিলে। ছেলেপেলের যত্নই তো অনেকে করতে জানে না। খুব ক'রে সাবান মাখায়, পাউডার মাখায়, কিন্তু হয়তো ভাল ক'রে সরষের তেল মাখায় না। খুব ভাল ক'রে তেল মাখালে ছেলেপেলেদের ফত-ফত ক'রে সর্দ্দি লাগে না। আর, এক-এক ঋতুতে শরীরের চর্য্যা এক-এক ভাবে করতে হয়। যখন পিত্তের প্রকোপ হয়, তখন পিত্ত-প্রশমক ব্যবস্থা করতে হয়, যখন বায়ুর প্রকোপ হয় তখন বায়ুর প্রশমন যা'তে হয় তাই করা লাগে, যখন কফের প্রকোপ হয় তখন তার প্রতিকার করতে হয়। আগে থাকতে এগুলি করলে অনেক রোগবালাইয়ের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। আজকাল একটু অসুখ-বিসুখ করলে ডাক্তারের বাড়ীতে দৌড়ান ছাড়া উপায় নেই। আগেকার মায়েরা পাতামুঠা দিয়ে কত রোগ সারিয়ে ফেলতো। এখন সে-সব উঠে যাচ্ছে। এককথায়, শিক্ষারই অভাব। মেয়েদের শিক্ষা মানে নাচ-গান, লেখাপড়া নয়। ঘর-কর্নার জন্য যা'-যা' দরকার তাই-ই আগে শিখতে হয়। আর, সেটা বই প'ড়ে শেখা যায় না, গিন্নীবান্নীদের কাছে হাতেকলমে ক'রে-ক'রে শিখতে হয়, সাকরেদী ক'রে শিখতে হয়। তার সঙ্গে লেখাপড়া, গান-বাজনা, শেলাই-ফোঁড়াই যা' পারে তাও শিখবে। ঘরোয়া রকমে শিক্ষা না হ'লে সে-শিক্ষা মানুষের গায়ে বসে না। তা' একটা বোঝা ও জঞ্জালের মতো

হ'য়ে ওঠে। তা'তে শিক্ষার অহঙ্কার হয়, কিন্তু শিক্ষা হয় না। অল্পের মধ্যে সাশ্রয়ে সংসার করতে হয় কেমনভাবে তা' অনেকে জানে না। একটু অনটনের মধ্যে পড়লে মাথা ঘুরে যায়। কিন্তু অল্পের মধ্য-দিয়ে চালাতে পারা গৃহিণী-পনার একটা মস্ত কৃতিত্ব। তারপর অনেক সংসারে অল্পবিস্তর অপচয় হয়। ছোট্ট-ছোট্ট একটু-একটু অপচয়ের মধ্য-দিয়ে অনেকখানি বেরিয়ে যায়। ধর, প্রত্যেকটা ছেলের পাতে আধমুঠো ক'রে ভাত যদি প্রত্যেক বেলায় নষ্ট হয়, একমাসে গিয়ে সেটা কতখানি হয়? প্রত্যেক বিষয়েই এমনি। বড়বৌকে দেখেছি প্রাচুর্য্যের মধ্যেই থাক আর অভাবের মধ্যেই থাক, কোন জিনিসের অপচয় কখনও করে না। আর, মেয়েদের সঞ্চয়বুদ্ধিও দরকার। যখনই সুযোগ পায়, তখনই মেয়েরা যদি কিছু-কিছু সঞ্চয় ক'রে রাখে, তাহ'লে বিপদে-আপদে সেটা অমৃতের মতো কাজ করে। বড়বৌকে তো আমি বিশেষ কিছুই দিতে পারি না, কিন্তু ও যখন যা পারে জমিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। আমি আবার অসুবিধায় পড়লে তার কাছে হাত পাতি, এক-এক সময় বড় ঠেকায়—বাঁচায়। তাই তোমাদের খুব ভাল শিক্ষা হওয়া চাই। তাহ'লেই তোমরা পুরুষের আশ্রয়স্বরূপ, দুর্গস্বরূপ হ'য়ে উঠতে পারবে। বাইরের ঝড়ঝাপটা তাদের বিধ্বস্ত করতে পারবে না। স্বাস্থ্য বল, কর্ম্মশক্তি বল—সবই তাদের ফুটে উঠবে। নারীত্বের সার্থকতা মাতৃত্বে। প্রকৃত মাতৃত্বের স্ফুরণ যখন হয় মেয়েদের মধ্যে, তখন স্ত্রীর ভিতর-দিয়েও স্বামী মাতৃত্বের স্পর্শ পায়। সন্তানের সুস্থি ও পুষ্টির জন্য মায়ের যেমন একটা পাগলপারা রকম থাকে, স্বামীর জন্যও তখন তেমন হয়। মা যাওয়া অবধি বড়বৌয়ের মধ্যে এই জিনিসটা আমি খুব বেশী ক'রে দেখছি। বেশীরভাগ সময় থাকে তো বাড়ীর মধ্যে, কিন্তু আমি দেখি, তিনটে হাঁচি যদি দিই তাও সে খবর রাখে। হয়তো খেতে বসেছি, টক খাব, বললো—আজ আর টক খেয়ে কাজ নেই, বার-বার হাঁচি হ'চ্ছে যেমন। রকমটা দেখে আমার ভাল লাগে। মেয়েরা স্বামী-পুত্রকে এমনি ক'রে স্নেহপ্রীতি ও সেবার বেষ্টনে আগলে রাখে ব'লে তারা সুস্থ থাকে, কর্ম্মঠ থাকে, দীর্ঘজীবী হয়। নইলে কি তাদের উপায় ছিল?

মা'টি বললেন—ঠাকুর! আমার ভুল কোথায় তা' আমি বুঝতে পেরেছি। আমি করি সব, কিন্তু করি একটা বিরক্তির সঙ্গে। অল্পেতে আমার মাথা গরম হ'য়ে যায়। তাই করিও যেমন, কথাও শোনাই তেমনি। আমার রুগ্ন স্বামী তাই মাঝে-মাঝে দুঃখ ক'রে বলেন 'আমার শরীরের হালত যা' তা'তে আর বেশীদিন আমার জন্য তোমাকে কষ্ট করতে হবে না, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।' তা'তে আমার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ ক'রে ওঠে, কেমন যেন একটা মায়া হয়। ভাবি, আর রূঢ় কথা ক'ব না, কিন্তু একদিকে অসুখ-বিসুখ, আর একদিকে অভাব-অভিযোগ, আমার মাথা ঠিক থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মণি! মাথা ঠিক না রাখলি তো চলবি না। দুঃখ-কষ্ট স'য়ে সেবায়-যত্নে স্বামীকে যদি ভাল ক'রে তুলতে পার, তাহ'লেই না তুমি সতী-লক্ষ্মী মেয়ে, স্ত্রীর মতো স্ত্রী। সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী, শৈব্যা, বেহুলার দেশের মেয়ে তুমি। তাদের কথা ভুলে যাও কেন? দরদী সেবায় স্বামীকে সুস্থ ক'রে তুলতে হবে তোমাকে। তোমার মধুমাখা ব্যবহার পেয়ে তার অন্তর যেন ব'লে ওঠে—'রোগ! মৃত্যু! তোমরা দূরে স'রে যাও। আমি এ স্বর্গপুরী ছেড়ে কোথাও যাব না। এত প্রীতি আমি কোথাও পাব না।' দেখ না তার রোগ সারতে কতদিন লাগে? আর একটা কথা মনে রেখো—শ্রদ্ধা-ভালবাসার মধ্যে ব্যবসাদারী নেই। স্বামী রুগ্ন, অসমর্থ, সেইজন্য যদি তার খাতির ক'মে যায় তোমার কাছে, তাহ'লে তোমার ভালবাসার দাম কোথায়? একটা পামরের চাইতে তুমি উঁচু হ'লে কোন্ দিক দিয়ে? ভালবাসার জন যদি বিপন্ন হয়, সেই সময়ই তো তাকে বেশী ক'রে দেখতে হয়। এমনি ক'রেই তো যমের দুয়োরে কাঁটা পড়ে, শয়তানের দুয়োরে কাঁটা পড়ে, কপালের লিখন খণ্ডন হ'য়ে যায়। সংসারের ইতিহাস সৃষ্টি হয়, সমাজের ইতিহাস সৃষ্টি হয় নূতন ক'রে।

মা'টি কাঁদ-কাঁদ ভাবে বললেন—আমি যে বড় দুর্ব্বল। আমাকে আশীর্ব্বাদ করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু তাড়া দিয়ে ব'লে উঠলেন—মায়ের জাত কখনও দুর্ব্বল হয় না। শক্তির অংশে জন্ম তার।.........ঘরের মানুষটাকে যদি বাঁচাতে চাস তাহ'লে 'দুর্ব্বল' 'দুর্ব্বল' করিস না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে উঠে মাতৃ-মন্দিরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় গিয়ে বসলেন। সঙ্গে-সঙ্গে অনেকে গেলেন। বারান্দার এককোণে একটা ছাপান কাগজ প'ড়ে আছে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—ওটা কী রে?

বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য) যেয়ে কাগজটা হাতে ক'রে উঠিয়ে দেখে বললেন—স্বস্ত্যয়নী ব্রতবিধি। কে বোধ হয় ফেলে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার কাছে রেখে দেন। আর আপনার যদি দরকার না থাকে তাহ'লে ফিলান্থ্রপিতে দিয়ে আসেন গিয়ে।

বীরেনদা ফিলান্থ্রপি অফিসে দিয়ে আসলেন কাগজখানা।

বীরেনদা কাগজখানা দিয়ে আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে দেখলে সাধু-সন্ন্যাসীরা খুব বিষয়াসক্ত লোক ব'লে মনে করবে, তাই না? সামান্য একখানা ছাপান কাগজ তার উপরও এত আসক্তি!

বীরেনদা—যার যেমন বুদ্ধির দৌড়, সে তেমনই ভাববে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্যিই আমার খুব আসক্তি। অনাসক্তি জিনিসটা আমি টের পেলাম না। আমার খুব আসক্তি আপনাদের উপর। তাই সবসময় আপনাদের ভাল দেখতে, ভাল করতে ইচ্ছে করে। জিনিসপত্রের উপর আমার মমতা যতটুকু

থাক বা না থাক, আপনাদের চরিত্রের উপর, আপনাদের জীবনের উপর মমতা আমার অত্যাজ্য। আপনাদের কোন শৈথিল্য থাকে, কোন ঢিলেমী থাকে, তা' আমার সহ্য হয় না। তাই, কারও কোন জিনিস খোয়া গেলে বা চুরি হ'লে সে যখন এসে হা-হুতাশ করে, তখন আমার কাছে insulting (অপমানজনক) মনে হয়। আমি ভাবি, সে এমন অসাবধান কেন হবে, যা'তে তার জিনিস খোয়া যাবে বা চুরি যাবে? জিনিসের দামের থেকে চরিত্রের দাম অনেক বেশী। চরিত্রের যে গলদের দরুন মানুষের ভুল হয়, জিনিসপত্র নষ্ট হয়, তা' কখনও উপেক্ষণীয় নয়। অভ্যাস এমন একটা জিনিস যার পুনরাবৃত্তি হ'তে থাকে অজ্ঞাতে, অসাড়ে। তাই কারও কোন বদভ্যাস দেখলে আমার বড় দুর্ভাবনা হয়। ভাবি, এখনই যদি তার প্রতিকার না করা যায়, তাহ'লে পরিণামে তা' তার ও অন্যের জীবনে কতখানি দুঃখ ডেকে আনবে তার ঠিক কী? তাই, আপনারা যাকে সামান্য-সামান্য ব্যাপার মনে করেন, আমি তাকে সামান্য ব্যাপার মনে ক'রে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না। দেখতে পাই, ওর পিছনে কত বড় ক্ষতিকর গলদ লুকিয়ে আছে। তাই পই-পই ক'রে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিই আপনাদের, spare করি না (ছাড়ি না) মোটেই। অবশ্য যাদের ক্ষেত্রে বুঝি, তারা অতটা হজম করতে পারবে না, সেখানে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সবটা খোলাখুলি বলতে পারি না। জানবেন, যারা আমার কাছে তোয়াজ চায়, তোয়াজ না পেলে চ'টে যায়, তাদের মানুষ করা মুশকিল। আমার শাসনে যারা ক্ষুব্ধ না হ'য়ে উৎফুল্ল হ'য়ে আত্ম-সংশোধনে বদ্ধপরিকর হয়, তাদের জানবেন খুব শুভ লক্ষণ।

দুই-চার মিনিট চুপচাপ কাটলো।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে উঠে কাজল-ভাইয়ের ঘরে গেলেন।

১লা ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৪৮ (ইং ১৩।২।৪২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃত-নিবাসে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে দক্ষিণাস্য হ'য়ে ব'সে আছেন। এখনও বেশ শীত আছে, শ্রীশ্রীঠাকুরের গায়ে একখানি আন্দির চাদর জড়ান। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে বসেছেন। প্যারীদার কাছ থেকে আশ্রমের কয়েকটি রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। চোখে-মুখে একটা উদ্বেগের ছাপ!

একজন রোগী-সম্বন্ধে প্যারীদা বললেন—আমি যে prescription (ব্যবস্থাপত্র) দিয়েছিলাম, ঠিকমতো সে ওষুধ খাওয়ায়নি। তা' খাওয়ালে এতটা বাড়াবাড়ি হ'তো না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু prescription (ব্যবস্থাপত্র) ক'রে দিলেই তোমার দায়িত্ব শেষ হ'লো ব'লে মনে ক'রো না। রোগী ওষুধ খেলো কিনা, তাও

দেখতে হবে। অনেক সময় আর্থিক সামর্থ্য না থাকার দরুন রোগী ওষুধ খেতে পারে না। সেখানে নিজে ভিক্ষা ক'রে ওষুধ সংগ্রহ ক'রে দেবে। তা' যদি না পার, আমাকে বলবে। মানুষ খামকা কষ্ট পায়, সে আমার ভাল লাগে না। সবসময় নিজের উপর দিয়ে ভাববে, তুমি ঐ অবস্থায় পড়লে কেমন লাগে ও কী চাও, সেইটে ভেবে যেখানে যা' করণীয় করবে। ছেলেবেলায় পড়েছিলাম—'Do unto others as you would be done by' (তুমি যেমনতর ব্যবহার চাও, অন্যের প্রতিও তেমনতর ব্যবহার করবে।) ঐ কথা আমি ভুলতে পারি না। ঐ বোধের উপর দাঁড়িয়েই চলি। তোমরাও ঐ অভ্যাস কর। নচেৎ পদে-পদে আমি induce (প্রবুদ্ধ) করব, তবে তোমরা করবে, তা'তে আমার সুখ নেই। তোমাদের কয়েকজনের মধ্যে ঐ বোধ ও চলন যদি প্রতিষ্ঠা পায়, তাহ'লে দেখবে তা' অন্যের মধ্যেও চারিয়ে যাবে। ঐ বোধ ও চলন যদি না জাগে, তবে হাজার নাম-ধ্যান কর আর হাজার আমার গাড়ু-গামছা বও, 'সে আর লালন একখানে রয়, লক্ষ যোজন ফাঁক'—এমনতর হ'য়ে যাবে!

প্যারীদা—অনেক সময় রোগীর তরফ থেকে জানায়ও না যে তার সামর্থ্য নেই। সে জায়গায় কী করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদের দোষ ঢের আছে, সে-কথা তুমি ক'য়ো না। তারা অমন করবেই। আমি কই—তোমার বোধ, বিচক্ষণতা, সন্ধিৎসা ও দরদ এতখানি বেড়ে যাক, যার ফলে যেখানে যার জন্য যা' করণীয়, স্বতঃ-সন্ধিৎসায় তা' করতে তোমার কোন ত্রুটি না থাকে। তোমাকে দিয়ে দেখাতে চাই, ডাক্তার কাকে বলে। যা' কই তা' যদি কর, দেখবে, পৃথিবীর চিকিৎসক-সমাজ একটা নমুনা পেয়ে যাবে—চিকিৎসক হ'তে গেলে কতখানি হ'তে হয়, কতখানি করতে হয়। এ বাবা! ফাঁকির কারবার নয়। এ-কামে খাটুনি আছে।.........আর, তোমরা যে লম্বা-চওড়া ও costly prescription (দামী ব্যবস্থাপত্র) ছাড়া করতে পার না, এটা তোমাদের একটা disqualification (দোষ)। অনন্ত এই দিক দিয়ে খুব ভাল ছিল। ছোটর উপর মিক্‌শ্চার এমন দিত যে প্রায়ই নির্ঘাত লেগে যেত। পেটেন্ট ও ইন্‌জেকসন ব্যবহার করতে-করতে আজকালকার ডাক্তাররা মিক্‌শ্চারের সূক্ষ্ম সমাবেশ কেমনভাবে করতে হয়, তা' আর ভাল ক'রে শিখছে না। পড়াশুনা চাই, পর্যবেক্ষণ চাই, ধ্যান চাই, বিশ্লেষণ চাই। তুমি করেছ বহু, করছ বহু, কিন্তু তোমার করাগুলির ভিতর-দিয়ে experience (অভিজ্ঞতা) আশানুরূপ piled up (সমৃদ্ধ) হ'চ্ছে না, সক্রিয় বোধসঙ্গীত ফুটে উঠছে না, কারণ, এ সম্বন্ধে তোমার ধ্যান ও বিশ্লেষণ কম। আর, কাগজ-কলমের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কম। চিকিৎসা-সম্বন্ধে নূতন অভিজ্ঞতা যাই লাভ কর, তা' যদি খুঁটিনাটি ক'রে লিখে রাখ ও মাঝে-মাঝে পড়, তাহ'লে দেখবে, তোমার জ্ঞান ও বোধ কতখানি বেড়ে যাচ্ছে। ভাল ডাক্তার যখনই পাবে, তাদের

সঙ্গে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা-বিনিময়মূলক আলাপ-আলোচনা করবেই। যজন-যাজন সব কাজেই লাগে। সবসময়ই আহরণের তালে থাকবে।

'চারিদিক হ'তে অমর জীবন
বিন্দু-বিন্দু করি আহরণ
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ হেরিব কবে।'

—এই মাধুকরী বৃত্তির ভিতর-দিয়েই জ্ঞান বেড়ে ওঠে। আমি খুব জানি, আমি খুব বুঝি—এই অহংকার আসলেই মানুষ নিরেট হ'য়ে যায়, ভোঁতা হ'য়ে যায়। তাই ব'লে আত্মপ্রত্যয় কিন্তু অহংকার নয়। ডাক্তারের আত্মপ্রত্যয় খুব থাকা চাই। আত্মপ্রত্যয় থাকলেই ডাক্তার রোগীর মধ্যে সাহস সঞ্চারিত ক'রে দিতে পারে। ধর, তুমি একজন রোগীর কাছে গিয়েছ। গিয়ে দেখলে, রোগী খুব ঘাবড়ে গেছে। তুমি যদি তখন ঠোঁটটা উল্টিয়ে, (নিজে দেখালেন) তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বল—'হুঃ! এই আবার একটা রোগ, আমি তো একে রোগ ব'লেই আমল দিই না। এ তো তিন তুড়ির ব্যাপার। প্যারী-নন্দীর মিক্‌শ্চার তিন ডোজ পড়লেই এ রোগ বাপ-বাপ ব'লে পালাবে। তুমি তো বড় বাহাদুর দেখছি, এতটুকু অসুখেই একেবারে চিৎপাত হ'য়ে পড়েছ'—আর এই ব'লে হেসে হাল্কা ক'রে দাও দুশ্চিন্তার জমাট, তা'তে তোমার অহংকার কিছুটা প্রকাশ হ'লেও সে-অহংকার সাত্ত্বিক অহংকার। তা'তে কারও বৃদ্ধি বই ক্ষতি হবে না। সেই অহংকার খারাপ, যা' অন্যকে দাবিয়ে খাটো ক'রে নিজের প্রতিষ্ঠা চায়! আমি কিছু না, আমি অক্ষম, আমি পাপী ইত্যাদি ভাবনা ভাল না। এ-বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা আছে। ছেলেবেলা থেকে আমি ভাবতাম ও বলতাম—পরমপিতা! তুমি আমার পিতা, আমি তোমার সন্তান, তোমার জোরে আমার জোর, তুমি থাকতে দোষ-দুর্ব্বলতা আমাকে স্পর্শও করতে পারবে না। একজন বৈষ্ণব ভক্ত আমার এই মনোভাবের কথা শুনে বললো—'সে কি? ও তো অহংকারের কথা। বরং দীনভাবে বলবে—আমি দুর্ব্বল, আমি পাপী, আমি অসহায়, আমি অধম, আমি নীচ, আমি অপবিত্র, তুমি আমাকে রক্ষা কর, ত্রাণ কর দয়াময়!' তার কথামতো আমার কথা ছেড়ে ঐ ব'লে প্রার্থনা করতাম। কিছুদিনের মধ্যে শংকা, সংকোচ ও গ্লানি ঘিরে ধরলো আমাকে। সবসময় মনে হয়, আমি যেন কত বড় অপরাধী। মানুষের বিশেষতঃ মায়েদের মুখের দিকে সহজে চোখ তুলে চাইতে পারি না। কারও ঘরে ঢুকতে গেলে যেন ভয়-ভয় করে। আমি যেন কুচকে এতটুকু হ'য়ে গেলাম। কারও সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারি না, কথা কইতে পারি না, ভাবি, আমার স্পর্শে যদি অন্যের ক্ষতি হয়। আমার বুকের ভিতরে যে একখানা আনন্দ ও পবিত্রতার পূর্ণচন্দ্র নিটোল হ'য়ে বিরাজ করতো, তা' অমাবস্যার অন্ধকারে ছেয়ে গেল। সে কি দুর্দ্দিনই

গেছে। ক্রমেই অবস্থা অসহনীয় হ'য়ে উঠতে লাগলো, না পেরে শেষে একদিন বিকাল বেলায় পদ্মার পাড়ে গিয়ে আকুলভাবে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলাম—'আমি পাপী নই, আমি দুর্ব্বল নই, আমি অধম নই, আমি দুষ্কৃত নই, আমি তোমার সন্তান, হে পরমপিতা! আমি তোমার সন্তান, আমি নির্ম্মল, আমি পবিত্র, আমি জ্যোতির তনয়, চিরজ্যোতিষ্মান্ আমি।' এইভাবে আরো যা'-যা' মনে আসলো, মনের আবেগে ব'লে গেলাম। কী-কী বলেছিলাম সব আমার মনে নেই। যাহো'ক ঐভাবে বলার পর আমার বুকখানা হাল্কা হ'য়ে গেল, তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। তাই অন্যকে হীন ভাবা যেমন খারাপ, নিজেকে হীন ভাবাও তেমনি খারাপ। ওর চাইতে বংশমর্য্যাদা, আত্মমর্য্যাদা ইত্যাদি সম্বন্ধে মানুষ সচেতন হয় সেই-ই ভাল, তা'তে মানুষ হীনতার ঊর্দ্ধে থাকতে পারে। সৎসঙ্গী ব'লে প্রত্যেকটি সৎসঙ্গীর যদি একটা আত্মগৌরববোধ থাকে, তা'তে ভাল বই খারাপ হয় ব'লে আমার মনে হয় না। আর, যাদেরই সত্যিকার আত্মমর্য্যাদা বোধ থাকে, তারাই অন্যকে ন্যায্য মর্য্যাদা দিয়ে চলতে জানে। সাধনার ক্ষেত্রেও এর উপযোগিতা আছে। শুনেছি, চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—'আমারে ঈশ্বর ভাবে আপনারে হীন, তার প্রেমে কভু আমি না হই অধীন।' ভক্ত যে সে ইষ্টের গুণে নিজেকে গুণান্বিত ক'রে তুলতে চেষ্টা করবে, আর ভাববে, বলবে ও চলবে সেই পথে। তাই আমি স্বতঃ-অনুজ্ঞা আবৃত্তি ও অনুষ্ঠানের বিধান সাধনার অঙ্গ হিসাবে জুড়ে দিয়েছি। এর উল্টোরকমে ভাবা, বলা ও চলা ঠিক নয়। বলাগুলি মানুষের জীবনে মন্ত্রের মতো কাজ করে। মানুষ যা' বলে, ঐ বলা তদনুগ চলনার প্রেরণা জোগায়। তাই, নেতিবাচক কথাই ভাল নয়। ওটা সাধনার বিঘ্নস্বরূপ হ'য়ে দাঁড়ায়। মানুষ যেই ইষ্টকে ভালবাসতে সুরু করে, সেই তার superiority complex ও inferiority complex (হীনম্মন্যতা) ঘুচে যায়। তখন তার ধান্ধা হয়, কেমন ক'রে ইষ্টের চাহিদা ও ইচ্ছাগুলি পূরণ করবে। তা' তার না করলেই নয়। তাই ঐ সম্পর্কে যা' করণীয়, সে-সম্বন্ধে কোন ভড়ং না-ক'রে তীব্র সংকল্প নিয়ে করতে লেগে যায়। সফল না হ'য়েই সে ছাড়ে না। তখন সে ভাবতে বসে না—আমি দুর্ব্বল, আমি পাপী, আমাকে দিয়ে এ কি সম্ভব? এ-সব প্রশ্নেরই সে কোন অবকাশ দেয় না। হনুমান যদি অতো সাতপাঁচ ভাবতো, তাহ'লে কি মা জানকীর উদ্ধার হ'তো? বীরভক্ত যে সে অহঙ্কার বা আত্মাভিমানকে এড়াবার অছিলায় বৃহৎ দায়িত্ব থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে না। সে বরং ভাবে—তাঁর তৃপ্ত্যর্থে সবই আমার করণীয়, আর তাঁর দয়ার দৌলতে বিহিত প্রযত্নের ভিতর-দিয়ে সবই আমাকে দিয়ে সম্ভব। 'তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি।' আর, এইভাবে সে অসাধ্য সাধন করে। আর, যতই অসাধ্য সাধন হয় তাকে দিয়ে, ততই বলে—'তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা,

লোকে বলে করি আমি', 'পুতুলনাচের পুতুল আমি, যেমন নাচাও তেমনি নাচি, যেমন বলাও তেমনি বলি', 'তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র, যেমন চালাও তেমনি চলি'। সে সব-কাজের মধ্যে গুরুর দয়ার কেরদানীই দেখতে পায়, দেখে আর অবাক হয়, আর ক্রমাগত গুরুরই গুণগান করে। মনের উপর দীনতা, হীনতা আরোপ ক'রে চলে যারা, তাদের বরং সূক্ষ্মভাবে বিনয়ের অহঙ্কার থাকে। কিন্তু এমনতর যারা তাদের অহঙ্কারের কোন বালাই-ই থাকে না। কৃতিত্ব তাঁদিগকে ভারাক্রান্ত ক'রে তোলে না। কী অসম্ভব কাণ্ড করেছে না করেছে, সে-বিষয়ে তাদের কোন খেয়ালই থাকে না। মানুষের কাছে নিজের বাহবার কথা বলেও না কিছু। অন্যে যখন তার প্রশংসা করে, সে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হ'য়ে পড়ে, ভাবে —আমি আবার কী করলাম? এ-সব কথা কী বলে? তখন গুরুর দয়ার কথা এবং কার্য্যক্ষেত্রে যাদের সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছে তাদের গুণের কথা সম্বেগের সঙ্গে ঘোষণা করে। এদেরই বলে চালাক লোক। 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।' ....কী বলিস প্যারী! এইরকমটা কেমন লাগে?

প্যারীদা—আপনি যা' বলেন, তা' করতে পারলে যে অসম্ভব সম্ভব হয়, এটা আমি দেখেছি। এমন ঘটনাও আমার জীবনে ঘটেছে যে, রোগী অসম্ভব যন্ত্রণায় ছটফট করছে, কিন্তু আমি যেয়ে তার গায় হাত দিতেই রোগী ব'লে উঠল—প্যারী! তুমি আমাকে ছোঁয়ামাত্র আমার শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল। তুমি কী করলে আমার? তখন আপনার কথা স্মরণ ক'রে আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়। বহু ক্ষেত্রে দেখেছি—আমি যেয়ে উপস্থিত হ'লেই রোগী মনে খুব বল পায়। আমি যা' জানি বা না জানি, অনেকের অগাধ বিশ্বাস আছে আমার উপর। আর আমিও ভাবি, রোগীকে আরাম ক'রে তোলাই আমার স্বার্থ।...........আপনার কথা যতটুকু পালন করি, ততখানিই উপকৃত হই। আর এ-ও বুঝি, আমার করার খাঁকতি আছে ঢের। মাথাও তেমন ভাল না, সব কথা মাথায় ধ'রে রাখতে পারি না। নচেৎ অসম্ভব যে সম্ভব করা যায়, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার ভাগ্য খুব ভাল, করাও নিতান্ত কম নয়, তবে স্বল্পে সন্তুষ্ট থেকো না। অবিরাম এগিয়ে চল, দেখতে পাবে—করারও শেষ নেই, জানারও শেষ নেই, সার্থকতারও শেষ নেই। কেউ থমকে দাঁড়িয়ে আছে, এগুচ্ছে না, এমনটা দেখলেই আমার ভাল লাগে না। আমি জন্মেছি একটা অন্তহীন উৎসাহ নিয়ে। উৎসাহের সঙ্গে নিত্য নব-নব জীবন-বর্দ্ধনী সম্ভাবনাময় প্রচেষ্টায় বাস্তবভাবে রত থাকা—আমি বুঝি, এই হ'লো জীবনের আরাম, এই হ'লো জীবনের উপভোগ। ইষ্টার্থে অমনতর করতে থাকাই ধর্ম্ম। তাই, ধর্ম্মের সঙ্গে আলস্য বা জড়তার কোন সম্পর্ক নেই। অথচ আমাদের দেশে কেমন ক'রে যেন ধর্ম্মের মধ্যে তামসিকতা এসে ঢুকে পড়েছে। তাই, আমি কর্ম্মের উপর

এত জোর দিই। আর, আমি বিশ্বাস করি, তোমরা যদি তেমন হও, তোমাদের ভিতর-দিয়ে প্রকৃত ধর্ম্মের জাগরণ হবে সর্ব্বত্র।

প্রফুল্ল (দাস)—পৃথিবীতে তো কর্ম্মঠ লোকের অভাব নেই, তাহ'লে কি বুঝতে হবে, যেখানে যত কর্ম্মঠ লোক আছে সবাই ধার্ম্মিক এবং তাদের দ্বারা ধর্ম্মের জাগরণ হ'চ্ছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে কথা যদি বল, তাহ'লে পাগলরাই সব চেয়ে বড় ধার্ম্মিক ও ধর্ম্ম-প্রচারক। কারণ, বেশীর ভাগ পাগলই চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারে না, এমন-কি ভাল ক'রে ঘুমোয়ও না। একটা-না-একটা কিছু করছেই। আর কিছু না পারলে মুখে বগবগ করে। আর, সাধারণ কর্ম্মঠ লোকের মধ্যে বহু লোককে দেখতে পাবে—তারা কোন না-কোন প্রবৃত্তি-তাড়িত হ'য়ে তার পরিপূরণের ধান্ধায় ছুটোছুটি করছে। প্রায় জায়গায়ই প্রেরণা হ'লো মান-যশ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, কামিনী-কাঞ্চন ইত্যাদি। আত্মসুখকামনায় এই যে উদ্বাস্ততা, এও একরকমের পাগলামি। মানুষ আত্মসুখকামনায় আবদ্ধ যতক্ষণ, ততক্ষণ তার জীবন পশু-জীবনের সামিল। ধানের ক্ষেত দেখে গরু দড়ি ছিঁড়ে ছুট দিলে গরুর সেই কর্ম্মকে যদি একটা মহত্ত্বপূর্ণ ধর্ম্মকার্য্য ব'লে মনে না কর, তাহ'লে হীন-প্রবৃত্তিলালসায় যারা আকাশ-পাতাল চু'ড়ছে, তাদের সে-প্রচেষ্টাকে ধর্ম্মের অভিব্যক্তি ব'লে মনে করতে যাবে কেন? ফলকথা, 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলে কাম, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম-নাম।' কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিকাম হ'য়ে নিজের ও অন্যের সত্তাসম্বর্দ্ধনার জন্য যে চলা, বলা, ভাবা ও করা, তাকেই বলতে পার ধর্ম্মকার্য্য। যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনঞ্চাপি ধ্রিয়তে স ধর্ম্মঃ। মানুষ যদি ইষ্টমুখী না হয়, উৎসমুখী না হয়, সত্তামুখী না হয়, কারণমুখী না হয়, ঈশ্বরমুখী না হয়, তাহ'লে তাকে প্রবৃত্তিমুখী হ'তেই হবে। আর, যতদিন সে প্রবৃত্তির কবলে থাকবে, ততদিন সে নিজেরই হো'ক বা অপরেরই হো'ক, সত্তাকে পুষ্ট ক'রে তুলতে পারবে না অর্থাৎ সত্তার সেবায় লাগতে পারবে না। ধর্ম্মের কারবার হ'লো সত্তাকে নিয়ে, মানুষ আত্মসত্তায় স্থিতিলাভ ক'রে অন্যের সত্তাকে যদি পোষণ দিতে না পারলো, তাহ'লে সে যত যাই করুক, সে করার দাম কী? সে যদি মহাশক্তির আধারও হয়, বিশ্বকর্ম্মার মতো কর্ম্মঠও হয়, তবু তার সে-কর্ম্মের কোন স্থায়ী মূল্য নেই—সত্তাধারী যারা তাদের পক্ষে। তাই আমি বলি, সহজাত কর্ম্ম যার যা' আছে তাই কর কিন্তু সত্তায় সংস্থিত হ'য়ে ও সত্তাকে সম্পুষ্ট করতে। তবেই তা' হবে ধর্ম্ম। আর, সত্তায় সংস্থিত হওয়া মানে ইষ্টে সংস্থিত হওয়া, নচেৎ সত্তার বোধ জাগে না। ....শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার, মোক্তার, ধোপা, নাপিত, কামার, কুমোর, দোকানদার, চাকরে, কৃষাণ, নেতা, রাজা, উজীর, মজুর, যেই যা' হো'ক—প্রত্যেকের কর্ম্মই ধর্ম্ম হ'তে পারে—যদি তা' ইষ্টের প্রীতি ও আরাধনার জন্য

হয়, ইষ্টার্থী লোকসেবার জন্য হয়। তখন দেখতে পাবে—প্রত্যেকের প্রত্যেক কাজের ভিতর-দিয়ে তার নিজের ও অন্যের সত্তায় রসসিঞ্চন হ'তে থাকবে। (মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে) তখন দেখে নিও—সুখ কারে কয়। ঘরে-ঘরে, ঘটে-ঘটে পরমাত্মীয় খুঁজে পাবে সকলে। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' না কী কয়, তাই হ'য়ে যাবিনি। কি জানি গান কর তোমরা—'প্রেমের রাজা, প্রেমের রাজ্য, প্রেমের সিংহাসন, ও তার প্রেমের দন্ড, প্রেমেরই শাসন।'

শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখ ফুটন্ত গোলাপের মতো কমল, কমনীয়, মধুর ও রঙ্গিল হ'য়ে উঠেছে। অপূর্ব্ব শোভা বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে শ্রীঅঙ্গ দিয়ে। সে-চেহারা দেখলে মানুষটিকে কেবলই ভালবাসতে ও আদর-যত্ন করতে ইচ্ছা করে।

এইবার প্যারীদা তামাক সেজে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে বললেন—দ্যাখ্ প্যারী! আমার পেটটা কেমন দম ধ'রে আছে, কাল রাত্রে পেটে বাতাসও হয়েছে।

প্যারীদা—এমন হ'লো কেন? পেট তো ভালই ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' আর কও কেন? কাল রাত্রে ভাতের পাতে পায়েস মেরে দিছি এক বাটি। মিষ্টি পালি, কতখানি খাই আমার হুঁশ থাকে না।

প্যারীদা—খেয়েছেন ভালই করেছেন। না খেতে-খেতে আপনার পেট মরে যাচ্ছে। আপনার যা' ভাল লাগে খাবেন। যেদিন খাওয়া একটু বেশী হয়েছে ব'লে মনে হয়, আমাকে তখনই বলবেন, খাওয়ার পর একটু ওষুধ খেয়ে রাখলেই হজম হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—এ ব্যবস্থা তুমি ভালই দিয়েছ। কত ভাগ্যে সোনার বাংলায় জন্মলাভ করেছি, ইচ্ছা করে এর ফল-জল, আলো-হাওয়া, খাদ্য-খাবার, স্নেহ-প্রীতি, প্রাকৃতিক মাধুর্য্য প্রাণ ভ'রে উপভোগ করি। (একটু থেমে)......... এ আমার গোঁড়ামি কিনা বলতে পারি না, কিন্তু আমার মনে হয়, বাঙ্গালীর মহৎ কিছু দেবার আছে জগৎকে। বাংলা জাগলে ভারত জাগবে, ভারত জাগলে জগৎ জাগবে। তাই, প্রথমে বাংলায় খুব ভাল ক'রে কাজ হওয়া দরকার। আর, কান্ডও সৃষ্টি করেছ তোমরা গুরুতর। এইতো সেদিন তোমরা কতকগুলি নতুন জেলায় গেছ। চিঠিপত্রে খবর যা' পাচ্ছি, তা'তে খুব আশা হয়, ভরসা হয়। আর, হবে নাই বা কেন? রক্ত তো এখনও মরেনি। তোমরা যে মানুষের প্রাণের কথাকে তুলে ধরছ তাদের সামনে। এইভাবে যদি চালাতে পার এবং আরও কর্ম্মী যদি সংগ্রহ করতে পার, দেখতে পাবে—দেশ কতখানি এগিয়ে গেছে। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন হ'তেও তখন আর বেশী দেরী লাগবে না। আমরা যদি সর্ব্ববিষয়ে সুগঠিত, সংগঠিত, সংহত, শক্তিমান ও দক্ষতর হ'য়ে উঠি, আমাদের অস্তিত্বের পক্ষে অবান্তর, অপ্রয়োজন ও অন্তরায় যারা, প্রকৃতির বিধানেই তারা ঝরাপাতার মতো খ'সে পড়বে। তাই, তোমাদের যে যজন, যাজন,

ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী ও সদাচার চারাবার কথা বলেছি—এইটে চারিয়ে যাও, দেখতে পাবে—এই ভিত্তির উপর সবকিছুই গজিয়ে উঠবে। এর সুদূর-প্রসারী ফল কী, এখন বুঝতে পারবে না, বুঝতে পারবে পরে। এখন শুধু বীজ ছিটিয়ে যাও ও মানুষগুলিকে গজিয়ে তোল। তাই, গোড়ার জিনিস হলো দীক্ষা। (প্রফুল্লকে)—তোর কাজ বেশ হ'চ্ছে, এখন খেয়াল থাকা চাই যে দীক্ষা দিয়ে তবে মানুষ আশ্রমে পাঠাবি। Physical connection-এ (স্থূল সংশ্রবে) আসার আগে যদি spiritual connection (আধ্যাত্মিক সংযোগ)-টা ক'রে দিতে পারিস তাহ'লে আসাটাও সফল হয়। জিনিসটা এমন ক'রে তুলে ধরবি যা'তে সে দীক্ষার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। দীক্ষা হ'লো নবজন্ম, যাকে বলে দ্বিজত্বলাভ, ঐ থেকেই মানুষের ইষ্টীচলনের সূত্রপাত। তার আগ পর্য্যন্ত অনিষ্টের সঙ্গে মিতালি ক'রে চলে মানুষ তাই, দীক্ষার আগ্রহ যদি মানুষের মধ্যে জাগাতে না পারলে তা'হলে তোমার যাজন কিন্তু পূর্ণাঙ্গ হ'লো না। তোমাকে দিয়ে তার কোন উপকার হ'লো না। আর, নিজে responsibly (দায়িত্বসহকারে) convince না ক'রে (প্রত্যয় এনে না দিয়ে) যদি আশ্রমে আসার প্রস্তাব কর, তাহ'লে যাজনের ব্যাপারে তুমি কিন্তু কাঁচা থেকে যাবে। আবার, দীক্ষার mood (মনোভাব) যখন আসলো তখন যদি দীক্ষা না দাও, তাহ'লে নানা বিবেচনা এসে চেপে ধ'রে তাকে দীক্ষা হ'তে বঞ্চিত ক'রে তুলবে। তাই, বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে অগ্রসর হবে প্রত্যেকটা মানুষের সঙ্গে। কি বলব, কি মনে করবে, এমনতর দ্বিধাগ্রস্ত রকমে যদি চল, তার ফল ভাল হয় না। তোমাদের ব্যক্তিত্ব এত বিরাট হওয়া চাই যে, যে-কোন মানুষ তোমাদের সংস্পর্শে এসে যেন নিজেকে ধন্য ব'লে বোধ করতে পারে। স্মরণ রেখো তোমরা পরমপিতার দূত। মানুষের কাছে তোমাদের কাবু হবার কিছু নেই। কিন্তু তোমাদের কাছে মানুষের কাবু হবার আছে। কারণ, তোমরা যে-ধনে ধনী সে-ধন তাদের নেই, অথচ তার প্রয়োজন আছে তাদের। কিন্তু তোমরা তাদের কাছে কিছুরই কাঙ্গাল নও। কাঙ্গাল যদি হও কিছুর, সে তাদের মঙ্গলের। তাই, তোমাদের দেখে মানুষ বলতে বাধ্য—'যে-ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি, মাগি আমি তাহারই খানিক।' তাই বলছিলাম, নূতন যেখানে যাও সেখানেই যদি একটা group (গুচ্ছ) সৃষ্টি ক'রে কাজ ভাল ক'রে start (সুরু) করিয়ে না দিয়ে আসতে পার, এ-কাজ তেমন ক'রে দানা বাঁধবে না, effect (ফল) নষ্ট হ'য়ে যাবে। মনে থাকে যেন, worker (কর্ম্মী) সৃষ্টি করা লাগবে সমাজের whip (প্রধান)-দের ভিতর থেকে। Worker (কর্ম্মী) সৃষ্টি করাই তোমাদের প্রধান কাজ। একজায়গায় কিছু বেশীদিন লাগলেও সেখানে solid (বাস্তব) কিছু না ক'রে সেখান থেকে অন্যত্র যাবে না। তুমি যে কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট, হিন্দুমহাসভা, মুসলিম লীগ, স্কুল, কলেজ, বার লাইব্রেরী, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট

বোর্ড, স্থানীয় শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সম্প্রদায় ও সমাজের নেতৃবর্গের সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ক'রে thorough (পুরো) আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছ, এটা খুব ভাল। যে-সব জায়গা ঘুরে এসেছ, আবার যদি সেখানে কখনও যাও, সেই সমস্ত লোকের কাছে এমন ক'রে যাবে যেন একটা দেবতার আবির্ভাবের মতো, like a divine flash (একটা দিব্য উচ্ছ্বাসের মতো)। খুব tuning (ইষ্টের সঙ্গে একতানতা) থাকলে ঐরকম হয়। মানুষগুলির যেন এমনতর বোধ হয়, তোমাদের হারায়-হারায় এবং হারালেই কি যেন বিরাট ক্ষতি হ'য়ে যাবে। তোমাদের জন্য একটা ক্ষুধা যেন লেগেই থাকে।

প্রফুল্ল—অনেক শিক্ষিত লোক এমন কথা বলে যার কোন মানে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা'তো বলবেই। কিন্তু কা'রও কথার প্রতিবাদ করতে গেলে 'আমরা' শব্দটা ব্যবহার করবি, বলবি becoming (বিবর্দ্ধন)-এর চাহিদা যখন আমাদের মলিন হ'য়ে যায়, ইষ্ট ও কৃষ্টির সংস্পর্শচ্যুত হ'য়ে cultural conquest (কৃষ্টিগত পরাভব)-এ আমরা যখন বিমূঢ় হ'য়ে পড়ি, তখন আমাদের অজ্ঞাতসারে বুদ্ধি ও বোধ বিকৃত হ'য়ে পড়ে। না চ'টে, না চটিয়ে এইরকম কত বলা যায়, যা'তে মানুষের মাথা সাফ হ'য়ে যায়।............নিজে যেমন করবি, অন্যান্য কর্ম্মীদেরও তেমনি ভাল ক'রে খুলে দিবি। কর্ম্মীগুলিকে যদি তৈরী ক'রে নিতে না পারিস, এ একলার কাজ নয়। তুই আর শরৎদা touring batch-এর (ভ্রাম্যমান দলের) head (প্রধান) হিসাবে এমন demonstration (দৃষ্টান্ত) দিবি, যা'তে প্রত্যেকটি কর্ম্মী উপকৃত হয়।

প্রফুল্ল—আমি আর কী শেখাব? আমার ঢের শেখবার আছে field worker (বাইরের কর্ম্মী)-দের কাছ থেকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই বছরের পর বছর এখানে থাকলি, কেষ্টদার কাছে হাতে-কলমে শিখলি—তার একটা দাম আছে না?

৬ই চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৪৮ (ইং ২০।৩।৪২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃত-নিবাসে বিছানায় ব'সে আছেন। এমন সময় নোয়াখালীর চন্দ্রনাথদা (বৈদ্য) আসলেন। চন্দ্রনাথদাকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লসিত হ'য়ে বললেন—'এখানে আইছ, ভালই হইছে, তোমার সঙ্গে আমার কথা বলার দরকার ছিল।' চন্দ্রনাথদা প্রণাম ক'রে নীচেয় বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর চন্দ্রনাথদার কাছে বর্ম্মার বিশেষতঃ সেখানকার যুদ্ধকালীন অবস্থার খবরাখবর জানতে চাইলেন। চন্দ্রনাথদা সংক্ষেপে মোটামুটি খবর বললেন। সেই প্রসঙ্গে বললেন—বিপদের মধ্যে পড়লে আপনার দয়া প্রতি পদে-পদে অনুভব করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার দয়া মানুষের উপর আছেই। কিন্তু যজন, যাজন,

ইষ্টভৃতি যারা করে—প্রত্যেক কাজে বিহিত ক্বতিচলন নিয়ে,—তারা সেই দয়াটা বেশী ক'রে বোধ করতে পারে ও তার সুযোগও বেশী ক'রে গ্রহণ করতে পারে। পৃথিবীতে যত রকম যন্ত্র আছে তার মধ্যে সব চাইতে সেরা যন্ত্র হ'চ্ছে মানুষের শরীর। এই যন্ত্রকে ঘসে-মেজে তেল দিয়ে যত তীক্ষ্ন, তরতরে ও উপযুক্ত রাখা যায়, ততই সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম জিনিস ধরা পড়ে তা'তে। আবার ঐ সূক্ষ্ম বোধ ও অনুভূতি-অনুযায়ী ক্ষিপ্রভাবে ক্রিয়া করার শক্তিও গজায় তা'তে। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি ও ইষ্টানুগ ক্বতিচলনে ঐ জিনিসটি হয়। মানুষ যত প্রবৃত্তি-মুখী হয়, সে তত blunt (ভোঁতা) ও callous (বোধহীন) হয়, কোথায় কী করতে হবে তা' ঠাওর পায় না, আর ঠাওর পেলেও motor-sensory co-ordination (বোধপ্রবাহী ও কর্ম্মপ্রবোধী স্নায়ুর সঙ্গতি) না থাকার দরুন, যেখানে যা' করণীয় ব'লে বোঝে, ত্বরিত গতিতে তা' করতে পারে না। এইভাবে বিপদের মাঝখানে গিয়ে পড়ে, কিন্তু অনেক সময় তা' হ'তে মুক্ত হবার পথ আর খুঁজে পায় না। মানুষ লাখ ধান্ধায় ঘোরে, কিন্তু ইষ্টধান্ধার ধার ধারে না, ওতে কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে। আর, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ব বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হ'য়ে আরো বিপর্য্যস্ত হ'য়ে পড়ে। বিপর্য্যয়ের মধ্যেও ত্রাণসূত্র লুকিয়ে আছে কোথায় সেটা আবিষ্কার ক'রে একাগ্রভাবে নিজেকে পরিচালিত করতে পারে না সেই পথে। তখনও প্রবৃত্তির বিক্ষেপ বিভ্রান্ত ক'রে তোলে তাকে। ধর, একজন মানুষ আত্মরক্ষার জন্য একজায়গা থেকে আর-এক জায়গায় পালাচ্ছে, লোকটা যদি মাতাল হয়, আর মাঝখানে যদি একটা মদের দোকান পায়, হয়তো ঢুকে যাবে সেখানে, ভাববে একটু মদ খেয়ে নিলে শরীরটা চাঙ্গা হবে, তা'তে তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারবে। এই ভেবে মদের দোকানে ঢুকে মদ খেতে বসলো। মদ খেতে ব'সে আর মাত্রা ঠিক রাখতে পারলো না, নেশার ঘোরে সেখানেই প'ড়ে রইলো, পরে ধরা পড়লো সেখানে, এইরকম কত যে হয়, তার কি ঠিক আছে? তাই, যজন, যাজন, ইষ্টভৃতিতে অভ্যস্ত হওয়া লাগে সকলেরই, ওই নিত্য অভ্যাসে সত্তার পালন, পোষণ ও রক্ষণী রসদ মজুত হয় চরিত্রে। ঐ মজুদ রসদই তাকে টিকিয়ে রাখে অসময়ে। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি যে করে না, ইষ্টধান্ধায় যে সক্রিয়ভাবে ব্যাপৃত থাকে না, বুঝতে হবে, অনিষ্ট অর্থাৎ প্রবৃত্তি তার পিছু নিয়েছে, আর উপযুক্ত সময়ে তার কাজ সে করবেই। তাই, সঙ্কটকাল ছাড়া অনেক সময় বোঝা যায় না, কার বাস্তব সম্বল কতখানি।

প্যারীদা (নন্দী)—যারা এখানে নাম নেয়নি, তারা তো ইষ্টভৃতি করে না। আবার, বহুলোক তো আছে, কোথাও দীক্ষা নেয়নি। তারাও তো বিপদে রক্ষা পায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রক্ষার বিধিকে যে যতখানি পালন করে, সে ততখানি রক্ষা পায়, তা' সে নাম নিক আর না নিক। একটা মানুষ যদি পিতৃভক্ত বা মাতৃভক্ত

হয়, তারও অনেকখানি সম্পদ্ থাকে। দেখা যাবে, তার চলা, বলা, ভাবা, করা অনেকখানি পিতৃকেন্দ্রিক বা মাতৃকেন্দ্রিক। কেন্দ্রানুগ যজন, যাজন ও ভরণ তার জীবনে থাকেই এবং অমনতর শ্রেয়-অনুসরণের ফল যা' তা' থেকেও সে বঞ্চিত হয় না। তবে বিধিমাফিক করার ভিতর-দিয়েই বিহিত ফল লাভ হ'য়ে থাকে। নিয়মিতভাবে ইষ্টভৃতি করার ফল অমোঘ। ইষ্টভৃতি মানে মাঙ্গলিক যজ্ঞ।

প্রফুল্ল—ইষ্টভৃতির বিষয়ে আপনার একটি ছড়া আছে, অতি চমৎকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী?

প্রফুল্ল—ইষ্টভরণ ধান্ধা যাহার
মগজ থাকে জুড়ে
সব প্রবৃত্তি ইষ্টার্থে তার
বিনিয়ে ওঠে ফুঁড়ে।
সমাহারী দীপ্ত নেশায়
কর্ম্ম-সন্দীপনা
ঐ আবেগে অটুট হ'য়ে
আনে সম্বর্দ্ধনা।
স্থবির স্নায়ুর স্বস্থটানে
চলৎ স্নায়ুর গতি
সংবেদনার সংক্রমণে
দেয়ই সাড়ায় নতি।
আত্মম্ভরী দরিদ্রতা
অলস ঠুন্‌কো মান
অমনি নেশার ক্রমোৎকর্ষে
লভেই তেমনি ত্রাণ।
সংগ্রাহী তার এমনি আবেগ
শক্তি সরঞ্জামে
বুদ্ধি সহ কুশলতায়
আপৎকালে নামে।
ওড়ে বিপদ ছাইয়ের মতন
ঝলক্ দীপন রাগে
সম্পদে সে অটুট চলে
ইষ্ট-অনুরাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বেশ তো ছড়াটা। ওর মধ্যে মরকোচ ভাঙ্গা আছে। ইষ্টভৃতির কথা নূতন কিছু না। বেদ, গীতা, বাইবেল, কোরাণ, সংহিতা সব জায়গায়ই আছে এর কথা। জেমস্-এর কথার মধ্যেও এর আভাস পাওয়া যায়। নিত্য

পঞ্চমহাযজ্ঞের কথা হিন্দু সন্তান আজ ভুলে গেছে। দুর্দ্দশাও তাই আজ ঘিরে ধরছে। ইষ্টভৃতির মধ্যে মোটামুটি জিনিসটা আছে। তাই, ইষ্টভৃতিটা যদি ভাল ক'রে চারান যায়, মায় ভ্রাতৃভোজ্য ও ভূতভোজ্য ইত্যাদি সহ,—তাহ'লে মানুষের চরিত্র, কর্ম্মক্ষমতা ও যোগ্যতা যেমন বাড়ে, তেমনি দুঃস্থদেরও একটা সাহায্যের ব্যবস্থা হয়। বড়-বড় philosophy (দর্শন) মানুষকে না শিখিয়ে ছোট-ছোট টোটকা আচরণ ভাল ক'রে শেখান ভাল। করার ভিতর-দিয়ে যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানই হয় কার্য্যকরী।.........এখনও সময় আছে, এখনই লেগে যাও। আর দেরী করলে সব হাতের বাইরে চ'লে যাবে, চোখের সামনে দেখছ না কী হ'য়ে যাচ্ছে, এখনও হুঁশ হয় না! লাগলে এক লহমায় হ'য়ে যায়, আমি যা' বলি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়। ২৫০ লোক ৩০০ টাকা করে দাও, ঝপাঝপ জমি কিনে ফেল। আর, বিভিন্ন এলাকা থেকে চাষবাস করতে পারে এমনতর শক্ত, সমর্থ, বিশ্বাসী অন্ততঃ ২৫০ ঘর লোক এখানে এনে বসাও। এ জায়গাটা বিপদের সময় মানুষের যেন একটা নিরাপদ আশ্রয়স্থলের মতো হয়। আর, হাঁটা পথে বিভিন্ন জায়গা থেকে আশ্রমে আসতে গেলে যা'তে লোকজনের অসুবিধা না হয়, সেইজন্য কয়েক মাইল অন্তর-অন্তর ঘাঁটি স্থাপন কর। ঋত্বিক্‌রা দীক্ষাদি তো দিয়েই থাকে, এই দিকে লক্ষ্য রেখে কায়দা মতো জায়গাগুলিতে দীক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি ক'রে, সেখানে কর্ম্মী নিয়োগ ক'রে তাদের সচেতন ও সংঘবদ্ধ ক'রে তুললেই হয়। আমি এত কথা বলছি এইজন্য যে যুদ্ধ যদি ভারতের মাটিতে সুরু হয়, তা'হলে যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও নাগরিক জীবন একেবারে বিপর্য্যস্ত হ'য়ে পড়তে পারে। সে-অবস্থায় জনসাধারণ যা'তে বিচ্ছিন্ন ও অসহায় হ'য়ে না পড়ে, তার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত হওয়া ভাল, যা'তে বিপদ আসলে ঠেকে পড়তে না হয়। এ জায়গাটা রেল-লাইন থেকে অনেক দূরে, কোন সামরিক লক্ষ্যবস্তুও এর ধারেকাছে নেই, সেদিক দিয়ে এ জায়গাটা অনেকখানি নিরাপদ। তবে ওদিক দিয়ে নিরাপদ হ'লেও, সাধারণতঃ দেখা যায়, Government (শাসন-সংস্থা) যদি ভেঙ্গে পড়ে, তাহ'লে চোর, গুণ্ডা, বদমায়েস, ডাকাত, দাঙ্গাবাজ ইত্যাদি অপরাধীরা শক্তিমান হ'য়ে ওঠে, আবার দুষ্ট-অভিপ্রায়ওয়ালা দলগুলিও প্রবৃত্তির ইন্ধন জুগিয়ে মানুষের বিরুদ্ধে মানুষ ক্ষেপিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে চেষ্টা করে। সেইজন্য এদের হাত থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা আগে থাকতেই ক'রে রাখতে হয়। আজকাল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের যে ধুয়ো উঠেছে সেও বড় বিপজ্জনক। তাই প্রয়োজন ধর্ম্মগুণ্ডার, যা'তে মানুষ অকারণ নিপীড়িত বা বিধ্বস্ত না হয়। আমরা যে নারায়ণের পূজো করি, তিনি হ'লেন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দ্দার হ'লে চলে না। অর্থাৎ, জীবনসংগ্রামে আত্ম-রক্ষার উপযুক্ত হাতিয়ার ও ব্যবস্থা চাই। এ প্রস্তুতি সাত্ত্বিক সাধনারই অঙ্গীভূত।

এই সামগ্রিক সাধনাকে আমরা যেদিন থেকে উপেক্ষা করেছি, সেইদিন থেকে আমরা হীনবীর্য্য হ'য়ে পড়েছি। আমাদের সমাজবিধানেও দেখতে পাই বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের সমাবেশ। শুধু বিপ্র দিয়ে যদি সমাজ অক্ষুণ্ণ থাকতো, তাহলে চারটে বর্ণের উদ্ভব হ'তো না। শুধু মাথা নিয়ে মানুষ বাঁচে না, বাঁচা তো দূরের কথা, মানুষের অস্তিত্বেরই উদ্ভব হয় না। অস্তিত্বের জন্যই প্রয়োজন হয় মাথার সঙ্গে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের। আর, এগুলির মধ্যে চাই সুসঙ্গতি। সমাজের মধ্যেও, বৃহত্তর সমাজ কি কোন সংস্থার মধ্যেও চারটি বর্ণের গুণ, কর্ম্ম ও চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের সুসমাবেশ ও সুসঙ্গতি। এ যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ তার অস্তিত্ব পাকা হয় না। অমনতর হ'লেই তারা নিজেরাও বাঁচতে পারে, অন্যকেও বাঁচাতে পারে। আমাদের ঋষিমহাপুরুষরা যা' ক'রে গেছেন, তা' হ'লো প্রাকৃতিক বিধান। Classless Society (শ্রেণীহীন সমাজ) আমরা বুঝি না, আমরা বুঝি, মানুষ জন্মেই classified (শ্রেণীভুক্ত) হ'য়ে, তার বিশেষ বংশধারা, জৈবী-সংস্থিতি ও সংস্কার নিয়ে। দেখতে হবে এই normal class (স্বাভাবিক শ্রেণী)-গুলি যা'তে পরস্পরের পরিপূরক হয়। তার জন্যই প্রয়োজন—সবাইকে ধারণ করেন, পালন করেন, পোষণ করেন, পূরণ করেন এমনতর মূর্ত্ত আদর্শে সংন্যস্ত হওয়া। তা'তে প্রত্যেকে তার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেও ঐক্যবদ্ধ পারস্পরিকতায় সম্বদ্ধ হ'য়ে ওঠে। একেবারে Super Communism (চূড়ান্ত সাম্যবাদ) হ'য়ে যায়। আপনাদের সংস্থায়ও লক্ষ্য রাখতে হবে—বিভিন্ন বর্ণোচিত কর্ম্ম করতে পারে এমনতর সমাবেশ ঠিকমতো হ'চ্ছে কিনা। তা' না হ'লেই unbalanced (সাম্যহারা) হ'য়ে পড়বে। শত-শত বৎসর পরাধীন থাকার ফলে আমাদের দেশে ক্ষত্রিয় থেকেও যেন আজ নেই। একটা জাতির যত গুণই থাক না কেন, তার যদি ক্ষাত্রবীর্য্য না থাকে, পরাক্রম না থাকে, ধুরন্ধর কূটনৈতিক প্রতিভা না থাকে, তাহ'লে ঐ দুর্ব্বলতার রন্ধ্রপথে অনেক কুগ্রহই ভর করতে পারে তার উপর। তাই আমি ক্ষাত্রশক্তির উদ্বোধনের কথা বলি। আজকাল এখানে বুড়ো-বুড়ো লোকেরা পর্য্যন্ত বিশ্ববিজ্ঞানের মাঠে ব্যান্ড বাজিয়ে ড্রিল, প্যারেড ইত্যাদি করে। কেষ্টদা ওরা ব্যবস্থা করেছে। বেশ লাগে। আদৎ কথা হ'লো, যে যে-বর্ণভুক্তই হোক না কেন, অন্যান্য বর্ণের গুণের কিছু-না-কিছুও তার মধ্যে থাকে, হয়তো তা' পরিস্ফুট নয়। যেমন, বিপ্রের মধ্যে বিপ্রবর্ণোচিত গুণ যেমন থাকে পরিস্ফুটভাবে, অপরিস্ফুটভাবে হ'লেও ক্ষত্রিয়োচিত, বৈশ্যোচিত ও শূদ্রোচিত গুণও কিছু-কিছু থাকে। তাই, বিপ্র-কর্ম্মকে মুখ্য ক'রে অন্যান্য বর্ণোচিত অনুশীলন সে যদি কিছু-কিছু চালায় তা'তে তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের পক্ষেই সহায়তা হয়। অন্যান্য বর্ণের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। তাই ক্ষাত্রোচিত অনুশীলন সবারই কিছু-কিছু করা ভাল।

তার উপযোগিতা আছে ঢের। আর, যুদ্ধ ও তজ্জনিত অরাজকতা যদি আমাদের দেশে না-ও হয়, তাহ'লেও এক মেঘে শীত যাবে না। উৎপাত ও উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজন সবসময়ই থাকবে। তা'ছাড়া ক্ষাত্রপ্রতিভাসম্পন্ন একদল যদি মোতায়েন থাকে, তারা চাষবাস করা, অনাবাদী জমিকে আবাদ-যোগ্য করা, রাস্তাবান্ধা, আল বেঁধে দেওয়া, পুকুরকাটা, খালকাটা, জঙ্গল সাফ করা, শিল্প-কার্য্যাদি করা, লাঠি, ছোরা, মুষ্টিযুদ্ধ, যুযুৎসু ইত্যাদি শেখা ও শেখান, পাহারা দেওয়া ইত্যাদি অর্থাৎ এককথায় যুগপৎ কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এই চতুরঙ্গ নিয়ে থাকতে পারে। আবার মজা এই—লোকে যদি জানে, অন্যায় করলে আর নিস্তার নেই, আমার পিছনে সহস্র চক্ষু, সহস্র ডাণ্ডা উদ্যত হ'য়ে আছে, তাহ'লে কিন্তু তখন আর অন্যায় করতেও অতো সাহস পায় না। ভয়েও অনেকখানি নিরস্ত থাকে, দণ্ড-দানের প্রয়োজনই ক'মে যায়। একদিকে যদি থাকে ঋত্বিক্ আর একদিকে যদি থাকে এই দল তাহ'লে সেবা, স্বস্তি, শাসন, তোষণ সবরকমের ভিতর-দিয়ে মানুষ ঠিক থাকে। তাই ডি, এল, রায়ের নাটকে আছে—চাণক্যের সময় নাকি আসমুদ্রহিমাচল এক ত্রস্ত শান্তি বিরাজ করতো।

এমন সময় কালীষষ্ঠীমা আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের কালীষষ্ঠী যেমন মিষ্টি, তেমনি কড়া। এমনি ঠাণ্ডা কিন্তু দাপট আছে খুব। তাই ছেলেমেয়েরা যেমন ভক্তি করে, তেমনি ভয়ও করে। কোমল ও কঠোর দুই রকমের সুষ্ঠু সমাবেশ না হ'লে সংসারে চলা কঠিন। আমার কিন্তু দোষ আছে, আমি যেন কঠোর হ'তেই পারি না। নানারকম consideration (বিবেচনা) আসে। তবে অন্যায় ব'লে যেটা বুঝি, তা' কখনও সমর্থন করি না। সোজাসুজি ব'লে দিই, কিন্তু দেখি, মোলায়েমভাবে বলায় সবার যেন কাজ হয় না। বেশী রূঢ়ভাবে বলাও আমার পক্ষে মুশকিল, কারণ, কারও প্রতি রাগ যদি হয়, সেই সঙ্গে-সঙ্গে সহানুভূতিও এতখানি মাত্রায় বোধ করি যে, রাগ যেন তলে প'ড়ে যায়, রাগটা যে ভাল ক'রে প্রকাশ করব, তা' আর পেরে উঠি না। মানুষের ভুলত্রুটি আমার যেমন চোখে পড়ে, সেই সঙ্গে-সঙ্গে ঐ ভুলত্রুটির কারণও চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কে কী করে ও কেন তা' করে, দুই-ই একসঙ্গে ধরা পড়ে। তাই ভাবি, রাগ করার নেই, সংশোধন করার আছে। কিন্তু এই সংশোধনের ব্যাপারে শুভবুদ্ধি নিয়ে আত্মস্থ থেকে ভীতিপ্রদ তেজ দেখানর প্রয়োজন আছে। ওটা বাদ দিয়ে নির্ব্বীর্য্য প্রেমে কিন্তু মানুষের সংশোধন হয় না। শুভবুদ্ধি যদি থাকে এবং মাত্রা যদি ঠিক থাকে, তাহ'লে একটা মানুষকে শাস্তি দিলেও সে-মানুষটা পর হ'য়ে যায় না। পর হওয়া তো দূরের কথা, বরং ওর ভিতর-দিয়ে আরো বেশী আপন হয়। বুদ্ধি থাকা উচিত, মানুষটাকে কেমন ক'রে জয় করব; আর, সেটা নিজের কোন স্বার্থের জন্য নয়, ইষ্টার্থে।

হরিপদদা (সাহা)—মানুষ তো লোকনিন্দার ভয়ে, হাঙ্গামার ভয়ে অনেক সময় চুপ ক'রে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লোকনিন্দার ভয়ে তুমি যদি অসৎ বা অন্যায়কে প্রতিরোধ না কর, সেটা তো তোমার ক্লীবত্ব। তার মানে, তোমার ও সকলের লাঞ্ছিত হওয়ার পথ তৈরী ক'রে রাখলে তুমি। তোমার সম্বন্ধে কে কী ভাবে বা ভাববে, সেটাকে বড় ক'রে না দেখে বাস্তবে তুমি কী, সেইদিকে বেশী নজর দেওয়াই ভাল। তুমি যদি সৎ হও, ন্যায়পরায়ণ হও, আর লোকে যদি তোমাকে অন্যরকম ভাবে, তা'তে তোমার চারিত্রিক সম্পদ্ উবে যাবে না। আবার, তুমি যদি অসৎ হও ও অন্যায় কর এবং লোকের চোখে ধূলো দিয়ে চলতেও পার (অবশ্য তা' বেশীদিন পারা যায় না) তা'তে কিন্তু তুমি সৎ হ'য়ে গেলে না। তোমার মূল সম্পদ্ হ'লো তোমার চরিত্র। লোকভয়ে তুমি যদি কতকগুলি গলদ ও গোঁজামিলকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজেকে দুর্ব্বল ও হীন ক'রে তোল, তাহ'লে তুমিই কিন্তু ঠকে গেলে। আসল কথা হ'লো ইষ্টকে খুশি করা, তা'তে দুনিয়ায় লাভ-ক্ষতি, নিন্দা-গ্লানি যাই আসুক না কেন, তা'তে ভ্রূক্ষেপ না করা। ইষ্টের দিকে নজর গেলে বুদ্ধি হয় সকলের মঙ্গল করার। তখন মানুষ মানুষের মুখ চাওয়া-চাউয়ি ক'রে চলে না। নিরিখ তার ঠিক থাকে। সেবা, প্রীতি ও শ্রদ্ধার ভাব নিয়ে চললেও মানুষের অমঙ্গল হয় যা'তে তাকে সে প্রশ্রয় দেয় না। তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবই হয় অসাধারণ। সে বজ্রের মতো কঠোর হ'য়েও মানুষের যতখানি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, লাখ মিষ্টি ব্যবহারেও মানুষ সে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে না। তাকে মানুষ সাময়িকভাবে ভুল বুঝলেও, অচিরেই বুঝতে পারে পরম হিতকারী বন্ধুরূপে। অবশ্য একদল হয়তো থাকবে যারা ঈর্ষ্যাপরবশ হ'য়ে তার নিন্দাবাদ ক'রে বেড়াবে, কিন্তু সেখানেও তার নিজের কিছু করা লাগবে না। পরিবেশই তাদিগকে চেপে ধরবে। আমার জীবনে এমন কত ঘটেছে। আমি যখন ডাক্তারি করি তখন আমার হাতে রোগী আরাম হ'তো খুব। আর, চারিদিকে খুব সুনাম প'ড়ে গেল। খুব সুখ্যাতি করতো সবাই। এতে স্থানীয় প্রবীণ চিকিৎসকদের মধ্যে কেউ-কেউ খুব ঈর্ষ্যান্বিত হ'য়ে উঠলো। লোকের সামনে আমাকে হীন কটূক্তি ক'রে অপমান করতেও কুণ্ঠিত হ'তো না। আমি চুপ ক'রে থাকতাম। আর, পিছনে আমার সম্বন্ধে যে কী বলতো-না-বলতো তার তো ঠিকঠিকানাই ছিল না। লোকে বলতো—যাই কন, রোগী তো সেরে তোলে ডাক্তারবাবু, আর টাকা-পয়সার উপর লোভ বলতে নেই, কেমন মিষ্টি কথা, কেমন মিষ্টি ব্যবহার, আমরা ঘরের মানুষ রোগীর জন্য যতখানি ব্যস্ত না হই, ডাক্তারবাবু যেন তার চাইতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। তার উত্তরে বলতো—রোগ-সারানর কথা আর ক'য়ো না। ও কি আর ডাক্তারী জানে যে চিকিৎসা ক'রে রোগ সারাবে? ডাক্তারী ওর ভান, ডাক্তারী ও কিছুই জানে না, ওর মা কামাখ্যা থেকে কি-কি জানি শিখে

আসছে, তার জোরে রোগ সারে, এই রোগ সারাবার মজা পরে টের পাবা, অসুখ যাপ্য থাকে, পরে যখন ঠেলা দেবে তখন টের পাবা, তখন আর ওই জারিজুরিতে কূল পাবে না, আমাদের কাছেই দৌড়োন লাগবে। আর, রোগীর 'পর দরদ দেখাবার কথা যে বলছ, পেটে বিদ্যেবুদ্ধি না থাকলে একটা ভোল ধ'রে মানুষের মন ভোলান লাগবে তো, তাই অমনি খোশামোদি করে। ওর কথা ছাড়ান দাও তোমরা। লোকের মনে সন্দেহ হয়, ভাবে, সত্যিই কি তাই নাকি? কিন্তু যত দিন যায় তত দেখে, যারা সুস্থ হয়েছে আমার হাতে তারা তো সুস্থই আছে, যাপ্য অসুখ তো বেড়ে উঠছে না। এইরকম চলে, সব কথা আমার কানে আসে, কিন্তু আমি চুপ ক'রে থাকি, কারও বিরুদ্ধে একটা কথাও বলি না, বরং ভাল যার বিষয়ে যা' জানি তাই বলি এবং আমার যে তাদের কাছে অনেক শিখবার আছে, তাও বলি। এতে ওরা যেন কেমন হতবাক হ'য়ে থাকে—ভাবে, ডাক্তারবাবু খুব ভাল মানুষ, কিছু বোঝে না, আর শরীরে রাগও বড় কম। পরে একজন ডাক্তার এক গ্রামে মুসলমানদের সামনে আমার বিরুদ্ধে যা'-তাই বলছে, এমন সময় একটা লোক ক্ষিপ্ত হ'য়ে তাকে তাড়া করলো। সে বললো—তবে রে শালা! চক্কবর্ত্তী-মশার ছাওয়ালের খামাকা নিন্দা করা আমি দেখাচ্ছি তোকে। সে-ভদ্রলোক মানুষের ভাল ছাড়া মন্দ করে না, ভাল ছাড়া মন্দ কয় না, বিপদে-আপদে বুক দিয়ে আ'সে পড়ে, দাবীদাওয়ার ধার ধারে না, দরকার হ'লে গাঁটের পয়সা খরচ করে রোগীর জন্য, আর তাঁর নামে যত অকথা-কুকথা! তার সেই খাপ্পা মেজাজ দেখে সে আজও দৌড়, কালও দৌড়। (উপস্থিত সকলে হাসতে লাগলেন)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভদ্রলোকের ঐ অবস্থা হয়েছিল শুনে আমার কিন্তু ভাল লাগেনি। আমার এ-কথা বলার উদ্দেশ্য হ'লো এই যে, মানুষ যদি সহ্য, ধৈর্য্য নিয়ে চলে, প্রকৃতির তরফ থেকে যা' হবার তা' আপনি হয়। আমাকে মানুষ লাখ নিন্দা করুক, তা'তে আমি আদৌ বিচলিত হই না, কিন্তু আমার সামনে কেউ যদি অন্যের অযথা নিন্দাবাদ করে, তাকে কিন্তু আমি ছাড়ি না। আর, প্রায় সময়ই আমি মোকাবিলায় মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করি।.........লোক-নিন্দার ভয় যদি আমার থাকতো, তাহ'লে আমি যা' করছি এর কিছুই করতে পারতাম না। আজকাল লোকের ধারণা এমন বিকৃত হ'য়ে গেছে যে, প্রকৃত ধর্ম্মকে মনে করে অধর্ম্ম, এবং অধর্ম্ম যা' তাকে মনে করে ধর্ম্ম। আজকালকার পাকা ধার্ম্মিক লোক যারা, তারা আমাকে আর যাই বলুক আর না বলুক, অন্ততঃ ধার্ম্মিক বলবে না—এ কথা ঠিকই। আমি তাদের কাছে বড়-খেলাপ। ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর ঈষৎ হাসলেন। সকলে সঙ্গে-সঙ্গে মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার পাশ ফিরে বসলেন—ব'সে চন্দ্রনাথদার দিকে স্নেহল দৃষ্টিতে চেয়ে আব্দারের সুরে বললেন—লক্ষ্মী! আমার আরজি মনে আছে তো? আমি যা' চাইলাম ব্যবস্থা ক'রে দেবা তো?

চন্দ্রনাথদা—আমার যা' ছিল সব তো এখন বেহাতি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর জন্য কোন ভাবনা নেই। জান্ থাকলে টাকা-পয়সা গজিয়ে উঠবে। Well-adjusted character (সুনিয়ন্ত্রিত চরিত্র) থাকলে ঠেকায় কে?—মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে উঠবে সব। 'আমি কি ডরাই সখি! লম্পট রাবণে?' চরিত্র থাকলে মানুষ মন করলে out of nothing (কিছু-নার ভিতর-দিয়ে) যেমন অনেক কিছু create (সৃষ্টি) করতে পারে, তেমনি অন্যকেও তার বিত্তসম্পদ্ ইষ্টার্থে উৎসর্গ করতে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলতে পারে। মনে রেখো—ইষ্ট মানে মূর্ত্ত কল্যাণ। আমি যা' বললাম—আর দেরী ক'রো না, দেরী করার সময় নেই।..............আমার scheme (পরিকল্পনা) কেবল scheme (পরিকল্পনা)-ই থেকে যাবে, তোমরা যদি work out (বাস্তবায়িত) না কর।

চন্দ্রনাথদা—আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর (উল্লাস উদ্দীপনার সঙ্গে)—কিছু না, আমি যা' বলি ক'রে ফেল, তারপর দেখ—কী হয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর গাত্রোত্থান করলেন।

১৪ই চৈত্র, শনিবার, ১৩৪৮ (ইং ২৮।৩।৪২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে নিভৃত-নিবাসে বিছানায় ব'সে আছেন। দক্ষিণ দিকে দূর আকাশের দিকে চেয়ে-চেয়ে বলছেন—সব ঠাঁই মোর ঘর আছে এ-কথা বোধ হয় ঠিকই। আর, সেটা শুধু পৃথিবীর বুকে নয়। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের গ্রহে-গ্রহে, তারায়-তারায়, ছায়াপথের স্তরে-স্তরে আমাদের ঘর আছে। সাধক আপন অনুভূতিতে এটা টের পায়। নিজের ভিতরে এগুলি আছে, শুধু এমনতর বোধ হয় না, বাস্তবে এইসব জিনিস আছে, এইসব জায়গা আছে, আর তাতে যেন আমরা উন্নীত হয়েছি, স্থাপিত হয়েছি ও বিচরণ করছি এমনতর বোধ করা যায়। ভাণ্ডের মধ্যে যে ব্রহ্মাণ্ডকে বোধ করা যায়, তার অস্তিত্ব শুদ্ধ ভাণ্ডেই নয়। তারও একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। তার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্থূলভাবেও যোগাযোগ করা চলে।

প্রফুল্ল—কি রকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, জলের মধ্যে ক্ষুদ্র অনেক জীবাণু আছে। জলের ভাণ্ডের মধ্যে যে জীবাণুর ব্রহ্মাণ্ড আছে তা' তুমি বোধ করতে পার, যদি সাধনা অর্থাৎ নিয়মিত অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে তোমার চক্ষুকে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ক'রে তুলতে পার, কিংবা তা' যদি না-ও পার, তুমি যদি একটা ভাল মাইক্রোস্কোপ জোগাড় করতে পার, তার সাহায্যে তুমি অনায়াসেই তা' দেখতে পার। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রগুলিকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও অনন্যসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ক'রে তোলা যায়। তার

ভিতর-দিয়ে আমাদের জগৎটা বিশাল বিস্তারে বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠতে পারে। মানুষ জানে আর কতটুকু, অজানার মধ্যেই তো সে হাবুডুবু খাচ্ছে! মানুষের কল্পনাশক্তিই বা কতটুকু। আমার মনে হয়, মানুষের যা'-কিছু সার্থক, সুসঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত কল্পনা, তাকেই বাস্তবায়িত ক'রে তোলা যায়, যদি তার পিছনে লেগে প'ড়ে থাকা যায়। সবটা যে একদিনে হবে তা' নয়, ধারাবাহিক চেষ্টায় একদিন-না-একদিন তা' সফল হয়ই। কোন-কোনটা সফল করতে লক্ষ-লক্ষ বৎসরের তপস্যা লাগে। বিবর্ত্তনের বর্ত্তমান স্তরে আজ যা' নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিক হ'য়ে আছে আমাদের কাছে, যা' আমাদের কোন প্রশ্ন বা বিস্ময়ই জাগায় না, একদিন হয়তো তা' মানুষের স্বপ্ন ও কল্পনারও অগোচর ছিল। তেমনি লক্ষ বৎসর পরে যা' স্বাভাবিক হ'য়ে উঠবে, আজ হয়তো তা' আমাদের স্বপ্ন ও কল্পনারও অগোচর। কিন্তু এই অসম্ভবটা সম্ভব হবে মানুষের সুসঙ্গত কল্পনা ও তা' বাস্তবীকরণের বিহিত প্রচেষ্টার ভিতর-দিয়েই। আজকাল সাহিত্য, কলা, শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদির প্রত্যেকটি বিভাগে অসাধারণ উন্নতি হ'চ্ছে, কিন্তু প্রচেষ্টাগুলি চলেছে যেন বিচ্ছিন্নভাবে, একটার সঙ্গে আর-একটার যোগসূত্র আবিষ্কার করা হ'চ্ছে না, তা'ছাড়া জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের গন্তব্যও যেন ঠিক নেই। আমার ইচ্ছা করে এমনতর একটা University (বিশ্ববিদ্যালয়) সৃষ্টি করতে, যেখানে মানুষ বাঁচা-বাড়া-সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞান সংগ্রহ করবে এবং প্রত্যেকটি বিভাগ প্রত্যেকটি বিভাগের সহায়ক ও পরিপূরক হ'য়ে একনিয়ামকতায় অভ্যুদয়ের পথে অগ্রসর হবে। এই একনিয়ামকতার মূলে চাই সামগ্রিক দৃষ্টি-সম্পন্ন একজন মানুষ, যাকে বলে ঋষি। তিনিই পারেন সবটাকে সুসঙ্গত ক'রে একমুখী ক'রে তুলতে। প্রত্যেকটি দেশে-দেশে ও জগতে যে আজ এত অসামঞ্জস্য, তার কারণ, দেশগুলির শিক্ষা ও শাসনব্যবস্থার পিছনে ঋষির পরিচালনা নেই। আমার যে শিক্ষার পরিকল্পনা আছে তাকে যদি রূপ দিতে পারি, সেই আওতায় প'ড়ে শুভ সংস্কারসম্পন্ন যারা তাদের ঋষিকল্প মানুষ হ'য়ে ওঠা অসম্ভব নয়। তাদের যদি বিয়ে-থাওয়া ঠিকমতো হয় ও তাদের ছেলেপেলেদের দীক্ষা, শিক্ষা ও বিয়ে যদি যথাযথভাবে হয়, তাহ'লে হয়তো দু'তিন পুরুষের মধ্যেই এমন কতকগুলি মানুষ সৃষ্টি হ'য়ে যাবে, যারা নিজেদের মস্তিষ্ক ও চরিত্র দিয়ে নিজেদের দেশ তো ঠিক করতে পারবেই, তা'ছাড়া পৃথিবীর মাথা-মাথা লোক-গুলির মাথা ঠিক ক'রে দিতে পারবে। আর, তোমরা যদি দাঁড়াতে পার, দেখবে, পৃথিবীর কত দেশের ছাত্র আসবে তোমাদের কাছে শিখতে।

প্রফুল্ল আপনি এই University (বিশ্ববিদ্যালয়) গঠন-সম্বন্ধে তো বেশী কিছু বলেন না। বেশীর ভাগ সময় তো ঋত্বিক্-আন্দোলন সম্বন্ধেই বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আমার University (বিশ্ববিদ্যালয়)-এর মূলে লক্ষ্য হ'লো

মানুষকে ষোল আনা মানুষ ক'রে তোলা। যতরকম সদ্‌গুণ ও সদভ্যাস একজনের মধ্যে বিকশিত ক'রে তোলা যায়, তা' ক'রে তুলে তার অবগুণ ও বদভ্যাসের নিরসন করা, তাকে ইষ্টৈকপ্রাণ দক্ষ চৌকস ক'রে তোলা, এক-একটা দিক্‌পাল ক'রে ছেড়ে দেওয়া, এক-একজনকে বহুর ধারক, পালক, শিক্ষক ও নিয়ন্তা ক'রে তোলা। সে-চেষ্টার আমার বিরাম নেই। আমার University (বিশ্ববিদ্যালয়) আমার মতো ক'রে আমি চালাচ্ছিই।...........আমি বড় হব, আমাকে মানুষ বড় কবে—সে-কল্পনা আমার কোনদিন নেই। ওই ধারণায় আমি ব্যক্তিগতভাবে কোন সুখ পাই না, তবে হ্যাঁ! মা'র কাছে মানুষে সুখ্যাতি করলে মা সুখী হবেন, মা আমাকে বাহাদুর ছেলে ব'লে বাহবা দেবেন, সে-লোভ আমার ছিল। লোভ থাকলে কী হবে, মা যেন কিছুতেই আমার উপর প্রসন্ন হ'তেন না। আমি যেন অপরাধ ক'রেই আছি তাঁর কাছে। কিন্তু তবু আমি হাল ছাড়তাম না, নাছোড়বান্দা হ'য়ে লেগে থাকতাম মাকে খুশি করবই। মা'র হয়তো আমাকে না হ'লে চলতে পারতো, আমার কিন্তু মা ছাড়া চলারই উপায় ছিল না। তাই মা'র খুশির ধান্ধায় ঘুরতেই হ'তো আমাকে।

সরোজিনীমা—আপনার অভিমান হ'তো না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অভিমান করার উপায় থাকলে তো অভিমান করব? যাকে বাদ দিয়ে মানুষের চলে না, তার উপর কি অভিমান করা চলে? বাতাসের উপর কি তুমি অভিমান করতে পার?

হরিপদদা (সাহা)—আপনি আর কী যেন বলতে চাচ্ছিলেন, সেটা চাপা প'ড়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বলছিলাম, আমার নিজের বড় হওয়ার সখ কোনদিন নেই, কিন্তু তোমাদের বড় ক'রে তোলার সখ আমার খুব। লোকের মুখে তোমাদের কারও সুখ্যাতি যখন আমি শুনি, আমার বুকখানা আনন্দে ফুলে ওঠে। মনে হয়, আরো বলুক, আরো শুনি। সুখ্যাতি শুনতেই আমার ভাল লাগে। বৌ, শ্বশুর, শাশুড়ি, জা-জাওয়ালী, ভাসুর, দেবর, ননদ ও স্বামীর সুখ্যাতি করে, শাশুড়ি ছেলে-বৌয়ের সুখ্যাতি করে, সতীন সতীনের সুখ্যাতি করে, ঋত্বিক্ অন্য ঋত্বিক্ ও সহকর্ম্মীদের সুখ্যাতি করে এ শুনতে আমার খুব ভাল লাগে। কিন্তু সে-কপাল আমি ক'রে আসিনি। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একজনের বিরুদ্ধে আর-একজনের নিন্দা ও অভিযোগই আমাকে শুনতে হয়! অনেকে খোলাখুলি নিন্দা বা অভিযোগ করে না, কিন্তু কথার মধ্যে তার ঢেকুর থাকে। মানুষের ভিতর দ্বেষ, হিংসা, দোষ-দর্শন বা হীনম্মন্যতা যাই থাক না কেন, কথার ভিতর-দিয়ে তা' জানান দিয়ে দেয়। আবার, প্রীতি থাকলে তাও টের পাওয়া যায়। প্রীতিবান মানুষের বুদ্ধি থাকে মানুষকে প্রীত ক'রে প্রীত হওয়ার। তারা যেখানে থাকে নিজেদের ব্যক্তিত্ব অটুট রেখেও একটা আনন্দের আবহাওয়া চারিয়ে

দেয়। তাদের চাউনি, কথাবার্ত্তা, ব্যবহার, আদর, আপ্যায়ন, সম্বর্দ্ধনা মানুষের সত্তাকে স্বতঃই সোহাগ-নন্দিত ক'রে তোলে। পরস্পরের অন্তরে একটা ঝিরঝিরে দখিনা হাওয়ার মতো বইতে থাকে। অজানিতে পরস্পর পরস্পরের নিকট এগিয়ে আসে। এমনি ক'রে আপ্‌সে-আপ্‌ আত্মীয়তার সূত্র গ'ড়ে ওঠে। যাজন যারা করবে তাদের মধ্যে এই প্রীতি জিনিসটি থাকা চাই! নচেৎ মানুষকে আকৃষ্ট করা যায় না। এই প্রীতির মূল নিবদ্ধ থাকা চাই ইষ্টে, সেই সুনিষ্ঠ প্রীতি থাকলে মানুষ যখন মানুষের কাছে ইষ্টের কথা বলে, তখনও তার মধ্যে একটি রসাল নেশার মতো থাকে, উপদেশ দিচ্ছে বা নীতিকথা বলছে এমনতর ভাব থাকে না। এতে সেও উপভোগ করে, অন্যেও উপভোগ করে। ইষ্টে প্রীতি, ইষ্টকথায়, ইষ্টকাজে প্রীতি, ইষ্ট-প্রীত্যর্থে অন্যের প্রতি প্রীতি—যাজক-চরিত্রে এই রকমটা থাকা চাই। ইষ্টকথা মানে, সবারই জীবনীয় কথা, অস্তি-বৃদ্ধির কথা, যা' অন্বিত অর্থনায় ইষ্টে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। আর, প্রীতি-প্রণোদিত না হ'লে সবটাই কসরত মনে হয়, মানুষ নিজেও সুখ পায় না, অন্যকেও সুখ দিতে পারে না। University (বিশ্ববিদ্যালয়)-ই কও আর যাই কও, সবটার জন্মভূমিই ঐ কেন্দ্রায়ণী প্রীতি। আর, আমরা বুঝি বা নাই বুঝি, এ-কথা খুবই ঠিক যে, পরিবেশকে বাদ দিয়ে আমরা বাঁচতে পারি না। বৃহত্তর পরিবেশকে আমরা যদি ঠিক না করি, তাহ'লে আমরা নিজেরাই বাঁচতে পারব না। চারিদিকে যদি আগুন লেগে যায়, তবে আমার খড়ের চালাটিও পুড়ে যাবে। ছোটখাট ২।৪টে প্রতিষ্ঠান ক'রে জাতকে বাঁচাতে পারা যাবে না, যদি জাতের মধ্যে কৃষ্টিচেতনা, ধর্ম্মচেতনা ও সংহতি না আসে। তাই, আমি ধর্ম্মার্থে লোকসংগ্রহের কথা বলি। এই মূল কাজ বাদ দিয়ে টুকরো-টুকরো ভাবে যত সৎ-প্রচেষ্টাই হো'ক না কেন, তা' নিষ্ফল হ'য়ে যাবে। আমাদের দেশে প্রতিভাবান লোকের অভাব নেই, সৎলোকের অভাব নেই, ধনী-লোকের অভাব নেই, কর্ম্মী-লোকেরও অভাব নেই, কিন্তু এদের মিলিত প্রচেষ্টার অভাব আছে। সেই মিলন-ভিত্তিভূমি রচনা করতে হবে তোমাদের। যদি বাঁচতে চাও, বাঁচাতে চাও, তাড়াতাড়ি এটা করাই চাই।

প্রফুল্ল— কংগ্রেসও তো স্বাধীনতা-সংগ্রামে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেষ্টা করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐক্যবদ্ধ যদি করতে হয় তবে এমন একজন ব্যক্তি চাই, যার দ্বারা মানুষ ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী সর্ব্বতোভাবে পরিপূরিত হ'তে পারে। তিনিই হ'লেন ঐক্যের দাঁড়া বা আদর্শ। তাঁর প্রতি ভালবাসাই হবে মূল প্রেরণা। ঘৃণা, বিদ্বেষ, হীনম্মন্যতা, ক্ষমতা-লিপ্সা, নেতৃত্বের স্পৃহা ইত্যাদি কোন প্রতিক্রিয়ামূলক প্রচেষ্টা থেকে যদি আমরা মিলিত হ'তে যাই, সে মিলন কিন্তু হবে ক্ষণিক, তা'তে প্রবৃত্তির স্বার্থ থাকবে,

কিন্তু সত্তার স্বার্থ থাকবে না, তাই তা' ধ্বংসে যাবে। ধৰ্ম্ম হ'লো একমাত্র জিনিস যার সঙ্গে মানুষের জীবন ইহ-পরকালের জন্য সর্ব্বতোভাবে গাঁথা। নচেৎ চা'লের প্রয়োজনে মিলন, ডা'লের প্রয়োজনে মিলন, চা খাওয়ার প্রয়োজনে মিলন, কেরোসিন তেলের প্রয়োজনে মিলন, একজনকে জব্দ করার প্রয়োজনে মিলন, শত্রুতাসাধনের প্রয়োজনে মিলন, প্রবৃত্তি-চরিতার্থতার প্রয়োজনে মিলন—এ সবের দৌড় কতদূর তা' তো দেখলেই বুঝতে পার। স্বার্থে এতটুকু লাগলেই, লেজে একটু পা পড়লেই এই মিলনের স্বরূপ বোঝা যায়। সেইজন্য দেখ না, আজ যাদের সঙ্গে গলায়-গলায় ভাব কাল তাদের মধ্যে মুখ-দেখাদেখি নেই। আবার, একটা পারিবারিক জীবনের কথাই ধর। বাবা হয়তো স্নেহপরায়ণ অথচ দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক, আর ছেলে হয়তো অবুঝ, উচ্ছৃঙ্খল ও বেয়াড়া। ছেলে ক্রমাগত নানা অন্যায় আব্দার করে, কিন্তু বাবার তাকে শাসন করবার, নিয়ন্ত্রিত করবার বা প্রতিনিবৃত্ত করবার ক্ষমতা নেই, অথচ ছেলের কাছে ভালমানুষ সাজার লোভ আছে, সেই লোভে কিংবা হাঙ্গামা এড়াবার দায়ে সে যদি ক্রমাগত ছেলের অন্যায় আব্দার পূরণ ক'রে চলে, তাহ'লে কি তা' পরিণামে বাপ-ছাওয়াল কারও পক্ষে সুবিধাজনক হয়?—না, বাপ-ছাওয়ালের এই মিলের কোন দাম আছে? সত্যিকার মিল হ'তে পারে মানুষের সঙ্গে মানুষের ধর্ম্মের ভিত্তিতে, সত্তার ভিত্তিতে, আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে, বৈশিষ্ট্য-পূরণের ভিত্তিতে। তা'ছাড়া ধামাচাপা-দেওয়া মিলের কোন মানে হয় না, তা' অনেক সময় প্রাণের উপর দিয়ে ওঠে। তাই, ভাল যে যতটুকু করে তাই-ই ভাল, কিন্তু তোমাদের যা' করতে বলছি, তা' কিন্তু করা চাই-ই। বাঁচতে গেলে, টিকে থাকতে গেলে উপযুক্ত মূল্য দিয়েই তা' করতে হবে। সে মূল্য অনেক দিন আমরা দিইনি। ধর্ম্মের জন্য, ইষ্টের জন্য, কৃষ্টির জন্য, সৎ-সংহতির জন্য যা' করণীয়, তা' অনেকদিন আমরা করিনি। এখনও যদি তার প্রায়শ্চিত্ত না করি, বিধিরোষ এমন ক'রে নেমে আসবে আমাদের উপর যে চোখেমুখে আর পথ দেখতে পাব না। তাইতো আমি দীক্ষার কথা অতো ক'রে বলি। মানুষগুলিকে যদি ধর্ম্মের ভিত্তিতে একগাট্টা ক'রে তুলতে পার, তখন তার উপর দাঁড়িয়ে অনেক কিছুই করতে পারবে। ধর্ম্মের ভিত্তিতে মানে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সত্তার ধারণ-পালনী ভিত্তিতে।

হরিপদদা এইবার শ্রীশ্রীঠাকুরকে তামাক সেজে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে হরিপদদাকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন—তোর শরীরটা অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

হরিপদদা—আমার পেটের pain (ব্যথা)-টা বেড়েছে, মাঝে-মাঝে মনে হয় যেন আর পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারি না, পারি না ক'রেও যা' পারছিস সে এক miracle (অলৌকিক) ব্যাপার। আমি তো তোর মতো অবস্থা হ'লে বিছানা থেকে

উঠতে পারতাম না। তুই তো এর মধ্যে সমানে চালায়ে যাচ্ছিস, কোন কাজ বাদ দিচ্ছিস না। (সরোজিনীমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন)—চেংঠের ক্ষ্যামতা আছে, এই নিয়ে আবার কত জল তোলে। (সরোজিনীমাও নীরবে হাসছেন।)

শ্রীশ্রীঠাকুর (মাথা ঝাঁকিয়ে)—ইঁ! তুই লক্ষ্য ক'রে দেখিস, ওর শরীর যত খারাপই থাক, আমার কাজের বেলায় পারতপক্ষে না কয় না। তা' করতে ওর কষ্ট হয়, কিন্তু ঐ কষ্টই ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

সরোজিনীমা—আমি ভাবি, ভগবানও মানুষের কষ্ট ঘোচাতে পারেন না কেন? বা পারলেও ঘোচান না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এরজন্য ভগবানকে লাগবে কেন? মানুষ নিজেই যদি দুঃখ থেকে ত্রাণ পেতে চায়, তাহ'লেই তো পেতে পারে। ভগবান এমন কোন বিধান করেননি যার জন্য মানুষের দুঃখ পাওয়া প্রয়োজন। মানুষ সে-প্রয়োজন সৃষ্টি করে অনেকখানি চেষ্টা ক'রে অর্থাৎ বিপথে চ'লে। দুঃখ যখন আসে তখন যদি তা' থেকে ত্রাণ পেতে চায় এবং তার ইচ্ছাটা যদি আন্তরিক হয়, তাহ'লে সে-পথও তার খোলা। কিন্তু ভগবানের রাজ্যে একটা বিধান এই যে, মানুষ করার ভিতর-দিয়ে যা' চায়, ভগবান তা' মঞ্জুর করেন। সেইজন্য করার ভিতর-দিয়ে যদি কেউ দুঃখ অর্জ্জন ক'রে থাকে, তা' তিনি নাকোচ ক'রে দিতে পারেন না। উল্টো রকমের করার ভিতর-দিয়েই তা' নিরসন করতে হবে তাকে। করা ছাড়া শুধু বলা বা ভাবাকে তিনি আমল দেন না। তুমি যে দুঃখ চাও না, আচরণের ভিতর-দিয়ে তার পরিচয় দিতে হবে তোমাকে। তবে সব সত্ত্বেও জীবের প্রতি তাঁর অশেষ দয়া। তাই, পৃথিবী টিকে আছে, টিকে থাকে। মানুষ ভগবানের প্রতি উন্মুখ হ'লে তার সুবিধা হয় এইটুকু যে, সে তখন যেন এক উন্মাদনার মধ্যে থাকে, সাধারণ দুঃখকষ্ট তাকে অতোখানি অভিভূত করতে পারে না, আনন্দের বোধ তার এতখানিই থাকে যে, দুঃখ যেন তাকে পেয়ে বসতে পারে না। তা'ছাড়া সবসময় ভগবৎসেবার বুদ্ধি থাকে ব'লে, দুঃখ-কষ্ট ও দুরবস্থাকেও তাঁর সেবায় লাগিয়ে দেয়। তাই, সে ঘায়েল হ'য়ে পড়ে না। মন্দের ভিতর-দিয়ে যতখানি ভাল আদায় করা যায়, তাই সে করে, বিষকেও সে অমৃতে পর্য্যবসিত ক'রে তোলে। ভক্তি বড় জবর মাল, তা' মানুষকে বুদ্ধি জোগায়, শক্তি জোগায় অসাধারণ। আর, দুঃখমাত্রই খারাপ নয়, এক দুঃখ হ'লো প্রবৃত্তিকর্ম্মের জন্য, আর এক দুঃখ হ'লো তপস্যাকল্পে। তপস্যার জন্য যে দুঃখ, যা' কিনা মানুষের শ্রীবৃদ্ধির কারণ, সেটা থেকে যদি তুমি মানুষকে সহানুভূতি-পরবশ হ'য়ে রেহাই দিতে চাও, তাহ'লে তো তার উন্নতিই খতম হ'য়ে যাবে। ধর, পাশ করার জন্য খোকার অনেক খেটে পড়া লাগবে, এই খাটুনির একটা কষ্ট আছে। তুমি যদি ভাব, বাছার আমার এত কষ্ট কি সয়, অতো প'ড়ে কাজ নেই, তা'তে যা' হয় হবে, তাহ'লে তো ও মুখ্যু হ'য়ে থাকবে। উন্নতিলাভ করতে গেলেই

তার জন্য কঠোর তপস্যা চাই, আমার ইচ্ছে করে, প্রত্যেকটা মানুষ দুরন্ত তপস্যার উপর থাক্, এতে মানুষের যত কষ্টই হোক, শরীর যদি ঠিক থাকে তবে দেখে আমার আরামই লাগে। কষ্ট করার অভ্যাস আমাদের ক'মে গেছে, আমরা আয়েসী হ'য়ে গিছি, এই জড়তা কাটাবার জন্য মানুষকে অনেকখানি চাপের উপর রাখা প্রয়োজন। তখন কষ্ট করাটাই মানুষ সুখের মনে করবে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে উঠে আশ্রম-প্রাঙ্গণে বাবলাতলায় এসে বসলেন।

রেণুমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—বড় বৌয়ের কি খবর?

রেণুমা বাড়ীর ভিতর থেকে খবর নিয়ে এসে বললেন—রান্নাবাড়ার জোগাড় ক'রে দিয়ে এখন একখানা বই পড়ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড় বৌয়ের পড়াশুনোর অভ্যাস আছে খুব। ফাঁক পেলেই পড়ে।.........তা' রান্নার যোগাড় কী করিছে?

রেণুমা—সে তো শুনিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' শুনিবির হয়। করায়ও ফাঁক রাখবি না, জানায়ও ফাঁক রাখবি না, শোনায়ও ফাঁক রাখবি না, বলায়ও ফাঁক রাখবি না। যে-ব্যাপারে যখন যতটুকু করবার তা' একেবারে পুরোপুরি করবি। তাহ'লে দেখবি—ঘরগেরস্থালীর মধ্যে থেকেও কতখানি জ্ঞান হবে, অভিজ্ঞতা হবে, জীবনের কতখানি সম্পদ্ হবে। মনেও একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করবি। নিজের কোন দোষ-ত্রুটিকেই খাতির করবি না। যখন যেটা ধরা পড়বে, তখনই সেটাকে তুলে ফেলবি, মানুষ যেমন ক'রে আঁচিল তোলে তেমনি ক'রে। কিছু না—অল্পদিন করতে-করতে একটা কায়দা পেয়ে যাবি। দেখিস, এতে কতখানি বল পাবি, আরাম পাবি। এক-একটা দোষ, দুর্ব্বলতা ও অপারগতাকে অতিক্রম করার ভিতর-দিয়ে যে সুখ পাবি, তার তুলনা হয় না। একটা রাজ্যজয়েও মানুষের অতো আনন্দ হয় না। তোরা আমার কাছে যারা থাকিস—তারা যদি সজাগ হোস, হুঁশিয়ার হোস, ইঙ্গিত বুঝে চলিস, তাহ'লে আমার অনেকখানি সুবিধা হয়, আর তোদের দেখে আবার অনেকে শেখে। নিছক আমার নিজের গরজে আমি কাউকে কোন কাজের কথা বড় একটা বলি না, আমার একটা খেয়াল থাকে, যাকে বলছি তার কতখানি সুবিধা ক'রে দেওয়া যায়, তাকে কতখানি এগিয়ে দেওয়া যায় এর ভিতর-দিয়ে। সেই কল্পনা যখন আমার ভেস্তে যায়, তখন আমার মনটা খিঁচড়ে যায়। আমি হয়তো একজনকে দশটা টাকা সংগ্রহ ক'রে আনতে বললাম, সে যদি সংগ্রহ না ক'রে ধার ক'রে এনে দেয়, তা'তে কিন্তু আমার তৃপ্তি হয় না। কারণ, সংগ্রহ করার ভিতর-দিয়ে তার যে লাভ হ'তো, সে লাভ আর হ'লো না। তাই, আমার ইচ্ছা আর পূরণ হ'লো না। আবার কোন ক্ষেত্রে হয়তো চাই, সে নিজের থেকেই দিক। তার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে যদি অর্থের প্রতি আসক্তির

দরুন নিজের থেকে না দিয়ে, ভিক্ষা ক'রে দেয়, তা'তেও আমার মন ওঠে না। কারণ, এই দেওয়ার ভিতর-দিয়ে money complex-এর (অর্থাসক্তির) নিরসন হ'য়ে তার যে উপকার হবে প্রত্যাশা করছিলাম তা' আর হ'লো না।

ইতিমধ্যেই অনেকে এসে জড় হয়েছেন, সবাই স্তম্ভিতের মতো শুনতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শেষ হ'লে রেণুমা বললেন—আমি গিয়ে শুনে আসি গিয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' যাও।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ইয়াদালীর সঙ্গে গল্প-গুজব করতে লাগলেন। ইয়াদালী এবং গ্রামের আরো কয়েকজন মুসলমান—কে কেমন মিষ্টি খেতে পারে সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোদের সব কয়জনকে একত্তর পালি, আমি একদিন সামনে ব'সে খাওয়ায়ে দেখতাম।

ইয়াদালি (হাসতে-হাসতে) সে হবিনি একদিন। উয়ের জন্যি ভাবনা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোদের সুবিধামতো একদিন আসিস।

ইয়াদালী—আচ্ছা।

১৫ই চৈত্র, রবিবার, ১৩৪৮ (ইং ২৯।৩।৪২)

কয়েকদিন পরেই ষোড়শ ঋত্বিক্-অধিবেশন। শ্রীশ্রীঠাকুর খেপুদা (চক্রবর্ত্তী), কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), বঙ্কিমদা (রায়), অনিলদা (গঙ্গোপাধ্যায়), যোগেশদা (চক্রবর্ত্তী), যতীনদা (দাস), শরৎদা (হালদার) প্রভৃতির সঙ্গে বার-বার আলোচনা করছেন—এই অধিবেশনে কী-কী বিষয় ভাল ক'রে চারাতে হবে। বাইরে থেকে কর্ম্মী যাঁরা আসছেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের কাছেও বার-বার ঐ একই কথা বলছেন। আলাপে-আলোচনায় শ্রীশ্রীঠাকুর সর্ব্বক্ষণ সবার মধ্যে এক নবীন উন্মাদনা ও তীব্র সঙ্কল্প জাগিয়ে তুলছেন। ঘুরে-ফিরে ঐ এককথায় ফিরে আসছেন। কথা কইতে-কইতে কখনও আপন মনে গান ধ'রে দিচ্ছেন, কত রসাল গল্প করছেন, আবার কখনও বার্ম্মার যুদ্ধকালীন অবস্থা বর্ণনা ক'রে ভীতির চিত্র এঁকে তুলছেন, পরক্ষণেই আবার নিরাকরণী বিধান দিয়ে আশা-ভরসায় উদ্দীপ্ত ক'রে তুলছেন সকলকে। কর্ম্মিবৃন্দও মাতোয়ারা, মসগুল হ'য়ে উঠছেন এবং তাঁর নির্দ্দেশ কেমনভাবে মূর্ত্ত ক'রে তোলা যায়, সে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ক'রে বাস্তব কর্ম্ম-পরিকল্পনা রচনা করছেন। আশ্রমে যেন এক নূতন জীবনের জোয়ার ব'য়ে চলেছে। যেখানে যাওয়া যায় ঐ কথা, ঐ ধ্যান, ঐ জ্ঞান, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এই চলেছে। আজ আবার বঙ্কিমদা, শরৎদা, প্রফুল্ল প্রভৃতি সকালে নিভৃত-নিবাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে

মিলিত হয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—আমার হইছে নেশাখোরের মতো অবস্থা। নেশাখোর যেমন নেশাখোরের সঙ্গ খোঁজে, অন্য সঙ্গ তার ভাল লাগে না, আমারও তেমনি আপনাদের পালি মনে হয়, খোয়াড়ি ভাঙ্গি, আড্ডা মারি, গল্প করি, কাজকামের ফন্দি ঠিক করি। আমার মাথায় যেমন ক'রে পেয়ে বসে, তেমনি ক'রে আপনাদের যদি পেয়ে বসে, তাহ'লে দেখতে পাবেন, কাজ না ক'রে আর রেহাই নেই। যদি শক্ত মনে করেন তাহ'লেই শক্ত, না হ'লে শক্ত কিছু নেই দুনিয়ায়। মনটাকে তাই মাতাল ক'রে তোলা লাগে। মন যদি কয় করবুই, তাহ'লে তাকে আর রোখে কে? নিজেদের ঐরকম positive mood (ইতিবাচক মনোভাব) আসলে যেখানে যাবেন, তাদের মধ্যেও ঐ positive mood (ইতিবাচক মনোভাব) এসে যাবে। কোন কাজ করতে গিয়ে তাই anti (বিরুদ্ধ) ভাবের প্রশ্রয় দিতে নেই।

শরৎদা—বাস্তব অবস্থা যা' তা'ও তো বিচার করতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-বিচারও করতে হবে কার্য্যসিদ্ধির অনুকূল ক'রে। অন্তরায় যদি কিছু থাকে, তা' অতিক্রম করা যায় কিভাবে, তাই-ই দেখতে হবে। ভগবান মানুষকে কোথাও ইতি ক'রে দেননি। করলে ফল পাওয়া যাবেই, এ ব্যবস্থা তিনি ক'রেই রেখেছেন। যাদের আগে করাটা কম আছে, এখন তাদের করতে হবে বেশী। এই করাটা খুলে দেওয়ার জন্য আপনাদের উপযুক্ত drive (সম্বেগ) দেওয়া চাই। আর, সে drive (সম্বেগ) দিতে গেলে নিজেদের অনেকখানি করা চাই। নচেৎ আমার কথাগুলি যদি শুধু তোতাপাখীর মতো আউড়ে যান, তা'তে কিন্তু মানুষের জড়তা ভাঙ্গবে না, সে কাজের প্রেরণা পাবে না তা' থেকে। তাই আমি motor-sensory co-ordination-এর (বোধগ্রাহী এবং কর্ম্মপ্রবোধী স্নায়ুর সঙ্গতির) উপর অতো জোর দিই। যে-মানুষ ভাবে, করে না, তার চরিত্রে সঞ্চালনী শক্তির সৃষ্টি হয় না। করা বড় জবর মাল দুনিয়ায়। বিধিমাফিক করার কাছে কুর্ণিশ করে সবাই। রোগ যেমন জীবনকে খেয়ে ফেলতে পারে, উপযুক্ত চিকিৎসা আবার তেমনি রোগকে খেয়ে ফেল'তে পারে। চিকিৎসক যখন রোগ চিকিৎসা করে, তখন রোগকে বাস্তব ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েও তাকে নিকেশ ক'রে ফেলে। আপনারাও তাই করবেন।

শরৎদা—আপনি যা' যে-সময়ের মধ্যে করতে বলেন, সবসময় হিসাবের মধ্যে পাই না, তা' কি ক'রে আমাদের ও সৎসঙ্গী ভাইদের দিয়ে সম্ভব? আমরা যেখানে আছি আর আপনি যে স্তরে উঠতে বলেন, তার মধ্যে যেন আকাশ-পাতাল ব্যবধান, তাই কাজ করতে গিয়েও মাঝে-মাঝে negative (নেতিবাচক) ভাব উঁকি-ঝুঁকি মারে। বুঝি, নিজেরই খাঁকতি, তাই পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খাঁকতি আর কোথাও নেই, খাঁকতি আছে স্বীকারে অর্থাৎ আপনার ক'রে নেওয়ায়। আমার ইচ্ছাটাকে যদি আপনার ইচ্ছা ক'রে নেন, ঐ

যদি আপনার একমাত্র ইচ্ছা, চাহিদা ও বিলাস হয়, তাহ'লে দেখবেন, কেমন ক'রে কী হবে তা' ঠাহরই পাবেন না। নিজেকে খালি ক'রে দেন, না হ'লে ভগবান আপনাকে ভ'রে দেবেন কি ক'রে?

শরৎদা—আমাদের যে নিজেদের স্বতন্ত্র স্বার্থ-ইচ্ছা ও চাহিদার ধান্ধা থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' যতখানি থাকে, পরমপিতার কাজে ততখানি বাধা পড়ে। প্রবৃত্তি অতোখানি গিলে ফেলে। চোখের সামনেটা যদি একটা আঙ্গুল ধ'রে আটকে দেন (দুই চক্ষের সামনে দুটো আঙ্গুল ধ'রে দেখালেন) তাহ'লে সম্মুখের বিরাট দৃশ্যটা আপনার কাছে মুছে যায়, অতোখানি থেকে আপনি বঞ্চিত হন। আত্মস্বার্থের ধান্ধা মানুষকে অমনতর সংকীর্ণ ক'রে তোলে। মনে করুন, এই আমার জন্য যদি মা, বাবা, ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি, সুখস্বার্থ, সাধ-আহ্লাদ সব উপেক্ষা করতে না পারেন, নিজের প্রাণের থেকেও যদি আমাকে প্রিয়তর ব'লে বোধ না করেন, আপনার সবকিছুই যদি আমার জন্য না হয়, এবং যে-প্রবৃত্তি বা যে-আকর্ষণ আমার কাজের অন্তরায়, তাকে যদি মুহূর্ত্তেই নির্ম্মমভাবে পরিহার করতে না পারেন, তবে বুঝবেন, আমি আপনার কাছে primary (প্রথম) নই। আর, যে আপনার জীবনে primary (প্রথম) নয়, তাকে অন্যের জীবনে primary (প্রথম) ক'রে তোলবার প্রবোধনা জোগাতে পারবেন না আপনি। তাই, রামকৃষ্ণ ঠাকুর ঈশ্বরকোটি পুরুষের কথা বলতেন।

শরৎদা—ঈশ্বরকোটি পুরুষের লক্ষণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক কথায় ইষ্টই তার কাছে first and foremost (প্রথম ও প্রধান), ইষ্টের জন্য সে যা'-কিছু হাসিমুখে sacrifice (ত্যাগ) করতে পারে এবং ইষ্টসঙ্গ ও সান্নিধ্য-লালসা, ইষ্টসেবা, ইষ্টচিন্তা, ইষ্টকর্ম্ম ও ইষ্টকথায় অচ্যুত ব্যাপৃতিই তার একমাত্র উপভোগের বিষয়, তা' সে ইষ্ট-সান্নিধ্যেই থাক বা দূরেই থাক।

শ্রীশ্রীঠাকুর বঙ্কিমদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—অফিসের রেকর্ড দেখে যে-সব নামগুলি বাছার কথা তোকে কইছিলাম, তা' ঠিক ক'রে রাখিছিস তো?

বঙ্কিমদা—আমি উমাদাকে বলিছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু ব'লে চুপচাপ থাকবি না। হ'লো কিনা খোঁজ নিবি। ওরা যদি না পারে নিজে করবি।

বঙ্কিমদা—আচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা ব'লে ব'সে না থেকে এখনই বরং যা', দেখ্ গিয়ে কী হ'লো, কাজ হাসিল ক'রে আয় গিয়ে। যেটা মাথায় নিবি, সেটাই সুষ্ঠুভাবে ক'রে ফেলবি যথাসম্ভব।

বঙ্কিমদা বেরিয়ে যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—অফিসের কাজের ভার

নেবার পর থেকে ও যেন অফিসটাকেই বাড়ীঘর ক'রে ফেলেছে। সবসময় ওর পিছনে আছে। সব কাজ নখদর্পণে!

শরৎদা—হ্যাঁ। বঙ্কিমদা খুব interest (অনুরাগ) নিয়ে কাজ করেন।

এইসব কথা হ'চ্ছে এমন সময় কেষ্টদা আসলেন। কেষ্টদা এসে প্রণাম ক'রে বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—যাদের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করছেন, তাদের ঝুন বোঝেন কেমন? জমি কেনা ও লোকজন এনে বসিয়ে চাষ-বাস করবার জন্য আপনারা যা' ঠিক করেছেন, তার কতদূর?

কেষ্টদা—৩০০ টাকা ক'রে ২৫০ জন আশা করি হ'য়ে যাবে। কয়েকজনকেই একটা prospective list (সম্ভাব্য তালিকা) তৈরী করতে বলেছি, এক-একজন এক-এক district-এর (জেলার) list (তালিকা) করছে। বাছা-বাছা লোকগুলি যা'তে আসে, সে-জন্য আমরা কয়েকজন মিলে চিঠিপত্র খুব লিখছি, অন্যকে দিয়েও লেখাচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। Gathering (সম্মেলন) যা'তে খুব বড় হয়, লোক যা'তে খুব বেশী আসে, তার ব্যবস্থা করেন। যারা দেবে ব'লে মনে করছেন, তাদের অনেকে হয়তো দেবে না, আবার যারা একেবারে নেংটে, তাদের মধ্যে অনেকে হয়তো দেবে। টাকা থাকলেই যে মানুষ পরমপিতার কাজে দিতে পারে, তা' কিন্তু পারে না। তার জন্য আলাদা ভাগ্য লাগে, আলাদা মন লাগে।......... (জমি-কেনা, গৃহনির্ম্মাণ, পুস্তকাদি প্রকাশ ইত্যাদির জন্য ৬ বৎসরে দেয়) ১৩০ টাকার ৫০০০ signatory (স্বাক্ষরকারী) সংগ্রহের কথাও মনে থাকে যেন। কোন্ উদ্দেশ্যে কোন্‌টা করতে যাচ্ছেন সেটা ভাল ক'রে মাথায় ধরিয়ে দেবেন। টাকার কথাটা বড় ক'রে ধরলে মানুষ হকচকিয়ে যায়। অল্পের ওপর দিয়ে যা'তে সবাই বাঁচতে পারে, তার জন্যই এই ব্যবস্থা। সবাইকে কবেন, সোনাদানা যার যা' আছে তা' যেন মাটি ক'রে ফেলে, অর্থাৎ তা' দিয়ে যেন জমি খরিদ করে। জমি কেনা ও কৃষির উপর খুব জোর দেবেন। এক বছর, দেড় বছরের খাদ্যশস্য কিনেও যেন মজুত করে, আর তা'তে যেন এখন হাত না দেয়। অবস্থা কী দাঁড়াবে তা' বোঝা যাচ্ছে না। বর্ম্মার ওদের আমি কত আগেই চ'লে আসতে কইছিলাম, ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়) ওরা যারা সময়মতো চ'লে এসেছে, তারা দেখেন কতখানি রেহাই পেয়ে গেছে।

কেষ্টদা—অতো টাকা মানুষ পাবে কোথায় যে একবছর-দেড়বছরের খাদ্যশস্য মজুত রাখবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কষ্ট ক'রেও যদি ক'রে রাখে, তাহ'লে পরিণামে বেঁচে যাবে। ....সারা বাংলার এবং আলাদা-আলাদা ক'রে বাংলার বিভিন্ন জেলায় road-map (রাস্তার মানচিত্র)-গুলি জোগাড় করেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে আশ্রমে আসার shortest ও safest (সবচাইতে কম দূরত্বের ও নিরাপদ) route

(রাস্তা)-গুলি ঠিক ক'রে ফেলেন। যা'তে বেকায়দা সময় মানুষ হে'টে চ'লে আসতে পারে এখানে। হাঁটাপথে নানাস্থানে সাময়িক আশ্রয় যা'তে পায় তার ব্যবস্থা করে রাখতে হয়। যুদ্ধবিগ্রহজনিত বিপদ ও বিশৃঙ্খলার সময় সবাই যে এখানে আসতে পারবে, তাও নয়, তাই জেলায়-জেলায় কতকগুলি safety centre (নিরাপত্তার কেন্দ্র)-এর ব্যবস্থা করতে বলবেন, যা'তে নারী, বৃদ্ধ, শিশু, কা'রও গায় একটা আঁচড়ও না লাগে। Civil defence (নাগরিকগণের রক্ষাব্যবস্থা)-এর জন্য একটা বিরাট volunteer organisation (স্বেচ্ছাসেবক-সংঘ) তৈরী করতে হয়। তাদের পরণে থাকবে সবুজ সার্ট, সবুজ প্যাণ্ট, উষ্ণীষ ইত্যাদি। একটা badge (পরিচয়চিহ্ন)-ও থাকবে তাদের। এগুলি খুব সুগঠিত ক'রে তুলতে হয়। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবে এমন কতকগুলি লোক যদি না থাকে তাহ'লে মানুষগুলিকে বাঁচান যাবে না।

কেষ্টদা—এরা করবে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জনসেবা ও জন-নিরাপত্তা-বিধানই হবে তাদের প্রধান কাজ। আপনারা যে কৃষি-বিষয়ে সবাইকে সজাগ ক'রে তুলতে চাচ্ছেন, এরা মানুষকে হাতে-কলমে উন্নততর কৃষিপ্রণালী দেখিয়ে সকলকে সে-ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। অবশ্য এদেরও training (শিক্ষা) দেওয়া লাগবে। কৃষি সম্বন্ধে, শিল্প সম্বন্ধে, স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্বন্ধে এবং লোককে বিপদে-আপদে রক্ষা করা সম্বন্ধে এদের train-up (শিক্ষিত) ক'রে তুলতে হবে। এরা সমবেতভাবে কায়িক শ্রম দিয়েও অনেক কাজ ক'রে দিতে পারবে। ধরেন, এক জায়গায় একটা খাল কাটা দরকার। ১০।২০ হাজার লোক যদি একসঙ্গে লেগে যায়, তাহ'লে একটা খাল কাটতে আর ক'দিন লাগে? একজায়গায় হয়তো ২৫ মাইল লম্বা একটা রাস্তা তৈরী করা দরকার, এত লোক যদি আপনার হাতে থাকে, তাহ'লে আপনার ভাবনা কী? Government (সরকার) যা' করুক বা না করুক, আপনারা অনেক কিছু করতে পারেন এদের দিয়ে।

কেষ্টদা—এসব করবে কারা? টাকা জোগাড় করা বরং সোজা কিন্তু মানুষ জোগাড় করা তো খুব কঠিন ব্যাপার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মূল কাজ আপনাদের। প্রথম জিনিস হ'লো দোয়াড়ে দীক্ষা দেওয়া। দীক্ষা পেয়ে মানুষ যা'তে আবার নিথর হ'য়ে না যায়, সেইজন্য তাদের পিছনে লেগে থাকা লাগে। তাদের নিয়ে ওঠা-বসা করতে হয়, তাদের সুখ-দুঃখের ভাগী হ'তে হয়, যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, সদাচার ইত্যাদি রপ্ত ক'রে দিতে হয়, পরস্পরকে দিয়ে পরস্পরের সেবা-সাহায্য করাতে হয়, এখানে নিয়ে আসতে হয়, বই-পত্রগুলি পড়াতে হয়, একসঙ্গে কাজকর্ম্ম, আমোদ-উৎসব করতে হয় কতরকম এতফাঁক আছে, সে-সব কি লিস্টি ক'রে দেওয়া যায়? ধান্ধাওয়ালা মানুষ হলি নিত্যি নতুন তার মাথায় খেলে। মা কত কেতায় ছাওয়াল মানুষ

করে তা' দেখেন না? আদর-সোহাগ করে, তারই বা কত রকমারি ভঙ্গী! বুলিও আবার কত রকমের বার করে—সোনা, মণি, ধন, মাণিক, চাঁদ, বাঁছা, বাবা, বাপধন, বাপুন, বাপাই, বাবলু কতরকমের বচন ও বুলি ফোটে তার মুখে। আবার, ছাওয়াল কোলে ক'রে গুণ-গুণ ক'রে গানও করে। সাজায় কতরকম ক'রে, খাওয়ায় কিরকম? কত গাছ-গাছড়া, লতামুঠো চেনে ছাওয়ালের কল্যাণে। মা হওয়ার আগে সে কি কোনদিন ভাবে যে, এমনি ক'রে এতখানি করতে পারবে কারও জন্য? তার ঐ স্নেহ-মমতাই তাকে করিয়ে ছাড়ে। আর সে-ও পারে স্বামীতে টান থাকে ব'লে। ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু, যাজকরাও তেমনি ইষ্টের প্রতি টান নিয়ে ইষ্টপ্রীত্যর্থে দীক্ষিতদের জন্য করবে। তাই এক জায়গায় কিছু লোক দীক্ষিত হ'লেই তাদের মধ্যে কর্ম্মী হবার মতো উপযুক্ত যারা, তাদের বেছে নিয়ে তাদের পিছনে আলাদা ক'রে খাটা লাগে। তারা যদি এখানে এসে কিছুদিন আপনাদের কাছে থাকে তাহ'লে আরো ভাল হয়।

কেষ্টদা—অনেককে দেখা যায়, কোন পাঞ্জা পাবার আগ পর্য্যন্ত হয়তো বেশ active (সক্রিয়) আছে, পাঞ্জা পাবার পর যেন আর সে উৎসাহ দেখা যায় না। এক-একজনের এক-এক অবস্থায় যেন লয় এসে যায়, কারও যাজকের পাঞ্জা পাবার পর যাজন থেমে যায়, কারও অধ্বর্য্যুর পাঞ্জা পাবার পর উৎসাহে ভাটা পড়ে, কারও সহপ্রতিঋত্বিক্ বা প্রতিঋত্বিকের পাঞ্জা পাওয়ার পর। রকম দেখে মনে হয়, যেন তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'য়ে গেছে, আর কিছু করবার নেই তার। আবার অনেকের আছে, পাঞ্জা পাওয়া-না-পাওয়ার সঙ্গে তার যাজনোন্মাদনার কোন সম্পর্ক নেই। দীক্ষার পর থেকে তারা সমান উৎসাহে কাজ ক'রে চলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই শেষে যাদের কথা বললেন, তারাই পাঞ্জা পাবার যোগ্য। পাঞ্জা দেবার বেলায় মানুষের instinct (সহজাত-সংস্কার) দেখে দিতে হয়! ইষ্টকর্ম্মে যাদের অন্তরের নেশা নেই, অন্য মতলবে যারা ইষ্টকর্ম্মে নামে, তাদের টিকে থাকা মুশকিল হয়। দুঃখ, কষ্ট, নিপীড়ন, নির্য্যাতনের মধ্যে পড়লেও যারা ছেড়ে যায় না, তারাই খাঁটি লোক। আর, এই যে ছেড়ে যায় না, সেটা অপারগতার দরুন হ'লে হবে না, মনের নেশার দরুন হওয়া চাই। সেইজন্য দেখেন না প্রকৃত ভক্ত যে সে ত্রিলোকের আধিপত্যের বিনিময়েও ইষ্টের থেকে একচুল নড়ে না। ইষ্ট ছাড়া আর সবকিছু তার কাছে নস্যাৎ। মোক্ষ বা মুক্তি-কামনায়ও যদি কেউ ইষ্টকে ভালবাসে, সেও অনেক নীরস। তাই চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে—'মুক্তিবাঞ্ছা কৈতব প্রধান'। সেইজন্য গীতায় আছে—

"বহুনাং জন্মনাম্ অন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে,
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।"

সোজা কথা ঐ মানুষটিকে অর্থাৎ বসুদেবের ছাওয়াল বাসুদেবকে সেরেফ তারই

জন্য ভালবাসতে হবে। তিনিই মুখ্য, তিনিই চরম, তিনিই পরম। আদিতেও তিনি, মধ্যেও তিনি, অন্তেও তিনি। যত কথা কন, মূল ঐখানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এবার কারখানার সুধীরদাকে ডাকতে বললেন।

(তেলকালি হাতে-মাখা অবস্থায়) সুধীরদা (দাস) আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কি রে, বড় ইঞ্জিনটা চালু হবিনি তো?

সুধীরদা—চেষ্টা তো করছি। না হবার তো কোন কারণ নেই। অনেকদিন প'ড়ে ছিল, তাই জাম হ'য়ে আছে। ঠিক চালু হবে, আপনি ভাববেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (কেষ্টদার দিকে চেয়ে)—ও কেমন ভরসা দেয়।

কেষ্টদা একটু হাসলেন।

সুধীরদা—আমি তাহ'লে আসি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা।

সুধীরদা চ'লে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কেমন একটা শুয়োরে গোঁ আছে। ভাল যা' বুঝবো, তা' করবই। আপনাদের সঙ্গে এত কথা ক'চ্ছি, কিন্তু ঐ ইঞ্জিন চালু না হওয়া পর্য্যন্ত আমার যেন সোয়াস্তি নেই। আমি জানি, কলকাতা থেকে একজন ভাল মেকানিক নিয়ে আসলে হয়তো এত ধস্তাধস্তি করা লাগে না, সহজেই হ'য়ে যায়। কিন্তু আমার বুদ্ধি, এদের দিয়েই করাব। এরা শিখুক, এরা আত্মনির্ভরশীল হোক, পরনির্ভরতা এদের ঘুচে যাক। এইভাবে প্রত্যেককে তার বৈশিষ্ট্যঅনুযায়ী আরো efficient (দক্ষ) ক'রে তুলতে ইচ্ছা করে। জীবনে এক-একজনের এক-একটা বাতিক থাকে, এটা আমার মস্ত বাতিক। কর্ম্মীদের মধ্যে যদি এই বাতিক ঢুকায়ে দিতে পারেন, তাহ'লে দেখবেন, তাদের চোখমুখে আগুনের ফুলকি খেলতে থাকবে, তারা নিজেরাও চুপচাপ থাকতে পারবে না, অন্যকেও চুপচাপ থাকতে দেবে না (ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর একটু হাসলেন)।

কালিদাসীমা শ্রীশ্রীঠাকুরকে তামাক সেজে এনে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুশি মনে তামাক খেতে-খেতে বললেন—একসময় লোকজন যারা আসতো, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনন্তর ওখানে তত্ত্বালোচনা শুনতো, আমার কাছে বড় ভিড়তে চাইত না। কারণ, আমার কাছে আসলে আমি তো নানারকম কাজ মাথায় চাপিয়ে দেব। অলস উপভোগে বাধা পড়বে। তাই, ফাঁকে-ফাঁকে থাকতে চাইত।............যাই ক'ন, মানুষকে যদি ঠক্কর না দেন, তাহ'লে কিন্তু তার adjustment (নিয়ন্ত্রণ)-ও হয় না, growth (বৃদ্ধি)-ও হয় না।

কেষ্টদা—প্রত্যেকে চায় path of least resistance-এ (সবচাইতে আরামের পথে) চলতে। এক-একজনের এক-এক জায়গায় knot (গাঁট) থাকে, সেখানে সে নিজেও হাত দিতে চায় না, অন্য কেউ হাত দিক তাও পছন্দ করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর দুর্ব্বলতার প্রতি এই মমতা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ মানুষ

এগোতে পারে না। এক কলসী দুধের মধ্যে এক ফোঁটা গরুর চোনা পড়লে যেমন সমস্ত দুধটাই নষ্ট হ'য়ে যায়, অনেকের জীবনে তেমনি বহু সদ্‌গুণের সঙ্গে দুই-একটা বিশেষ দোষ থাকায় মানুষটা আর ফুটতে পারে না। তাই কর্ম্মীদের নিয়ে চলাফেরা করবার সময় এদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন। নিজেদেরও কোন দোষ প্রশ্রয় দেবেন না, আর অন্যদেরও এমনভাবে সচেতন ক'রে তুলবেন যা'তে তারা তাদের অন্তর্নিহিত কোন দোষের প্রশ্রয় না দেয়। 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'। নিজের দোষ-দুর্ব্বলতা ধরা পড়েছে কি তাকে চাবুক কষব আর অন্যকেও তার দোষ পুষে রাখতে দেব না। শাসন ক'রেই পারি, তোষণ ক'রেই পারি, শাসন-তোষণের সংমিশ্রণেই পারি, ভালবেসেই পারি, ভয় দেখিয়েই পারি—এটা করবই। এইভাবে লেগে যান, দেখবেন গোটে-গোটে, গণ্ডায়-গণ্ডায় মানুষ উত্‌রে যাবিনি।

কেষ্টদা—জন্মগত সম্পদ্ না থাকলে এই সহজ করাটুকুই যে মানুষের আসে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার সম্পদ্ যাই থাক, এই তপস্যার আগুনের মধ্যে ফেলে দেন, এক-একজন এক-একখানা চকচকে ইস্পাত হ'য়ে বার হ'য়ে আসবিনি।............ আশ্রম মানে আমি বুঝি, মানুষ তৈরীর কামারশালা।

২১শে চৈত্র, শনিবার, ১৩৪৮ (ইং ৪।৪।৪২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বাঁধের ধারে চৌকিতে ব'সে আছেন। তাঁর চেহারা ও চোখমুখের দিকে চাইলেই অনুভব করা যায়—কিভাবে প্রত্যেকটি মানুষের সব দিক দিয়ে ভাল করা যায়, তারই জন্য তিনি সক্রিয়ভাবে আকুল ও অধীর হ'য়ে আছেন। চোখের চাউনির মধ্যে আছে একটা উদ্দীপনী উন্মাদনা, যা মানুষকে সমস্ত তম ও জড়তার ঊর্দ্ধে টেনে তোলে, আরো আছে এমন একটি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার নীরব ভাষা যা' প্রতিটি সত্তাকে উদ্বেল ক'রে তোলে। ষোড়শ ঋত্বিক্-অধিবেশন উপলক্ষে বাইরে থেকে সহস্র-সহস্র নরনারী সমবেত হয়েছেন। সভাসমিতি এবং অন্যান্য কাজকর্ম্মের ফাঁকে-ফাঁকে ভক্তবৃন্দ যতটা সময় পারেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে কাটান। তাঁর সাহচর্য্যে মানুষ স্বর্গসুখ অনুভব করে। ভুলে যায় সংসারের যত দুঃখ-কষ্ট-গ্লানি। তাঁর পদপ্রান্তে অপূর্ব্ব মনে হয় জীবনের স্বাদ। ব'সে-ব'সে জাবর কেটে-কেটে উপভোগ করে। জীবনে লাভের অঙ্ক তো এইটুকু—এই ইষ্টসঙ্গ-সুখসুধা, এই ইষ্টব্যাপৃতি। নইলে কী আছে পৃথিবীতে যা' মানুষের সত্তার ক্ষুধা মেটাতে পারে? তাকে ভরপুর মাতোয়ারা ক'রে রাখতে পারে? তাই মানুষ তাঁকে পেলে আর কিছু চায় না।............... এখনও অনেকে এসে জমায়েত হয়েছেন। ঋত্বিক্‌দের মধ্যেও অনেকে উপস্থিত

আছেন। যথা সুবোধদা (সেন), মন্মথদা (দে), যতীনদা (দাস), শরৎদা (হালদার), ভোলানাথদা (সরকার), বিপিনদা (সেন), নিবারণদা (বাগচী), মনোরঞ্জনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), কেদারদা (ভট্টাচার্য্য), অক্ষয়দা (পুততুণ্ড), যোগেনদা (হালদার), ত্রৈলোক্যদা (চক্রবর্ত্তী), রত্নেশ্বরদা (দাসশর্ম্মা), ফণীদা (মুখোপাধ্যায়), গোপেনদা (রায়), যোগেশদা (চক্রবর্ত্তী), আশুভাই (ভট্টাচার্য্য), বিরাজদা (ভট্টাচার্য্য), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), তারকদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), মতিদা (চট্টোপাধ্যায়), রাজেনদা (মজুমদার), করুণাদা (মুখোপাধ্যায়), উপেনদা (ভট্টাচার্য্য), নরেনদা (চক্রবর্ত্তী), অনিলদা (গঙ্গোপাধ্যায়) প্রভৃতি এবং আরো-আরো অনেকে। একদিকে উঁচু ক'রে একটা পেট্রম্যাক্স জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, চতুর্দ্দিকে আলোয় আলো হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজ থেকেই বললেন—এইরকম আলোজ্বালানো দেখলে আমার অনেকসময় ইটকাটার কথা মনে পড়ে। তখন যেন একটা উৎসবের মতো লেগে গিয়েছিল। মানুষ দিনকে দিন, রাতকে রাত অতো খাটতো, কিন্তু ক্লান্তিবোধ ছিল না। আর, তখন মানুষ খেতো কী? মা দলা ক'রে দিতেন, তার এক-এক দলা খেয়ে ঢক-ঢক ক'রে একঘটি জল খেয়ে সারারাত কাজ করতো। এতে কিছু আটকাতো না, কারও অসুখ-বিসুখও করতো না। ওয়ার্কসপেও কি রাত জেগে কাজ কম দিন হইছে? এক-এক সময় সমানে চলিছে। আবার কেষ্টদা, পঞ্চাননদা এরা লাগাজোড়া দিনরাত পড়ছে, পড়াচ্ছে—এমন কতদিনও গেছে।.........মানুষ প্রীতির সঙ্গে ক্রমাগত পরিশ্রম করছে—এই দৃশ্য দেখতে আমার ভাল লাগে। মনে হয়, ঐ-ই যেন life-এর (জীবনের) indication (চিহ্ন)।

সুবোধদা—যে-কোন রকম কাজই মানুষ করুক না কেন, fatigued (শ্রান্ত) হ'লে বিশ্রাম তো প্রয়োজন, নইলে শরীরের ক্ষতিপূরণ হবে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Fatigue layer (শ্রান্তির স্তর) পার হ'য়ে গিয়ে আবার নূতন শক্তি জেগে ওঠে, এও ঠিক। James-এর psychology (মনোবিজ্ঞান) প'ড়ে দেখিস, শুনেছি তা'তেও নাকি এ-কথা আছে। আর, কাজের মধ্যে নেমে নিজেও লক্ষ্য ক'রে দেখতে পারিস। কোনএকটা কাজ করতে-করতে হয়তো মনে হ'চ্ছে, আর পারি না, শরীরে আর বয় না, তখনও যদি লেগে-প'ড়ে থাকিস, তাহ'লে হয়তো কিছু সময় পরে দেখতে পাবি, ঐ অবসাদের ভাব কেটে তো গেছেই, আরো নূতন একটা স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহের জোয়ার নেমে এসেছে শরীরে। তখন আর সে-কাজ ছাড়তেই ইচ্ছা হবে না, মনে হবে, আরো করি। তাই ব'লে বিশ্রামের যে প্রয়োজন নেই, সে-কথা বলি না। কিন্তু খুব কম বিশ্রামে গে চলতে পারে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর, মনের খোরাক যদি পুরোপুরি ঠিক থাকে তবে অতি সাধারণ খাদ্যেও মানুষের শরীর সুস্থ ও কর্ম্মঠ থাকতে পারে। মনের খোরাকের দিকে নজর না দিয়ে আমরা শরীরের খোরাকের

কথাই বেশী ক'রে ভাবি। তাই শরীরকে যত খোরাকই দিই না কেন, শরীর আর পটু থাকে না।

মতিদা—মনের প্রধান খোরাক তো নাম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাম তো আছেই। ফলকথা, ইষ্টনেশা নিয়ে ইষ্টের জন্য যা'-কিছু করা যায়, তাই আমাদের চিৎ অর্থাৎ চেতনাকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে। আর, চেতনা যেখানে সুকেন্দ্রিক, সম্বেগশালী ও উদ্দীপ্ত থাকে, তা' থেকে সত্তার যাবতীয় যা'-কিছুই একটা পুষ্টি আহরণ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের গরম লাগছে বুঝে লীলামা একখানা পাখা নিয়ে এসে এক কোণে দাঁড়িয়ে বাতাস করতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাই লক্ষ্য ক'রে প্রীত হ'য়ে বললেন—দ্যাখো! আমি তো কিছু বলিনি, ও নিজের উপর-দিয়ে টের পেয়েছে যে ঠাকুরের এখন গরম লাগছে, তাই পাখা নিয়ে এসে বাতাস করছে। আবার, দাঁড়িয়েছেও এমন জায়গাটায় যা'তে তোমাদের কা'রও অসুবিধা না হয়। কা'রও প্রতি টান থাকলে এইসব বোধ, বিবেচনা গজায়। সেবার আবার রকমারি আছে। কেউ-কেউ নিজের খেয়ালমতো সেবা করে। যার সেবা করছে, তার সুবিধা-অসুবিধা, পছন্দ-অপছন্দের ধার ধারে না। এমনতর সেবায় কিন্তু সেব্য-সেবক কা'রও লাভ হয় না।

নিবারণদা—কাউকে-কাউকে দেখা যায়, আপনার সেবা খুব করেন, কিন্তু মানুষের সঙ্গে মোটেই ভাল ব্যবহার করেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে বুঝতে হবে, সে-সেবা আমাকে ভালবেসে করে না, অন্য কোন মতলবে করে। আমাকে যদি কেউ ভালবাসে, তবে আমি যা' ভালবাসি না, তা' সে করতে পারে না। তা' ছাড়া ঠাকুরকে যে ভালবাসে, সে বোধ করে, আমার ঠাকুর সবার মধ্যে আছেন। সদ্ব্যবহারে সে সবার অন্তর্নিহিত তার ঐ ঠাকুরকে নন্দিত করতে চেষ্টা করে। এটা তার একটা চরিত্রগত লক্ষণ হ'য়ে দাঁড়ায়। মানুষের বোধের, ব্যাপ্তির একটা দাঁড়া চাই। কাউকে ইষ্ট ব'লে বোধ সবার পাকা হয় না। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে একটা বোধ তো সবারই আছে। মানুষ যদি শুধু এইটুকু ভাবে, আমার সঙ্গে অন্যে এমনতর ব্যবহার করলে আমার কেমন লাগে এবং সেই বোধের উপর দাঁড়িয়ে অন্যের সঙ্গে নিজের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে, তাহ'লেই সমস্যার সমাধান হ'য়ে যায়। আমারও ছেলেবেলায় এটা একটা সমস্যাই ছিল। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, এ তো ঠাওর পাওয়া যায় না। এক অবস্থায় যেটা ভাল অন্য অবস্থায় সেটা মন্দ। এখন করা যায় কী? কত লোক নিয়ে কারবার। এরই বা উপায় কী? তখন একটা copy-book-এ (কপি-বুকে) পেলাম, 'Do unto others as you wish to be done by'. (অপরের প্রতি তেমন ব্যবহার কর, যেমন ব্যবহার তুমি তার কাছ থেকে প্রত্যাশা কর।) এইটে পেয়ে আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল, সব সরল

হ'য়ে গেল। লোক নিয়ে চলতে শেখা জীবনের একটা প্রধান কথা, তাই এটা ধর্ম্মেরও একটা প্রধান কথা, কারণ, ধর্ম্মের কারবার জীবন নিয়ে।

উপেনদা—ধর্ম্মের জন্য আমাদের জীবন, না আমাদের জীবনের জন্য ধর্ম্ম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনঞ্চাপি ধ্রিয়তে স ধর্ম্মঃ। তাই ধর্ম্মের মধ্যে জীবন তো আছেই, তদুপরি আছে বৃদ্ধি। তাই জীবন এবং ধর্ম্ম এ দুয়ের মধ্যে ধর্ম্মই ব্যাপক। তাই আমি তো বুঝি, ধর্ম্মের জন্যই জীবন। ধর্ম্ম বলতে বাঁচা-বাড়া বাদ দিয়ে যদি অন্য কিছু বোঝায়, সে-ধর্ম্মের সঙ্গে জীবনের সম্বন্ধ কতটুকু, তা' বুঝতে পারি না।

ব্রজেনদা ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—বাইরে থেকে একজন বিশিষ্ট লোক এসেছেন, গেষ্টহাউসে জায়গা নেই। কোথায় উঠালে ভাল হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার বাড়ীতে।

ব্রজেনদা—আমার বাড়ীতে অন্য কোন অসুবিধা নেই। আমি তো সবসময় অন্য দিকে ব্যস্ত থাকব, দেখাশুনা করতে পারব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার মা আছে, মতি আছে। আপনার মা একাই তো একশ'। আপনি ভাবেন ক্যা?

ব্রজেনদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে হাসতে-হাসতে চ'লে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবার ডাকলেন—ব্রজেনদা! আনন্দবাজারের ব্যবস্থা সব ঠিক আছে তো?

ব্রজেনদা—হ্যাঁ। তবে এবার লোক খুব বেশী। রান্নাবাড়ার জন্য চিন্তার কোন কারণ নাই। পরিবেশনের সময় আরো কিছু লোক পেলে ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর (হাসতে-হাসতে)—কত বামুনের ছেলে আছে আপনাদের এখানে, বাইরে থেকেও কত এসেছে। ডাক-ডোক দিয়ে নিলেই হয়। আর যদি অসুবিধা বোঝেন, বড়খোকাকে ক'য়ে রাখেন যেন। ও লহমায় সব ঠিক ক'রে ফেলবিনি।

ব্রজেনদা এই নির্দ্দেশ নিয়ে চ'লে গেলেন, ইতিমধ্যে কিছু লোক কার্য্য-ব্যপদেশে উঠে গেছেন, আবার নূতন লোক এসেছেন। এইভাবে চলছে, গড়ের উপর ভিড় বেড়ে চলেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পাশ ফিরে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসলেন। কিছু সময় চুপচাপ কাটলো। তারপর কেষ্টদা আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর খুশিমনে বললেন—কেষ্টদা আইছেন, বসেন।

কেষ্টদা বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহ-সহকারে বললেন—ক'ন দেখি খবর-টবর।

কেষ্টদা—খবর খুব ভাল। আমি প্রত্যেকটি point (বিষয়) নিয়ে আলোচনা করছি, সকলেরই খুব উৎসাহ। দায়িত্ব নেবার জন্যই যেন মানুষ

পাগল। ৩০০ টাকা ক'রে যারা দেবে ব'লে এগিয়ে আসছে, তাদের দেখে ধারণা করা যায় না, যে তারা ৩০০ টাকা দিতে পারবে। কিন্তু এমন দৃঢ়-সঙ্কল্প যে, মনে হয়, বাড়ী গিয়ে নিশ্চয়ই পাঠাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (উল্লসিত ভঙ্গীতে)—দেখেন, মানুষ রুখে গেলে কেমন হয়! এদের চেহারা দেখে আমারও মনে হ'চ্ছে—এরা না পারে কী? এইসব সোনার চাঁদ মানুষ যে আমাকে পরমপিতা দিচ্ছেন, সে আমার কম ভাগ্যের কথা নয়। দেখেন কেষ্টদা! এখনও মরার হাড়ে কিন্তু ভেল্কী খেলে। চারিদিকে মানুষ যেখানে নিজের স্বার্থের কথা ছাড়া ভাবে না, মা-ভাইবোনকে পর্য্যন্ত খেতে দেয় না, সেখানে মানুষের এই ত্যাগ-বুদ্ধি বড় কম কথা নয়। ও ভাল কথা! সে আপনি জানেন না বোধহয়। আজ বিকালে এক মা আলুথালু বেশে তার দুগাছি সোনার বালা এনে আমাকে দেবেই। না দিয়েই ছাড়বে না। একেবারে নাছোড়বান্দা। তাকে প্রতিনিবৃত্ত করে সাধ্য কার? আমি প'ড়ে গেলাম মহা-মুশকিলে, ওর ব্যবহারের জিনিস নিতে প্রাণ চায় না, আবার না নিলে ও হতাশ হ'য়ে প'ড়ে। আমি প'ড়ে গেলাম উভয়সঙ্কটে। সে-অবস্থা না দেখলে বোঝা যায় না। যত বলি—ও-জিনিস দিয়ে কাজ নেই, জিনিস তুই তোর কাছে রেখে দে, তুই বরং পরে টাকা পাঠাস; তত ও কাঁদে। পরে ভেবে দেখলাম, ওভাবে বললে ঐ জিনিস বিক্রী ক'রে টাকা এনে দেবে। তখন বললাম—তোর জিনিস আমি নিলাম। আমিই আবার তোকে ওটা দিচ্ছি আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ, ওটা যেন না হারায় বা খোয়া না যায়। তখন ও শান্ত হ'লো।.........আমি না জানি, সে অন্য কথা, কিন্তু জেনেশুনে কারও ব্যবহারের জিনিস আমার নিতে ইচ্ছা করে না।

কেষ্টদা—২৫০ ঘর লোক এখানে এনে স্থায়ীভাবে বসবাস করবার পরিকল্পনার বিষয় শুনে কৃষিকাজ জানেন, চাষবাস করেন এমন কয়েকটি দাদা নিজেদের থেকেই বলছেন—আমরা বাড়ীঘর, জমাজমি সব ছেড়ে চলে আসব। ঠাকুরবাড়ী থাকা তো মহাভাগ্যের কথা। আমাদের যা' করতে বলেন, আমরা তাই করব। আমি তখন যত রকম কষ্ট ও অসুবিধে হ'তে পারে, তা' বললাম। তবু তারা দমে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (হাসতে-হাসতে)—আপনাদের সঙ্গে এদের কেমন একটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো সম্বন্ধ হ'য়ে গেছে। এরা বোঝে যে, মাথাকে যদি তাজা রাখতে না পারে, তবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাঁচবে না। তাই মাথার উপর যা'তে কোন চোট না আসে, সেজন্য সবাই হুঁশিয়ার। কেন্দ্র-সম্বন্ধে এই যে sentiment (ভাবানুকম্পিতা), এ খুব শুভ লক্ষণ। আপনারাও আবার লক্ষ্য রাখবেন যা'তে সৎসঙ্গীদের গায় কাঁটার আঁচড়টি না লাগে। শুধু সৎসঙ্গীদের যদি নিরাপদ রাখতে চান, তা' পারবেন না। তাদের পরিবেশশুদ্ধ সবার দায়িত্ব নেবেন। আর, দীক্ষিত হোক, অদীক্ষিত হোক—সবই পরমপিতার মাল, তাই

আপনাদের রাখালি করা লাগবে সবার উপর। তাই দীক্ষা খুব দেবেন। দীক্ষা নিয়ে একটু-একটু মক্‌সও যদি করতি থাকে, তা'তেও অনেকখানি কাটান পেয়ে যায়, আপনারা worst-এর (সব চাইতে খারাপের) জন্য prepared (প্রস্তুত) হন, worst (সব চাইতে খারাপ) যদি না আসে, তবে best (সব চাইতে ভাল) তো আপনাদের সামনেই আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর নওগাঁর একটি দাদাকে দেখিয়ে বললেন—কেষ্টদা! ও নাকি ভাল নাটক লিখতি পারে। আমি কইছি—এইসব নিয়ে বই লিখতি। আপনার সঙ্গেও আলাপ করতি ক'য়ে দিছি।

কেষ্টদা—এই ভিড়ের মধ্যে তো সুবিধা হবে না। কন্‌ফারেন্সের পরও উনি কয়েকদিন যদি থাকেন, তখন নিরিবিলি কথা বলার পক্ষে সুবিধা হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে কয়েকদিন থেকে যা।

উক্ত দাদা—আমার তো থাকা মুশকিল। বাড়ীতে অসুবিধা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—হাম্ তো ছোড়তে হ্যাঁয়, লেকিন কম্‌লি নেহি ছোড়তি হ্যায়! তাই না? কিন্তু কম্‌লির মায়া অতো করতে গেলে কম্‌লিই যে হারাতে হবে। কাজ যদি করতে চাস্ তো পিছটানের মায়া করলে হবে না। এই নিয়ে ঝাঁপ দেওয়া লাগবে, তা'তে যা' থাকে কপালে। এ-যাত্রা একলা-একলা সামাল হ'য়ে বাঁচা যাবে না, দেশের জন্য, সমাজের জন্য, জাতির জন্য যদি দুঃখ-কষ্ট সও, তার দুঃখ যদি লাঘব কর, তবেই নিজের দুঃখ ঘুচবে। শুধু নিজের দুঃখ ঘোচাতে লাখ চেষ্টা ক'রেও কিছু করতে পারবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু সময় চুপ-চাপ থাকলেন। এরপর গভীর-গম্ভীর স্বরে বললেন—কেষ্টদা! মানুষ সোজা কথাটা বোঝে না কেন?

কেষ্টদা—কোন্ কথা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মকল্যাণের জন্য পরিবেশের কল্যাণ যে একান্ত প্রয়োজন—এই কথা।

কেষ্টদা—আমাদের চিন্তার ধারাটা বদলে গেছে। আমরা ভাবি, টাকা হ'লেই সব হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—টাকাটাই বা আসে কোথা থেকে?..............মানুষই যে বড়, মানুষই যে আসল সেই কথাটা মানুষের বোধে, ব্যবহারে ও মাথায় এনে দেন। আপনাদের অতন্দ্র সেবা দিয়ে মানুষকে এইটে বোধ করিয়ে ছেড়ে দেন। এই বোধটা যদি মানুষের মজ্জায়-মজ্জায় ঢুকিয়ে দিতে না পারেন, তাহ'লে কিন্তু হবে না। কর্ম্মী যে পান না, তারও কারণ ঐ বোধওয়ালা মানুষের অভাব। ব্যাপক-দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষেরই অভাব।

কেষ্টদা—সাধারণতঃ দেখা যায়, মানুষ যে মানুষকে খাতির করে, তার পিছনেও স্বার্থবুদ্ধিই প্রবল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওতে মানুষটাকেও আপন ক'রে পায় না, স্বার্থও সিদ্ধ হয় না। আমি যদি আপনাকে খুব খাতির-যত্ন করি, আর আপনি যদি টের পান যে আপনার ট্যাঁকের দিকেই আমার নজর, তাহ'লে কি আপনি তা'তে খুশি হন? না, আমার জন্য আপনার খরচ করবার প্রবৃত্তি হয়? আপনাকে যদি আমার স্বার্থ ক'রে নিই, আপনার জন্য যদি আমি গলাজলে নাবতে প্রস্তুত থাকি, আপনার জন্য যদি আমার করাটা হিসাব-নিকাশশূন্য হয়, আপনার ভালর জন্য যদি আমার একটা সক্রিয় গরজ ও দায়িত্ব থাকে, সেই ধান্ধা নিয়ে আমি যদি চলি, তার জন্য যদি মাথার ঘাম পায়ে ফেলি, আর সেটা যদি দয়া হিসাবে না ক'রে আমার দায় হিসাবে করি, করতে পারলে একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করি, তাহ'লে আপনার অন্তরাত্মা বুঝবে যে এই লোকটা আমার একটা আপন জন। এমনি পরস্পরের। কিন্তু যার জন্য যা'ই করা যাক, সত্তাকে লক্ষ্য ক'রে করা চাই। সত্তার যদি পুষ্টিসাধন না হয়, সে সেবা সার্থক হয় না। সেজন্য গোড়ায় লাগে ইষ্ট, ইষ্টকে গ্রহণ করলে নিজের সত্তা-সম্বন্ধে একটা বোধ ফোটে, নিজের সত্তা-সম্বন্ধে যখন একটা অনুভূতি জাগে, তখনই অন্যের সত্তাকে অনুভব করতে পারেন আপনি। তার আগ পর্য্যন্ত নয়। ইষ্টার্থে সেবা যখন হয়, ইষ্টার্থে ভালবাসা যখন হয়, তখন সেবা ও প্রীতির circuit (আবর্ত্তন)-টা complete (পূর্ণ) হয়। আর, ভাল ক'রে ভেবে দেখেন! পৃথিবীতে যা'ই ইষ্টার্থে নয়, তা' যত ভালই হোক, একটা পর্য্যায়ে এসে তা' অনাসৃষ্টির সৃষ্টি করে। দক্ষযজ্ঞের কথা তো জানেন, শিবহীন হওয়ায় দক্ষযজ্ঞ অতোখানি বিপর্যয় সৃষ্টি করলো। যা'তে শেষরক্ষা হয় না, তার মধ্যে গলদ আছে। ব্যবসাদারী বুদ্ধি থেকে ভালবাসার ব্যবসা যদি জমেও, সে-ব্যবসার আয়ু কতদিন? যত জিনিসের ভিতই গাঁথি, জীবনের ভিত প্রথম ভাল ক'রে গাঁথতে হবে। আর, সেটা হ'লো ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টির ভিত্তিতে মানুষকে সুসংহত ক'রে তোলা। এই বুনিয়াদ যদি পাকা না হয়, কিছুই দাঁড়াবে না, যা' করেন ধ্বংসে যাবে। নিজের স্বার্থ দেখতে গেলে তাই পরিবেশের জন্য অতোখানি করা লাগে। মানুষ যদি ইষ্টানুপ্রাণনায় অপরকে নিজের মতো বোধ ক'রে অপরের স্বার্থের জন্য অনুসন্ধিৎসু স্বতঃস্বেচ্ছ দায়িত্বে প্রাণপণ পরিশ্রম না করে, তাহ'লে তার ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশলাভ হয় না। ভক্ত ভগবানের দায়িত্বকে নিজের দায়িত্ব ক'রে নেয়। ভগবান যেমন জীবের মঙ্গলের জন্য পাগল, ভক্তও তেমনি জীবের মঙ্গলের জন্য পাগল হ'য়ে ওঠে। তার সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ের অন্ত থাকে না। মানুষের শরীরে সে অমানুষী কাজ করে। তা' না ক'রে তার নিস্তার নেই। পৃথিবীতে একটা মানুষ, এমন-কি একটা জীবও যতদিন দুঃখী আছে, ততদিন তার বিশ্রাম নেই। নিজের মুক্তির চাহিদাও তার কাছে তুচ্ছ। সে ভাবে, প্রভুর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আমি লাখবার নরকভোগ করব, সেও ভাল, কিন্তু তিনি যখন

প্রত্যেকটি জীবের প্রকৃত সুখে সুখী হন, তখন প্রত্যেকের প্রকৃত সুখের জন্য আমি বার-বার পৃথিবীতে এসে সব কষ্ট সহ্য করব। এমনতর মন যাদের, এমনতর প্রাণ যাদের তাদের বলে ঈশ্বরকোটি পুরুষ। সেইসব মানুষ সংগ্রহ করুন। বসুন্ধরা ধন্য হ'য়ে যাক আপনাদের দেখে।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রচণ্ড সম্বেগের সঙ্গে ব'লে চলেছেন, সকলের মন উৎসাহ-উদ্দীপনায় অগ্নিময় হ'য়ে উঠেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ব'সে-ব'সেই কথা বলছেন, তার মধ্যেই আবেগমত্ততায় শরীরটা যেন একটু দুলছে। চোখে-মুখে এক ললিত-মধুর প্রাণোন্মাদী আনন্দের প্লাবন। উদার বক্ষে তাঁর অন্তহীন স্নেহমমতার তরঙ্গ। তাঁর দিব্য বপু ঘিরে চতুর্দ্দিকে যেন এক মহা আকর্ষণী ক্ষেত্র রচিত হয়েছে। সবাই সেই প্রভাবে প্রভাবিত হ'য়ে আত্মহারা হ'য়ে আছেন।

এমন সময় প্রকাশদা পাবনা থেকে একজন বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে দেখা ক'রে ফিরলেন।. শ্রীশ্রীঠাকুর স্মিতহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন—কী খবর? ওখানে গিছিলি তো?

প্রকাশদা—খবর ভাল।

তারপর বলবেন কিনা ইতস্ততঃ করতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরে বললে হয় না? না এখনই বলবি?

প্রকাশদা—এখনই বলতে পারলে ভাল হ'তো।

শ্রীশ্রীঠাকুর (হাসতে-হাসতে)—তা' তোমরা ওঠ, আর করা কী? যুদ্ধের বাজার কিনা, তাই আড্ডার মধ্যেও অজ্ঞাতসারে control (নিয়ন্ত্রণ) ঢুকে যাচ্ছে।

সকলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাসিমুখে গাত্রোত্থান করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রকাশদা ও কেষ্টদার সঙ্গে নিভৃতে কিছু সময় কথা বললেন।

কথার শেষে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রকাশদার গায় একটা ঠেলা দিয়ে জোরের সঙ্গে বললেন—যা! এই পায় চ'লে যা! কাজ বাগায়ে আসা চাই কিন্তু।

প্রকাশদা—রাত্রে এখন আবার যাওয়া কি ঠিক হবে? ভদ্রলোক যদি বিরক্ত হন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিরক্ত কি? খুশিতে টইটম্বুর ক'রে ছাড়ে দিবি। তা' যদি না পারবি, এতকাল এখানে পাছা-ঘস্‌টায়ে করলি কি? (ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে) তুমি আচ্ছা পরামাণিক হইছ দেখতিছি।

প্রকাশদা পুলকিত অন্তরে রওনা দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আবার আসর জ'মে উঠলো। একটু বাদে শ্রীশ্রীঠাকুর সরোজিনীমাকে বললেন—চল্, বড়বৌয়ের ওখান থেকে ঘুরে আসি।

সরোজিনীমা—তা' চলেন। সকাল থেকে তো আর বিশ্রাম নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর (উঠতে-উঠতে)—উপযুক্ত চাপের মধ্যে থাকাই তো বিশ্রাম।

২৭শে চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৪৮ (ইং ১০।৪।৪২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে কারখানায় এসে বসেছেন, সঙ্গে-সঙ্গে অনেকে এসে হাজির হয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কর্ম্মীদের দেখে বললেন—তোমাদের এমন হ'তে হবে যা'তে প্রত্যেককে তোমরা জীবনের পথে এগিয়ে দিতে পার। সেইজন্য নিজেদের খুব শিক্ষিত হওয়া লাগে। যে যে-কাজ নিয়ে আছে সেই কাজ সে আরো ভাল ক'রে কিভাবে করতে পারে, তার মধ্যে গতানুগতিকতার পরিবর্ত্তে উদ্ভাবনী বুদ্ধি কী ক'রে গজিয়ে ওঠে, বিহিত ত্বরিত্যে কিভাবে নিষ্পাদন করতে পারে, তার দক্ষতা কী ক'রে বাড়ে, তার জন্য nurture (পোষণ) দিতে হবে। প্রত্যেককে নানাভাবে বুদ্ধি বাতলাবে যা'তে সে progressive (উন্নতিমুখর) হ'য়ে ওঠে, বেশী ক'রে মাথা খাটায়, বেশী ক'রে পরিশ্রম করে। আমার ইচ্ছা করে, একটা scientific spirit (বৈজ্ঞানিক ভাব) যা'তে সবার মধ্যে ফুটে ওঠে। কৃষক, যে কৃষি করে, সে এই অবস্থায় বিজ্ঞানের সাহায্য যতখানি গ্রহণ করতে পারে করুক। কামার, কুমোর, জেলে, মালো, ধোপা, নাপিত, গয়লা, ময়রা, তেলী, ভুঁইমালী—এরা নিজেদের কাজ ছেড়ে যদি দেয়, তাহ'লে কিন্তু ভাল হবে না, বরং প্রত্যেকটি কাজ আরো উন্নত ও আধুনিক পন্থায় কিভাবে করতে পারে, তাই আমার ইচ্ছা করে। Research-এর (গবেষণার) বুদ্ধি যদি না থাকে, inquisitiveness (অনুসন্ধিৎসা) যদি না থাকে, তাহ'লে মানুষ কখনও এগোতে পারে না।

ফণীদা—কোন বিশেষজ্ঞ যে-বিষয় নিয়েই আসুক, যার যে-বিষয়ে যত জ্ঞানই থাক, দেখা যায় সেই বিষয়েও আপনার জ্ঞান তার চাইতে বেশী। এটা সম্ভব হয় কী ক'রে? আমরা যদি ওর একটা তুক জানতে পারতাম, তাহ'লে বোধ হয় সুবিধা হ'তো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কোন জ্ঞান আছে ব'লে আমি বুঝি না। তবে আমার interest (অনুরাগ) আছে সব বিষয়ে, কারণ, জীবনের প্রয়োজনে লাগে সবই। তাই আমি নিজের গরজে, নিজের আগ্রহে শুনি, দেখি, বুঝতে চেষ্টা করি। হত্যার ব্যাপারটা আমার মোটেই ভাল লাগে না। তবু একজন শিকারীকেও যদি দেখি, তার কাছ থেকে শুনি সে কিভাবে শিকার করে। যার কাছ থেকে যা-ই শুনি, যেখানে যা-ই দেখি, তাই আবার আমি আমার নিজের বুঝ-এর দাঁড়ায় ফেলে বোধ করতে চেষ্টা করি। তখন ওর ভিতরে যদি কোন ফাঁক থাকে সেটা আমার কাছে ধরা পড়ে। তথাকথিত বিদ্বান, জ্ঞানী বা বিশেষজ্ঞ যারা তারা অনেকখানি ধরা-বাঁধা লাইনে চিন্তা করে, আশেপাশের অনেক সম্ভাবনা তাই তাদের চোখ এড়িয়ে যায়, আমার তো ঐসব বালাই নেই, আমি নিজের বোধের উপর দাঁড়িয়ে চোখ-কান-মন খোলা রেখে এগোতে থাকি, তাই আমার মতো ক'রে আমার কাছে অনেকগুলি দিক ধরা পড়ে। তোমরাও নামধ্যান ভাল ক'রে কর,

আর কৃতি-চলনে চলতে থাক—অযথা অলসতার প্রশ্রয় না দিয়ে, তাহ'লে দেখবে, তোমাদের চিন্তার অনেক আড়ষ্টতা ভেঙ্গে যাবে। নামধ্যানের মধ্য-দিয়ে বহু বিচিত্র জিনিসের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম সঙ্গতি বোধে উপনীত হয়। এই সঙ্গতির সূত্র যার কাছে যত প্রতিভাত হয়, সে ততই বোদ্ধাব্যক্তি হ'য়ে ওঠে। কারণ, তার জীবনে দুনিয়ার যা'-কিছু, তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও সার্থকতা কী, এবং প্রত্যেকটা প্রত্যেকটাকে পরিপূরণ ক'রে, সার্থক ক'রে, জীবনকে প্রতুল ক'রে কিভাবে ইষ্টসার্থকতায় সার্থক হ'য়ে ওঠে, তাও সে বুঝতে চেষ্টা করে। এর ভিতর-দিয়ে যে অভিজ্ঞতার সমাবেশ হয়, সেই পর্য্যায়ে ফেলে সে যে-কোন জিনিস সম্বন্ধেই সহজে একটা সুষ্ঠু বোধ আয়ত্ত করতে পারে। তাই, সমগ্র সত্তা দিয়ে যে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হ'য়ে ওঠে, তার জ্ঞানের পরিধির বিস্তার হ'তে দেরী হয় না। আমরা অনেক সময় চোখ-কান খোলা রাখি না, ইচ্ছা ক'রে উপেক্ষা করি, নিজের অভিভূতি নিয়ে আবদ্ধ হ'য়ে থাকি, তাই জানবার অনেক কিছু সুযোগ আমাদের নষ্ট হ'য়ে যায়। কিন্তু ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধি থাকলে ওটি হ'তে পারে না, সে আহরণ করছেই, প্রস্তুত হ'চ্ছেই এবং ঐ এক বুদ্ধি থেকেই। এই প্রক্রিয়া যখন সক্রিয় হ'য়ে ওঠে ভিতরে-বাহিরে—তখন সেইটেই হ'য়ে দাঁড়ায় জ্ঞানের দম্বল।

বাইরে একটা কুকুরের আর্ত্ত চীৎকার শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে বললেন—দেখ্ তো, দেখ্ তো কী হ'লো!

কয়েকজন ছুটে গিয়ে দেখে এসে বললেন—না, এমন কিছু না। একটা ছেলে একটা ঢিল ছুঁড়েছিল, সে-ঢিল গায়েও লাগেনি। ভয়তে ঐরকম করছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা, কুকুরটাকে দোকান থেকে কিছু কিনে খেতে দিয়ে আয় গিয়ে। ভয় পেলে জীবমাত্রেই একটু দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়ে। খেলে গায়ও জোর পাবে, মনেও স্ফূর্ত্তি হবে। ভাববে, আমাকে ভালবাসার লোক আছে।

বিজয়দা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথামতো চ'লে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ সুধীরদা প্রভৃতির উপর একটা বিশেষ কাজের ভার দিয়েছেন। আজ সন্ধ্যার মধ্যেই কাজটি সমাধা করতে বলেছেন। সুধীরদা বলছেন—চেষ্টা খুব করব, কিন্তু সন্ধ্যার মধ্যে হবে ব'লে মনে হয় না। শ্রীশ্রীঠাকুর তা'তে বললেন—'না' কথা উচ্চারণই করবি না। অসম্ভবকে যদি সম্ভব করতে না পারলি, তাহ'লে জীবনের গৌরব কোথায়? আত্মপ্রসাদ কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর এখন এসে কাজের পাশে বসেছেন, সুধীরদা সহকর্ম্মীদের নিয়ে তীব্র বেগে কাজ করছেন। কোন দিকে চাইবার অবসর নেই তাঁদের।

শ্রীশ্রীঠাকুর গল্পচ্ছলে বলছেন—কোন ব্যাপারে মানুষের 'ইতি' নেই। কাজকর্ম্ম যে কত অল্প সময়ের মধ্যে কত সুন্দর ক'রে করা যায়, তা' দায়িত্ব নিয়ে, সঙ্কল্প নিয়ে না করলে বোঝা যায় না। ক'রে-ক'রে অভিজ্ঞতার উপর

দাঁড়িয়ে সব সম্বন্ধেই ক্ষমতা বাড়াতে হয়। সাধনা মানে এই ক্ষমতা বাড়ান। নিজের করার উপর দাঁড়িয়ে এই আত্মবিশ্বাস গজালে তখন অন্যের মধ্যেও তোমরা এই আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত ক'রে দিতে পার।

মনোরঞ্জনদা—যে-কোন রকম কর্ম্মক্ষমতা বাড়ানই কি সাধনা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-কর্ম্মক্ষমতার ভিতর-দিয়ে মানুষের বাঁচা-বাড়ার জোগান দেওয়া যায়, তার বৃদ্ধিসাধন তো সাধনাই। তবে এই সাধনালব্ধ শক্তি আবার ইষ্টার্থে প্রয়োগ করা চাই—অন্বিত সঙ্গীত নিয়ে। তার ভিতর-দিয়ে মানুষের সত্তাই উন্নীত হ'য়ে ওঠে। নচেৎ মানুষের শক্তি যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, সে যদি প্রবৃত্তি-অভিভূত হ'য়ে থাকে এবং ঐ শক্তি প্রবৃত্তির সেবায় লাগায়, তা'তে তার কোন সার্থকতা নেই। তবু নির্ভুল জড়ত্ব থেকে ভুল-ত্রুটিযুক্ত কর্ম্মপ্রবণতা ঢের ভাল। তার adjustment-এর (নিয়ন্ত্রণের) পথ অনেকখানি খোলা থাকে।...........সাধনা বলতেই আমি বুঝি, ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে সত্তাসম্বর্দ্ধনী ও আত্মনিয়ন্ত্রণী শক্তিলাভ ও তার ইষ্টার্থী বিনিয়োগ। আপনি যে কাজ জানেন, যে কাজ করেন, সেই কাজেই আপনার যোগ্যতা বাড়িয়ে তুলুন। আর, সেই যোগ্যতা দিয়ে মানুষের বাঁচা-বাড়ার পথ আরো সুগম ক'রে দেন—ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্য রেখে। তখন বুঝতে পারবেন, কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে কেমন ক'রে ধর্ম্ম প্রতিপালিত হয়। এই বাস্তব করা বাদ দিয়ে ঘটি-ঘটি কাঁদলেও ধর্ম্ম হবে না। কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে ছাড়া আত্মনিয়ন্ত্রণও হয় না। সু-কেন্দ্রিক কঠোরকর্ম্মা হ'তে হবে, তার উপরই গ'ড়ে উঠবে চরিত্রের সৌধ। খুব বড় রকমের তপস্যা না থাকলে চরিত্র হয় না, আর, চরিত্র না থাকলে কালের বুকে দাগ কাটা যায় না। সব মিলিয়ে যায়। যাঁরা লক্ষ-লক্ষ মানুষের জীবনে শুভ প্রভাব বিস্তার করেছেন, তাঁরা কেউ শুধু কথা দিয়ে তা' করতে পারেননি। তাঁদের চরিত্র, চলন, আচার, ব্যবহারই তা' করেছে। আপনাদের ঋত্বিক্‌দেরও তাই করতে হবে। ইষ্টে যদি খুব গভীরভাবে সুপ্রোথিত না হন, তাহ'লে কিন্তু এই জেল্লা খুলবে না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর আপন মনে গান ধরলেন—মনের মানুষ হয় যে জনা, ও তার নয়ন দেখলে যায় চেনা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যে কেমন একটা আত্মহারা তন্ময়তা। একটা অকহনীয় বিরহব্যাকুলতা সকলকে যেন ঠেসে ধরলো। একদিকে লোহালক্কড়ের ঠোকাঠুকি, তীব্র কর্ম্মসমারোহ, আর একদিকে অনন্তের জন্য অন্তহীন আর্ত্তি, বজ্রগর্ভ সম্বেগের ঢেউ। আর, এই দুই-ই উৎসারিত হ'চ্ছে একই উৎস থেকে। তিনি যেন তাই অতীত ও বর্ত্তমানের, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মূর্ত্ত মিলন-বেদী।.........

জনৈক দাদা এমন সময় গোয়ালন্দ থেকে খুব বড় রকমের একটি তরমুজ নিয়ে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লসিত হ'য়ে বললেন—জবর মাল আনিছিস তো! যা, বাড়ীতে বড়-বৌয়ের কাছে দিয়ে আয় গিয়ে। আর বলিস, এর বীচি যেন রেখে দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেবীভাইকে (চক্রবর্ত্তী) বললেন—তুই বরং সঙ্গে ক'রে নিয়ে যা। আর গেষ্টহাউসে দেখায়ে-শ্বনায়ে ঠিক ক'রে দিস।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে আপন মনে বলছেন, আমার ইচ্ছা করে—মান্বষ, গর্, ঘোড়া, কুকুর, বেড়াল, ছাগল, মোষ, পাখী, গাছপালা, ফল-ফ্বল, ধান, পাট, ডাল, কলাই, গম—যা'-কিছ্বরই জন্মগত ঐশ্বর্য্য বাড়ান যায় কী ক'রে। সব-কিছ্বর মধ্যেই একটা উৎকর্ষের আবহাওয়া এনে দিতে হবে। এইরকম একটা সর্ব্বতোম্বখী উৎকর্ষের আবহাওয়া স্ঘিট করতে না পারলে মান্বষ ঠিক-ঠিক কৃষ্টিতাপস হ'তে পারে না, ব্দ্ধিম্বখী হ'তে পারে না। প্রতিটি ব্যাপারে, প্রত্যেকটি পদক্ষেপে মান্বষ সপরিবেশ নিজের কেন্দ্রান্বগ বাড়তির প্রচেষ্টা নিয়ে যদি না চলে, তবে ব্দ্ধিটা মজ্জাগত হয় না। এক কথায়, বাড়তে গেলে পরিবেশকেও বাড়াতে হবে। আর, মান্বষের পরিবেশ শ্বধ্ব মান্বষ নয়, পরিদৃশ্যমান যা'-কিছ্বই মান্বষের পরিবেশ। এই পরিবেশের প্রত্যেক যা'-কিছ্বকে আমরা যত বাড়িয়ে তুলতে থাকব শ্বভ বিনায়নে,—তা' থেকে আমরা নিজেদের বাড়িয়ে তোলার জ্ঞানও তত লাভ করব। আবার, প্রত্যেক যা'-কিছ্ব, বিশেষতঃ জীবনীয় যা', তা' যত বেড়ে উঠবে, তা' আমাদের বাঁচা-বাড়ার পোষণও দেবে তত বেশী ক'রে। এই পোষণ কিন্তু আমরা পাই অনেক রকমে। ধর, তুমি একটা জায়গায় দেখলে অতি চমৎকার একটা লাউ গাছ হইছে, তা'তে লাউ ধরিছে অতি স্বন্দর, সবটার মধ্য-দিয়ে যেন লাউয়ের ঐ উদ্ভিদ্-জীবনের ঐশ্বর্য্য, প্রাচুর্য্য, সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য উছলে পড়ছে। সেই লাউ বা লাউয়ের ডগা বা পাতা তুমি যদি না-ও খাও, অস্য়া ও লোভহীন অন্তরে যদি শ্বধ্ব ঐ দৃশ্য উপভোগ কর, তা' থেকেও তোমার শরীর-মন প্বষ্টি আহরণ করবে। সব জিনিস সম্বন্ধেই অল্পবিস্তর এমনতর। এইভাবে পরিবেশের সব-কিছ্ব যদি স্বন্দর, স্বশৃঙ্খল, সম্দ্ধ ও উন্নত হ'য়ে ওঠে, সেগ্বলি অজ্ঞাতসারে মান্বষকে এক উৎস্জনী ও উদ্বর্দ্ধনী প্রেরণা দেয়। তাই সকল রকম জিনিসকে ভাল করার দায়িত্ব আমাদের। আবার, জন্মের থেকে ভাল ক'রে তোলা লাগে।

যোগেনদা—আপনি কৃষির উন্নতির জন্য আমাদের বিশেষভাবে চেষ্টা করতে বলছেন। সে-সম্বন্ধে আমরা বাস্তবে কী করতে পারি? আমাদের তো এ-বিষয়ে কোন practical experience (বাস্তব অভিজ্ঞতা) নেই। আমরা যা' বলতে যাব, তা' হ'য়ে যাবে অনেকটা প্বঁথিপড়া বিদ্যার মতো। হয়তো কার্য্যকরী হবে না। তা'ছাড়া, যারা হাতে-কলমে কৃষি করে, তারা আমাদের থেকে ঢের বেশী জানে। তাদের আমরা ন্তন ক'রে কী-ই বা শেখাতে পারি, যা' কিনা বাস্তবে লাভজনক হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কৃষির উপর এত জোর দিচ্ছি এইজন্য যে জীবনটা যত পরনির্ভরশীল না হ'য়ে আত্মনির্ভরশীল হয়, ততই ভাল।

জমিজমা কৃষিভরা
ধান্য-গোধূম-শালী,
প্রলয়েও সে নষ্ট না পায়
যাপে স্বজন পালি'।

এটা আমাদের হাতের ভিতরকার জিনিস। এর উপর দাঁড়িয়ে সহজেই আমাদের পেটের ভাতের ব্যবস্থা হ'তে পারে। কিন্তু কৃষিটাকে আজকাল আমরা অনেকখানি অমর্য্যাদাকর মনে করি, আমরা সব ভদ্রলোক হয়েছি কিনা তাই চাকরীর দিকেই নজর বেশী। কৃষিটা যেন ভদ্রলোকের কাজ নয়। অথচ এ-কথা ভুলে যাই যে আমাদের জনক, আমাদের বলরাম নিজ হাতে কৃষি ক'রে গেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের মাঠে গরু চরিয়েছেন। Dignity of labour (শ্রমের মর্য্যাদা) যা'তে সবার ভিতর চারায়, সেটা তোমরা যাজন ক'রে সবার মধ্যে ঢোকাতে পার। আর, কৃষির সঙ্গে আমাদের কৃষ্টির আছে একটা নাড়ীর যোগ। ভারতের জীবন-ধারাকে যদি বুঝতে চাই, অথচ কৃষি যদি না বুঝি, তাহ'লে অনেকখানি ফাঁক থেকে যাবে। মানুষের জগৎ, জন্তুর জগৎ, গাছপালার জগৎ, মাটির জগৎ, জল, বাতাস, আলোর জগৎ, সবটার সঙ্গে যেন একটা যোগসূত্র রচিত হয় কৃষিকাজ করতে গিয়ে। কৃষিকাজের মধ্যে আছে একটা নূতন সৃষ্টির আনন্দ। আর, কৃষিকাজ আমাদের জীবনের সঙ্গে এতখানি জড়িত ব'লে, এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজগুলিকে কতখানি পুণ্য ব'লে মনে করা হয়। বীজবপন, হলকর্ষণ, শস্যকর্ত্তন ইত্যাদি তাই আমাদের দেশে মন্ত্রপূত উৎসবে পরিণত হয়েছে। কৃষি-সম্বন্ধে যা'তে একটা sentiment (ভাবানুকম্পিতা) গজিয়ে ওঠে, তাই তোমাদের করা লাগবে। তোমরাও কৃষি-সম্বন্ধে পড়াশুনো করবে, হাতেকলমে করবে, অভিজ্ঞ লোকের কাছ থেকে শিখবে এবং যা' শিখবে তা' আবার অন্যকে শেখাবে। প্রথম কথা হ'চ্ছে, কৃষি-জগৎটা এখনও অনেকের কাছে বোজা আছে, তোমাদের মাথায় যদি খুলে যায়, এদিকে তোমাদের দৃষ্টি ও অনুরাগ যদি আকৃষ্ট হয়, তাহ'লে তখন আর কওয়া লাগবে না। আপনা থেকেই তোমরা দেখবা, শুনবা, পড়বা, করবা, জানবা ও মানুষকেও শেখাবা। এই অবশ্য-প্রয়োজনীয় ব্যাপারকে অবলম্বন ক'রে দেখবে তোমাদের শিক্ষাও কতখানি সঙ্গতিশীল হ'য়ে উঠবে।

কথা হ'চ্ছে এমন সময় দুটি দাদা ঝগড়া করতে-করতে বিচারপ্রার্থী হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে হাজির হ'লেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথমে পরস্পরের অনুযোগ শুনলেন। তারপর বললেন আচ্ছা ভেবে দেখ্‌তো, ব্যক্তিগতভাবে তোদের কার কী ভুল হইছে, আর সেইটের জন্য ব্যক্তিগতভাবে তোদের কার কী প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই কথা শ্নুনে উভয়েই গাঁইগ্নুই করতে লাগলেন।

তা'তে শ্রীশ্রীঠাকুর গম্ভীরভাবে বললেন—ব্যক্তিত্ব যাদের আছে, আত্মমর্য্যাদা যাদের আছে, তারা নিজেরাই নিজেকে শাসন করে, নিজেকে যারা শাসন করতে জানে না, পদে-পদে তাদের বাইরে থেকে শাস্তি পেতে হয়।

একটি ভাই বললেন—আমি তো কোন খারাপ ব্যবহার করিনি, অথচ আমার উপর এসে হামলা স্নুর্নু ক'রে দিল। আমি যত ভালভাবে বলি, ও তত হম্বিতম্বি করে, ভয় দেখায়, যা'-তা' গালাগালি দেয়। আমি তার কী করব? ঠাকুর! সত্যিই আমি ব্নুঝতে পারছি না, আমার দোষ কোথায়। আমার দোষ থাকলে এবং তা' দেখতে পেলে আমি যথোচিত শাস্তি নিতে প্রস্তুত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই-ই তো তোর দোষের কথা ক'য়ে দিচ্ছিস এর ভিতর-দিয়ে। অথচ দোষ কোথায় ব্নুঝতে পারছিস না, ব্যাপার কী?

উক্ত ভাই হতভম্বের মতো চেয়ে থাকলো, উদাস বিহ্বল দৃষ্টিতে বললো—আমি কিছ্নুই ব্নুঝতে পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—তোর আরো পরাক্রমের সঙ্গে র্নুখে দাঁড়ান উচিত ছিল। এত কথার ভিতর না গিয়ে গম্ভীর হ'য়ে থাকা উচিত ছিল। তাহ'লে ও সাহসই পেত না। পরাক্রম না থাকাটাও একটা দোষ।............

আর-একজনের দিকে চেয়ে বললেন—তোর দোষ কী হয়েছে বল তো?

উত্তর পাওয়া গেল—সত্যিই ও কোন দোষ করেনি, ওকে চটাতে খ্নুব ভাল লাগে, তাই চটাচ্ছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উভয়ের ভাল লাগে যা'তে, ঠাট্টা-ইয়ার্কি সেইভাবে করতে হয়। সেই সীমারেখা লংঘন ক'রে গেলে তার মধ্যে সাত্ত্বিকতা থাকে না। যা, ওকে খ্নুশি ক'রে দে।

তখন পরস্পর হাসিম্নুখে হাত-ধরাধরি ক'রে বেরিয়ে গেলেন মিষ্টির দোকানের দিকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কতকটা স্বগতভাবে বললেন—মান্নুষ ভুল করে, কিন্তু ভুলটাকে শ্নুধরেও নিতে পারে। এই দ্নুইরকম ক্ষমতাই মান্নুষের আছে। তাই ভুলত্র্নুটি সত্ত্বেও মান্নুষের জীবন এত মধ্নুর। তবে বিয়ের ব্যাপারে ভুল হ'লে, তার ফল বড় বেশীদ্নুর গড়ায়। তাই, বিয়ের ব্যাপারে যা'তে ভুল না হয়, সেদিকে তোমরা বিশেষ লক্ষ্য রেখো।

প্রাণরঞ্জন (চক্রবর্ত্তী)—আমরা কী করতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা এইটুকু দেখবে, যা'তে বিয়েগ্নুলি বিধিমাফিক হয়, একটাও প্রতিলোম বিয়ে না হ'তে পারে। মেয়েদেরও শিক্ষিত করে তুলতে হয়, কেমন ক'রে বর-নির্ব্বাচন করতে হবে। বিয়ের আগে মেয়ের অভিভাবক ছেলের বংশ, গ্নুণপনা, প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত খবর নিয়ে যদি মেয়ের কাছে

সে-বিষয়ে গল্প করেন, এবং মেয়ের মত নিয়ে তারপর যদি বিয়ে দেওয়া হয়, তাহ'লে ভাল হয়। পাঁচটা উপযুক্ত পাত্র থাকলে প্রত্যেকটির কথা মেয়ের কাছে যথাযথভাবে বলা দরকার, তারপর মেয়ে যেটি পছন্দ করে, সেই কাজের জন্য চেষ্টা করা ভাল। মনে রাখতে হবে, বিয়ের ব্যাপারে মেয়ের শ্রদ্ধা একটা প্রধান জিনিস। বিয়ে-থাওয়া যদি ঠিকমতো হয়, দাম্পত্যজীবন যদি সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তাহ'লে পুরুষ-নারী উভয়ে জীবনে একটা রস পায়, উৎসাহ পায়, সন্তানাদিও ভাল হয়। বংশপরম্পরায় সমাজ একটু-একটু ক'রে বেড়ে চলে। বিহিত অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ যা'তে চারায়ে যায়, তা'ও করতে হয়। যেখানে যাবে সেইখানেই তোমরা এইসব নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবে। যা-ই করতে চাও সে-ব্যাপারে খুব যাজন দরকার। যাজন না হ'লে মানুষের মাথার শেধলা কাটে না, আর, মাথা সাফ না হ'লে কাজও ফোটে না।

প্রাণরঞ্জন—ঠাকুর! কম্যুনিষ্টরা ঈশ্বরকে মানে না, তা' ছাড়া তারা বলে—শোষণহীন, শ্রেণীহীন সমাজপ্রতিষ্ঠা না হ'লে মানুষের কল্যাণ হবে না, এ কথার জবাব কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কে কী কয় না-কয়, তা' তো আমি জানি না, তবে আমি যা' কই, তা' যদি তোর জানা থাকে, তবে সেই দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে যা' জবাব হয়, সে তো তুই-ই বলতে পারবি।

প্রাণরঞ্জন—সবসময় গুছিয়ে বলতে পারি না। তা' ছাড়া আপনার মুখ থেকে শুনলে জিনিসটা যেন খুব ভাল বুঝতে পারি। বই প'ড়ে ততখানি বুঝতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেউ যদি ঈশ্বরকে না মেনে পারে, তাকে ঈশ্বর মানাবার জন্য তোরই বা অতো মাথাব্যথা কেন? সে অস্তিত্বকে মানে তো? জীবনকে মানে তো?

প্রাণরঞ্জন—হ্যাঁ, তা' মানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' মানলেই হ'লো। জীবনকে যদি কেউ মানে, তার উৎসকেও সে মানে, তাকে সে যা-ই বলুক। তারপর সমাজ শোষণহীন হ'তে পারে, কিন্তু শ্রেণীহীন কি ক'রে হ'তে পারে তা' কিন্তু আমার মাথায় আসে না। প্রত্যেকটি মানুষেরই আছে এক-একটা বৈশিষ্ট্য, বংশপরম্পরায় রক্তধারার ভিতর-দিয়ে এটা ব'য়ে চলে, এই বৈশিষ্ট্যই মানুষের জীবনের চাহিদা, পছন্দ, কর্ম্ম ও গতি নিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকে, এটা বাদ দিলে সে আর তা' থাকে না। ন্যাংড়া আমের ন্যাংড়াত্ব যদি বাদ দাও, তা কি আর ন্যাংড়া আম থাকে?

প্রাণরঞ্জন—তা' থাকবে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে এই বৈশিষ্ট্য যদি মান, বিশেষ-বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যে group (গুচ্ছ)-গুলি গজিয়ে উঠেছে, সেগুলিও তোমাকে মানতে

হয়। এই যে বিভিন্ন গুচ্ছ, এদের মধ্যে শোষণের কোন সম্পর্ক নাই। বিপ্রকে বাদ দিয়ে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের চলে না, ক্ষত্রিয়কে বাদ দিয়ে বিপ্র, বৈশ্য, শূদ্রের চলে না, এরা interdependent (পরস্পর নির্ভরশীল)। কে কা'কে শোষণ করবে? বৈশিষ্ট্যানুযায়ী এরা পরস্পরের মধ্যে সেবার আদান-প্রদান ক'রে নিজেদের অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখে।

প্রাণরঞ্জন—তারা বিশেষ ক'রে ধনী-দরিদ্র হিসাবে সমাজের শ্রেণীবিভাগের বিরুদ্ধে বলে। সব সম্পদ্ রাষ্ট্রায়ত্ত ক'রে তারা ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিতে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের যোগ্যতা-অনুযায়ী কেউ হয় ধনী, কেউ হয় দরিদ্র। ধনী হ'তে গেলে যে মানুষকে শোষণই করবে, তার মানে কি। সদ্ভাবে সেবা দিয়েও তো মানুষ ধনী হ'তে পারে। ধনী হ'য়েও মানুষ যা'তে ধনের সদ্ব্যবহার করে, পরিবেশের শোষক না হ'য়ে পোষক হ'য়ে ওঠে, তার জন্যই তো লাগে আস্তিক্য-বুদ্ধি, ধর্ম্ম, কৃষ্টি। ধর্ম্মই মানুষকে বুঝিয়ে দেয় যে পরিবেশের স্বার্থ-ই তার স্বার্থ। তা' না ক'রে শোষণ নষ্ট করার জন্য যদি মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে লোপ ক'রে দাও, মানুষকে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী কর্ম্ম, অর্জ্জন ও দান করতে না দাও, সব যদি একাকার ক'রে ফেল, প্রত্যেককে যদি স্বাধিকার-বঞ্চিত ক'রে তোল, খাটিয়ে নিয়ে দুটো খেতে-পরতে দাও, তা'তে মানুষের অন্তরাত্মা নিপীড়িত হ'য়ে উঠবে না কি? তুমি নিজেই ভেবে দেখ না—এ তোমার ভাল লাগে কিনা? অবশ্য আমি জানি না কিছু। তবে আমি এইটুকু বুঝি, প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য ও যোগ্যতা স্ফুরণের পথ যদি রুদ্ধ হ'য়ে যায়, তা'তে ভাল হয় না। মানুষ স্বাধীন ইচ্ছায় ভুল করে, আবার স্বাধীন ইচ্ছায় নিজেকে সংশোধন করে, তার ভিতর-দিয়ে মানুষ এগিয়ে চলে। এই স্বাতন্ত্র্য যদি তার না থাকতো তাহ'লে তার অবনতির সম্ভাবনাও যেমন ক'মে যেত উন্নতির সম্ভাবনাও তেমন ক'মে যেত, মোটপর বিবর্ত্তন হ'তো না। কিন্তু আদর্শ-বিধৃত বর্ণাশ্রমে স্বাতন্ত্র্য ও নিয়ন্ত্রণ, ব্যষ্টি ও সমাজ, অর্জ্জন ও উদ্বর্দ্ধন, বৈশিষ্ট্য ও বিশ্বজনীনতা ইত্যাদির একটা সুষ্ঠু সমন্বয় আছে। নিজেদের এমন communism থাকতে ধার-করা communism-এ কাজ কী?

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দাও দেখি, তামুক খাওয়ায়ে দাও।

তামাক খেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর কাঠের মিস্ত্রীদের কাজ দেখতে গেলেন। ভাল একখানা তক্তা রোদের মধ্যে প'ড়ে থাকতে দেখে বললেন—এটা ছায়ায় রাখ্। রোদে ফেটে যাবে।

মিস্ত্রীদের মধ্যে একজন উঠিয়ে রাখল।

কোন্ গাছের কাঠ কেমন এই নিয়ে কিছু সময় মিস্ত্রীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হ'লো।

১লা বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৪৯ (ইং ১৪।৪।৪২)

নববর্ষোপলক্ষে চতুর্দ্দিকে একটা আনন্দের হিল্লোল ব'য়ে যাচ্ছে, আশ্রমের আবালবৃদ্ধবনিতা শ্রীশ্রীঠাকুরকে অর্ঘ্যাদিসহ প্রণাম করতে এসেছেন। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেকে সাদা ফুলের মালা গেঁথে নিয়ে এসেছে। তারা শ্রীশ্রীঠাকুরের গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছে, তিনি আবার তাদের গলায় সেই মালা পরিয়ে দিচ্ছেন। এক-আধজন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য নববস্ত্র এনেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও হাসিখুশি হ'য়ে সবার সঙ্গে বাক্যালাপ করছেন। একটি দাদা আসামে থাকেন, তার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে মণিপুরী নৃত্য, সঙ্গীত ও শিল্প সম্বন্ধে কথা উঠেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর অত্যন্ত আগ্রহে নিজের থেকেই নানারকম প্রশ্ন ক'রে ঐগুলি সম্বন্ধে শুনছেন। দাদাটিও নানা বর্ণনাসহ গল্প করছেন। মণিপুরী নৃত্যে কেমন জমাটি রকম সৃষ্টি হয় তা'ও বলছেন। নৃত্য-গীতের সঙ্গে বাদ্যাদি কেমন থাকে ও পরিবেশটি কেমন হয়, লোক কেমন মেতে ওঠে তার একখানি ছবি এঁকে তুলছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন—মানুষের জন্ম, কর্ম্ম, পরিবেশ, পরিস্থিতি, বংশ ইত্যাদির ভিতর-দিয়ে তার একটা নিজস্ব রকম ফুটে ওঠে, আর সেই নিজস্বতার ছাপ কিন্তু তার সব ব্যাপারে প্রকট হ'য়ে ওঠে। এই যে বৈচিত্র্য, এই বৈচিত্র্যকে কখনও ভাঙ্গতে চেষ্টা করতে নেই। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্য আছে, তাকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করতে হয়। তুমি-আমি ফারাক হ'য়েও এক, এইটে বোধ করতে পারার মধ্যেই আছে আনন্দ। আমরা ঐক্য আবিষ্কার করতে গিয়ে ভেদ দেখতে ভুলে যাই, আবার ভেদ দেখতে গিয়ে ঐক্যের কথা ভুলে যাই। এমনতর একপেশে দেখায় দেখা হয় না। দেখার সুসম্পূর্ণ রকমটা তাই আয়ত্ত করতে হয়।

উক্ত দাদা—কী রকম? কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কয়েকজন অন্ধের হাতী দেখার গল্পটা জান তো? যে হাতীটার কান ধরলো সে বললো হাতী কুলোর মতো, যে পা ধরলো সে বললো হাতী থামের মতো, যে শুঁড় ধরলো সে বললো কলাগাছের মতো, যে পেট ধরলো সে বললো বিরাট জালার মতো, এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে সুরু ক'রে দিল। হাতীর চেহারার মধ্যে যে এই সবরকম আছে ও আরো কিছু আছে এবং গোটা হাতীটা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চেহারার, অন্ধেরা সে-কথা কিন্তু আর বুঝলো না। আমরা চক্ষুষ্মান্ যারা, তারাও আবার জিনিসগুলিকে সম্পূর্ণভাবে দেখতে অভ্যস্ত হই না। এক-একজন এক-এক দিকে অন্ধ থাকি, সে দিকটা আর চোখে পড়ে না। এইভাবে বস্তু ও বিষয়গুলির পুরো চেহারাটা দেখতে পাই না।

জিতেনদা (রায়)—প্রত্যেকেরই কি এই রকম হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অল্পবিস্তর হয়ই। তবে যারা balanced (সাম্যভাবাপন্ন) তাদের এমনতর হয় না।

জিতেনদা—Balanced (সাম্যভাবাপন্ন) লোক ক'টা পাওয়া যায় দুনিয়ায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য perfectly balanced (সম্পূর্ণভাবে সাম্যভাবাপন্ন) যাঁরা, তাঁদের শরণাপন্ন হ'তে হয়। তাঁদেরই আমরা বলি আদর্শ। তাঁদের থাকে একটা সহজ, সুসম্পূর্ণ, চৌকষ দৃষ্টি ও বোধ। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে যখন তাঁদের অনুসরণ করি, তখন একটা নির্ব্বিশেষ বিশেষত্বের দিকে অগ্রসর হ'তে থাকি।

মাতৃমন্দিরের বারান্দায় ব'সে এইসব কথা হ'চ্ছে, এমন সময় নাজীরপুরের একজন মুসলমান সেখানে এসে হাউমাউ ক'রে কেঁদে পড়লো—ঠাকুর! আমার ছাওয়াল বোধ হয় আর বাঁচাতে পারি না। আপনি রক্ষে না করলে আর উপায় নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর (অধীর হ'য়ে)—কেন, কী হইছে তার?

উক্ত মুসলমান ভাই—কলেরা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওষুধ দিচ্ছিস তো?

উক্ত ভাই—ডাক্তার ওষুধ দিছে। কিন্তু তা'তে কোন ফল হ'চ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে বললেন—প্যারীকে ডাক্ তো।

সুশীলাদি (হালদার) প্যারীদাকে ডাকতে গেলেন। প্যারীদার আসতে দেরী দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই প্যারীদার খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। প্যারীদা বাড়ীতে ছিলেন না। রোগী দেখতে গিয়েছিলেন। যা-হোক, শ্রীশ্রীঠাকুর ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে নানা জন নানাদিকে বেরিয়ে গেলেন প্যারীদার খোঁজে।

একটু পরেই প্যারীদা এসে হাজির হলেন সাইকেলে ক'রে।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদাকে দেখেই বললেন—দ্যাখ্ প্যারী! এর ছাওয়ালের ব'লে কলেরা। তুই এখনই যা, দেখে ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থা সব ঠিক ক'রে দিয়ে আসবি। ছাওয়াল বাঁচিয়ে তোলা চাই। ওষুধ-পত্র ও যন্ত্রপাতি যা'-যা' নেওয়া প্রয়োজন মনে কর নিয়ে যাও। দরকার হ'লে ভগীরথ বা শচীন কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাও। কোনরকম কার্পণ্য করবা না, যেমন ক'রে হো'ক প্রাণ দেওয়া চাই। টাকা-পয়সার দরকার হ'লে আমাকে ক'য়ো।

প্যারীদা (নন্দী)—আজ হালখাতার দিন। আমার সঙ্গে ভগীরথ (সরকার) বা শচীন (বন্দ্যোপাধ্যায়) কেউ গেলে তো এদিকে অসুবিধা হবে। আমি একলা গেলেই চলবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি দরকার বোধ না কর, নিও না, কিন্তু হালখাতার consideration-এ (বিবেচনায়) যা' করণীয় তা'তে ত্রুটি ক'রো না। একটা জীবন যদি বাঁচাতে পার, সেই সবচেয়ে বড় হালখাতা।.........আর, হালখাতার

ব্যবস্থা করতে আটকাবে না তোমাদের। ও ঠিক হ'য়ে যাবে। তুমি আর দেরী ক'রো না, এখনই তৈরী হ'য়ে বেরিয়ে পড়।

প্যারীদা তখনই ডিস্‌পেনসারীতে ঢুকে একটা ব্যাগের ভিতর কতকগুলি ওষুধপত্র ঢুকিয়ে ব্যাগ নিয়ে রওনা হ'লেন।

মুসলমানটি এতসময় শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে মুগ্ধ-কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চেয়েছিল, এইবার সে-ও প্যারীদার সঙ্গে রওনা হ'লো। যাবার বেলায় ব'লে গেল—আপনার নজর থাকে যেন, তাহ'লে খোদাতালার ইচ্ছেয় ছাওয়াল ঠিক ভাল হ'য়ে উঠফি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খোদাতালাকে ডাক। আর ডাক্তারবাবু যা'-যা' করতে কয়, তা' ঠিকমতো করবি। বাড়ীর যারা ভাল আছিস, তারাও খুব সাবধানে থাকিস। ডাক্তারবাবুর কাছে শুনে নিস কী-কী করা লাগবি।

যে আজ্ঞে বলে বিদায় নিলো সে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর আশ্রম-প্রাঙ্গণে বাবলা-তলায় গিয়ে বসলেন। চতুর্দ্দিকে বহুলোক। শ্রীশ্রীঠাকুর ব'সে একটু হাঁপ ছেড়ে বলছেন—আমার এখনও বুকের মধ্যে যেন কেমন করছে। লোকটা যখন এসে কেঁদে পড়লো, তখন আমার মনে হ'তে লাগলো—আমিই যেন ওর অবস্থায় প'ড়ে গিছি। সে ভাবটা এখনও আমার কাটেনি। বুকটার মধ্যে যেন দাপাচ্ছে। পরমপিতার দয়ায় ছেলেটা ভাল হ'য়ে যায়!.........আশেপাশে কলেরা আরো দুই-একটা ক'রে হ'চ্ছে ব'লে খবর পেয়েছি। আশ্রমের সবাইকেও সাবধান ক'রে দেওয়া লাগে।.........বীরেনদাকে ডাক্ তো।

একটু পরে বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বীরেনদাকে বললেন—দ্যাখেন বীরেনদা! নাজীরপুরে কলেরা হইছে, আরো দুই-এক জাগায়ও হ'চ্ছে। Preventive measures (প্রতিষেধক ব্যবস্থা) হিসাবে যা'-যা' করা লাগে, আপনি এখনই তার ব্যবস্থা করেন। কেউ যেন বাদ না যায়। আপনি বাড়ী-বাড়ী যেয়ে সব ঠিক ক'রে দেবেন। শুধু ক'য়ে ছেড়ে দেবেন না। উত্তম বৈদ্যের মতো বুকে হাঁটু দিয়ে করাবেন।

এই কথা শুনে বীরেনদা হেসে ফেললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তা'তে বললেন—হাসবেন না বীরেনদা! হাসবেন না। অবস্থা বড় সঙ্গীন। মানুষ বাঁচার জন্যও জড়তা ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। তাই, ধ'রে-বেঁধে করাতে হবে। শতকরা ৯৯টা মানুষকে চালিয়ে-চালিয়ে সচল ক'রে তুলতে হবে। খাটুনি আছে ঢের।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কণ্ঠস্বরে একটা গূঢ় বেদনার আভাস ফুটে উঠলো।

অক্ষয়দা (পূততুণ্ড) ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—ঠাকুর! আপনি মানুষের জন্য এত ভাবেন কেন? এত করেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজকের দিনে মানুষের জন্য যতখানি করার প্রয়োজন তা' করতে পারি কই? কিন্তু ভাবনা আমাকে ছাড়ে না। আর, আমি একলা করলে

তো হবে না, একলা করার কাজও না। আপনাদের যেমন-যেমন কই, আপনারাও আপ্রাণ হ'য়ে তেমনি করেন, তাহ'লে হয়। মানুষগুলি যেন অনাথ হ'য়ে গেছে, ডান-বাঁও জ্ঞান নেই। কে-ই বা শেখাবে, কে-ই বা বোঝাবে, কে-ই বা হাত ধ'রে টেনে তুলবে?

প্রভাকরদার মাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—বিরাজদা কেমন আছে?

মা বললেন—ভাল।

অক্ষয়দা—নিজের দুঃখের ধান্ধাই বওয়া যায় না, তার উপর সকলের দুঃখের ধান্ধা যদি মাথায় নেওয়া যায়, তাহ'লে তো কষ্টের আর অবধি থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কষ্টের মধ্যেও সুখ আছে। অপরের মুখে যদি এতটুকু হাসি ফোটাতে পারেন, তা'তে যে কি আরাম তা' কি দেখেননি? আপনি নিজে একখানা ছেঁড়া কাপড় প'রে থেকেও যদি প্রিয়জনকে একখানা ভাল কাপড় পরান, আর সে-কাপড় প'রে যদি সে সুখী হয়, তাহ'লে আপনার কি ছেঁড়া কাপড় পরার দুঃখ মনে থাকে? চোখ দুনিয়ার সব-কিছুকে দেখে, কিন্তু নিজেকে দেখতে পারে না। অন্যকে উপভোগ করিয়ে, সুখী ক'রে, সেই উপভোগটা, সেই সুখটা ভাল ক'রে পাওয়া যায়। নিছক নিজের উপভোগ বা সুখের আস্বাদ মানুষ যেন ভাল ক'রে গ্রহণ করতে পারে না। মানুষ অত্যন্ত বেকুব না হ'লে পরিবেশ-সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারে না। পরিবেশ-সম্বন্ধে যা'তে প্রকৃত ভাবনা জাগে, পরিবেশের জন্য যা'তে করে, তার জন্যই ছিল আমাদের 'ভৈক্ষ্যং চর'—এই বিধান।

অক্ষয়দা—ভিক্ষা তো একটা অক্ষমতার লক্ষণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভিক্ষা যে কতখানি গৌরবজনক ব্যাপার তা' জানলে আর ও-কথা বলতেন না। সেকালে ছাত্ররা মানুষের বাড়ী-বাড়ী যেত, তাদের সুখ-দুঃখের খবর নিত, বাস্তবভাবে অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে সেবা দিত, তাদের নানা সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হ'তো এবং যেখানে প্রয়োজন, আচার্য্যের সঙ্গে আলোচনা ক'রে বিহিত সমাধান দিত, তাদের যাজনে উদ্বুদ্ধ ও ইষ্টকৃষ্টি-অনুরক্ত ক'রে তুলতো, এক কথায় প্রত্যেকটি পরিবারকে উচ্ছল ক'রে তুলতে চেষ্টা করতো। এইভাবে মানুষগুলি হ'য়ে উঠতো তাদের পরমাত্মীয়, কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্যস্বরূপ তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে ভিক্ষা দিত, সে-ভিক্ষা আহরণ ক'রে নিয়ে ছাত্ররা আবার গুরুকে নিবেদন করতো। গুরুসেবার পর তারা প্রসাদস্বরূপ যা' পেতো তাই গ্রহণ করতো। এই যে শিক্ষাব্যবস্থা, এতে ছাত্ররা বুঝতো যে, মানুষ উপায় করাই জীবনের প্রধান কাজ। মানুষের জীবনের উপর, মানুষের সুখ-সুবিধার উপর, মানুষের উন্নতির উপর, বর্দ্ধনার উপর যা'তে গোড়া থেকেই নজর পড়ে, তার ব্যবস্থা আমাদের আজ করতে হবে। এইটুকুর উদ্বোধন যদি না হয়, তাহ'লে সব শিক্ষা ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। ভাল মানুষ বলতে, শিক্ষিত মানুষ বলতে

বুঝতে হবে তাকে, যে বাস্তবভাবে মানুষের ভাল করে। মন্দ করলাম না, এই যথেষ্ট নয়, সবভাবে নিজের ও অপরের ভাল করতে হবে। মন্দকে মন্দীভূত করতে হবে—ইষ্ট, কৃষ্টি, বৈশিষ্ট্যের প্রতি নজর রেখে। ভাল মানুষগুলি যদি শক্তিমান সক্রিয় না হয়, তাহ'লে ভালর প্রভাব চারাবে না। আজকাল দেখা যায়, সমাজে খারাপ মানুষগুলি সক্রিয়ভাবে খাটে-পেটে, মানুষের খারাপও করে তারা সক্রিয়ভাবে, কিন্তু ভাল মানুষগুলি যেন মিনমিনে, অন্যের ক্ষতি করে না, ভাল করতে চায়, কিন্তু ভাল করার ক্ষমতা নেই। এতে প্রভাব হয় না। আপনারা ঋত্বিক্‌রা এমন বাস্তব সর্ব্বতোমুখী সেবাসম্ভার নিয়ে, চারিত্রিক দ্যুতি নিয়ে সমাজের বুকে প্লাবনের মতো ঢ'লে পড়েন যে মানুষের অন্তরাত্মা যেন আপনা থেকে গেয়ে ওঠে—'স্বস্তি! স্বস্তি!' 'স্বাগতম্, স্বাগতম্'।

অক্ষয়দা—আপনি যখন বলেন, তখন উদ্দীপনা পাই খুব, কিন্তু করার বেলায় বেশী করতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখন যা' শোনেন, সেটা কাজে পরিণত করতে চেষ্টা করেন। কাজের পথে যত বাধাবিঘাই আসুক, কিছুতেই ঘাবড়ে যাবেন না। নিরন্তর তা' নিয়ে করতে থাকুন। আর, করার পথে বিচার ক'রে দেখবেন, নিজের দোষ-ত্রুটি কোথায়। যখন যেটাকে ধরতে পারবেন, তখনই সেটাকে সংশোধন ক'রে ফেলবেন। সহকর্ম্মীদের যদি কোন দোষত্রুটি থাকে, তার জন্যও নিজেকে দায়ী মনে করবেন। অতোখানি দায়িত্ব বোধ যদি থাকে, তাহ'লে দেখবেন, আপনার আওতায় এসে মানুষ কেমন প্রবুদ্ধ হ'য়ে যাবে। সৎসঙ্গীদের পরিবেশশুদ্ধ সব দিক দিয়ে গজিয়ে তুলবেন। অন্যান্য কাজের সঙ্গে কৃষি ও কুটিরশিল্পের দিকেও নজর দেবেন। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছে, তারা আরো ভাল ক'রে কি ক'রে করতে পারে তা' ধরিয়ে দেবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কালিদাসীমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আজ বড় বৌয়ের ওদিকে আয়োজন কেমন?

কালিদাসীমা—আজ খুব জোর আয়োজন। অনেক কিছু রান্না হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও জানি, আজ পয়লা বৈশাখ, অনেক কিছু রান্নাবাড়া হ'চ্ছে। কিন্তু আমার আবার আজ তেমন খিদে নেই। পরমপিতা জোটালে কী হবে, আমার যে লগ্ন হয় না।—ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর একটু হাসলেন।

কালিদাসীমা—খাবার দেরী আছে, এর মধ্যে খিদে হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—তা' দেখা যাক,—তুমি যখন কইছ।

এরপর কলকাতা থেকে আগত একটি দাদা বললেন—আমার এই খোকা আপনাকে একটা আবৃত্তি ক'রে শোনাতে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা!

ছেলেটি রবীন্দ্রনাথের 'অভিসার' আবৃত্তি ক'রে শোনালো।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে বললেন—বেশ।

দাদাটি জিজ্ঞাসা করলেন—আবৃত্তি ভাল ক'রে করতে গেলে কোন্-কোন্ দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়? এদিকে আমার নিজের বিশেষ ঝোঁক আছে তাই জিজ্ঞাসা করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবৃত্তির প্রথম জিনিস উচ্চারণ, তার চাইতেও বেশী চাই বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে বোধ ও আবেগ। সেই আবহাওয়াটি ফুটিয়ে তুলতে হবে চোখে, মুখে, কণ্ঠস্বরে। বৈচিত্র্য না থাকলে আবৃত্তি একঘেয়ে হ'য়ে যায়। যেখানে যতটুকু থামার সেখানে ততটুকু থামতে হবে, যেখানে জলদে বলার সেখানে জলদে বলতে হবে। বলার আগে নিজের mood (ভাব)-টা ঠিক ক'রে নিতে হয়। যে আবৃত্তি করছে, সে আবৃত্তির সময় বিষয়টি যদি অন্তর দিয়ে বোধ করে, তাহ'লে অন্য সকলেও বোধ করবে। শ্রোতাদের দিকে বেশী ক'রে মন গেলে বিষয়ের উপর মন থাকে না, তা'তে ভাবটা ফস্কে যায়। ওতে আবৃত্তি ভাল হয় না। আবৃত্তি একটা art (শিল্প), art (শিল্প)-এর প্রাণ হ'লো তন্ময়তা। ভাবতন্ময়তার মধ্য-দিয়ে মানুষের যে মনোরঞ্জন হয়, মনোরঞ্জনী প্রয়াসের ভিতর-দিয়ে সে মনোরঞ্জন হয় না।

উক্ত দাদা—কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্য আনা যায় কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অভ্যাস করতে হয়। আমাদের কবিরাজী শাস্ত্রে কণ্ঠস্বরের শক্তি বাড়াবার জন্য নানারকম ওষুধপত্রের বিধান আছে। বীরেনদার কাছ থেকে শুনে নিও।

উক্ত দাদা—না, আমার তেমন কিছু দরকার নেই, এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার দরকার থাক্ বা না থাক্, তোমার যদি জিনিসটা জানা থাকে, তাহ'লে তা' দিয়ে আর পাঁচজনের সাহায্য হ'তে পারে। জানার সুযোগ পেলে সে-সুযোগ ছাড়বে না, আর যেটা জানবে, সেটা নিখুঁতভাবে জানতে চেষ্টা করবে। এইভাবে তোমার জানার পাল্লা যত বেড়ে যাবে, তত মানুষের কাজে লাগতে পারবে। তোমার দেখাদেখি তোমার ছেলেপেলে শিখবে, আরো কতজনে শিখবে, এইভাবে তোমার সামান্য সদভ্যাসটুকু অন্যের ভিতর চারিয়ে গিয়ে দেশ-দেশান্তরে, কালে-কালান্তরে কতখানি মঙ্গল সৃষ্টি করবে তার কি ইয়ত্তা আছে? তুমি-আমি যদি এইভাবে চলি এবং যাকে পাই তাকেই যদি এইভাবে চালাতে চেষ্টা করি, তবে সবার অলক্ষিতে স্বর্গের সিঁড়ি গাঁথা হ'য়ে যাবে।

বেলা বেড়ে উঠেছে, রৌদ্রের তাপ প্রখর হ'য়ে উঠেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাই ওখান থেকে উঠে যেয়ে খেপুদার বারান্দায় বেঞ্চিতে বসলেন। কিছু সময় খেপুদার সঙ্গে নিভৃতে কথাবার্ত্তা চললো। তারপর কেষ্টদা আসলেন। কেষ্টদা কাগজের খবরগুলি সংক্ষেপে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হিটলারের প্রসঙ্গে বললেন—যাই বলেন কেষ্টদা! হিটলার যে

সারা দেশটাকে অল্পদিনের মধ্যে সব দিক দিয়ে এতখানি efficient (দক্ষ) ক'রে তুলেছে, সে একটা বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়। Blood-এর (রক্তের) purity-র (পবিত্রতার) দিকে হিটলারের যে নজর, ওটা একটা মূল ব্যাপার। যে movement (আন্দোলন)-ই করা যাক, racial blood (জাতীয় রক্ত) যদি ঠিক না থাকে, সব গোলমাল হ'য়ে যাবে। আমার মনে হয়, কোন জাতের যদি সর্ব্বনাশ করতে হয়, তবে তাদের মধ্যে প্রতিলোম ঢুকিয়ে দিয়ে যতখানি তা' করা যেতে পারে, অন্য কোন উপায়ে ততখানি করা সম্ভব নয়। তবে হিটলার অনুলোমের ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। অনুলোম admixture-এ (মিশ্রণে) রক্তের ধারা নষ্ট হয় না, বরং vigour (তেজ) বাড়ে। অনুলোম সন্তানদের সাধারণতঃ fanatic zeal (প্রত্যয়প্রবল উৎসাহ) থাকে।

কেষ্টদা—আমাদের দেশে রক্তকৌলীন্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের এত দুর্দ্দশা কেন? বিশেষতঃ হিন্দুদের?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেক হের-ফের হ'য়ে গেছে। তারপর education (শিক্ষা) জিনিসটাই তো নেই। যার ভিতর-দিয়ে মানুষের instinct (সহজাত সংস্কার), tradition (ঐতিহ্য), culture (কৃষ্টি) জাগ্রত হ'য়ে, মানুষের personality (ব্যক্তিত্ব) integrated (সংহত) হ'য়ে ওঠে—সর্ব্বাঙ্গীণ সুসঙ্গতি নিয়ে,—তাকে বলা যায় education (শিক্ষা)। আমাদের চেহারাটাই তো আমরা দেখতে পেলাম না, দেখলাম শুধু দৈন্য, দেখলাম শুধু বিকৃতি। তাই inferiority (হীনম্মন্যতা) আর কিছুতে ঘোচে না। অন্তর-বাহিরের, ব্যষ্টির-সমষ্টির, ইহকালের-পরকালের, অতীত-বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সর্ব্বতোমুখী সাফল্যের সূত্র আপনারা যে আবিষ্কার করেছিলেন এবং সে-সূত্র যে এখনো আপনাদের হাতের মুঠোর মধ্যে আছে, তার demonstration (প্রত্যক্ষ পরিচয়) দিয়ে দেন। নিজেরা educated (শিক্ষিত) হন, মানুষগুলিকে educated (শিক্ষিত) করেন। আবহাওয়াটা এমন ক'রে তোলেন যে প্রত্যেকের healthy instinct (সুস্থ সহজাত-সংস্কার)-গুলি nurtured (পরিপুষ্ট) হ'য়ে ওঠে। তা' যদি না হয় তবে Bla (ব্লে) ইত্যাদি শেখার কোন দাম নেই। বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম যতদিন চালু ছিল, সমাজজীবন যতদিন তাজা ছিল, লোকশিক্ষার ধারা যতদিন জীবন্ত ছিল, আচার, নিষ্ঠা, শ্রদ্ধাভক্তি, কুলকৃষ্টি যতদিন তর্‌তরে ছিল, ততদিন আপ্‌সে আপ বেশ চলছিল, চোখ ফুটেই আমাদের সর্ব্বনাশ হ'লো। আজ যেদিকে চোখ পড়ে কেবল মনে হয়, 'আমার কেউ নেই, আমার কিছু নেই।' কী মাথা-খাওয়া কাম যে হ'লো ভাবে কূল পাই না, রাস্তার তেমাথায় দাঁড়ায়ে ডুকরে কাঁদেও সে ব্যথা ভোলা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখ-মুখ গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হ'য়ে উঠলো।

কেষ্টদা ভরসা দিয়ে বললেন—একদিন যা' ছিল তার থেকেও আরো ভাল

ক'রে জেগে উঠবে সব। আমাদের সভ্যতাকে, আমাদের কৃষ্টিকে আপনি যেমন ক'রে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরছেন—সবভাবে, সব দিক দিয়ে,—এমন আর কেউ করেননি। সর্ব্বোপরি, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে লক্ষ-লক্ষ লোক আজ এক আদর্শের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ হ'চ্ছে,—স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে এবং তাদের মধ্যে একটা নিবিড় মমত্ববোধ গজিয়ে উঠছে। এ সবই খুব আশার লক্ষণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আশার লক্ষণ খুবই। কিন্তু আপনাদের খাটা লাগবে ঢের। Field worker-দের (বাইরের কর্ম্মীদের) কাছে আপনি নিজে সর্ব্বদা খুব চিঠিপত্র দেবেন। মানুষগুলিকে চাঙ্গা ক'রে রাখা লাগে। এক-একজনের ভিতর যতখানি সম্পদ্ ও সম্ভাব্যতা আছে, তা' টেনে বের করতে গেলে, তার পিছনে লেগে থাকা লাগে। আপনাদের পিছেন কী কান্ডটা করিছি, মনে নেই? সে এক ভূতানন্দী ব্যাপার। আমি নিজেই যখন ভাবি, মনে হয় আমি পাগল না আর কিছু।

কেষ্টদা—আপনি আমাদের সকলকে আনন্দে মাত ক'রে রাখতেন। তার মধ্যে কষ্টের লেশমাত্র ছিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অথচ দেখেন, সবসময় একটা-না-একটা কিছু করার তালে থাকতেন। ইষ্টকর্ম্ম আপনার কাছে যদি অতোখানি আনন্দের ব্যাপার হয়, তাহ'লেই তা' অন্যের কাছে -আনন্দদায়ক ক'রে তুলতে পারবেন। এমনতর কর্ম্মব্যপদেশে যে তপস্যা হয়, তা'তেই চরিত্র গঠিত হয়।

২রা বৈশাখ, বুধবার, ১৩৪৯ (ইং ১৫।৪।৪২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় বসেছেন। একটি মা তাঁর অভাবের কথা জানালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—নিজে সংগ্রহ ক'রে নেওয়া ভাল। ওতে যোগ্যতা বাড়ে।

মা-টি বলতে লাগলেন—আমি চাইলে দেবে কে? আমি চেয়ে দেখেছি, দিতে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে তোমার মানুষের জন্য করা নেই। আবার চাইতেও জানা চাই। চাইতে হয় এমন ক'রে, যা'তে অন্যে দিতে স্ফূর্ত্তি পায়, বল পায়। এমনিতেই মানুষের কত দুঃখ, তারপর তোমার চাওয়ার রকম যদি তাকে আরো ভারাক্রান্ত ক'রে তোলে, তাহ'লে সে লাভবান হবে কি ক'রে? দেখিস না আমি কিভাবে চাই? আমি যখনই যার কাছে কিছু চাই, সাধারণতঃ ভাবি, এই দেওয়ার চেষ্টার ভিতর-দিয়ে সে কতখানি এগিয়ে যেতে পারে। কেবল নিজের কাজ বাগাবার কথা ভাববি না, সেই সঙ্গে ভাববি, যার কাছে চাচ্ছিস তার সুখসুবিধার

কথা, আর তোর শক্তিতে যতখানি কুলোয় হাতেকলমে কাজেও তা' করবি। তখন দেখবি, মানুষের তোকে দিতে আগ্রহ হবে। স্বার্থপর যদি হ'তে চাস, তবে অন্যের স্বার্থ বড় ক'রে দেখবি। এই একটা গোড়ার কথা তোকে ক'য়ে দিলাম।

মা-টি তবু টাকার জন্য ব'সে রইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বীরেনদাকে (মিত্র) ডাকিয়ে বললেন—ও বীরেন! ১৫টা টাকা দিবি নাকি?

বীরেনদা—কখন?

শ্রীশ্রীঠাকুর (চোখমুখ ঘুরিয়ে)—কখন আবার কী? ও তো তোর ফুসমন্তরের কাজ। ঝম্ ক'রে নিয়ে আয়!

বীরেনদা হাসতে-হাসতে চ'লে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (মা-টির দিকে চেয়ে)—আমি চাওয়ায় ওর মুখে যে হাসি ভ'রে উঠলো, এইটুকু আমার লাভ।

উক্ত মা—আমরা যে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারার তুক তো ঐ ক'য়ে দিলাম। যেমন করা, তেমনি পাওয়া। আমার সামনে যখন কেউ এসে দাঁড়ায়, আপনা থেকেই আমার মন ব'লে ওঠে—তুমি তোমার দুনিয়ার সবকিছু নিয়ে বে'চেবর্ত্তে থাক, সুখে থাক, ভাল থাক, উন্নতি লাভ কর। মনের মধ্যে যেমন এই বোল জেগে ওঠে, চোখ, কান, জিভ, হাত, পা-ও যেন সুড়সুড় করতে থাকে—কিভাবে তার জন্য কী করা যায়। চিন্তা অনুযায়ী কাজ না করতে পারলে আমার আবার ভাল লাগে না। তাই এর জন্য ওকে ধরি, ওর জন্য তাকে বলি—এই এৎফাঁকের 'পরেই আছি।

সরোজিনীমাকে বললেন—তামুক দাও দেখি সরোজিনী।

দাদা এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন। এমন সময় শরৎদা (হালদার), বঙ্কিমদা (রায়), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়) প্রভৃতি আসলেন।

Industrial move (শিল্প-আন্দোলন)-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Industry-র (শিল্পের) জন্য কতকগুলি qualification (গুণ) লাগে। স্বস্ত্যয়নীতে সেই qualification (গুণ)-গুলি acquired (অর্জ্জিত) হয়, সেই habit (অভ্যাস)-গুলি formed (গঠিত) হয়। যেমন motor-sensory co-ordination (কর্ম্মপ্রবোধী ও বোধপ্রবাহী স্নায়ুর সঙ্গতি)। এই জিনিসটি যদি না থাকে, ভাল চিন্তা-অনুযায়ী কাজ করার অভ্যাস যদি না থাকে, তাহ'লে কত chance (সুযোগ) যে নষ্ট হ'য়ে যায়, তার ঠিক নেই। শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য, এমন-কি জীবনের যে-কোন ক্ষেত্রেই যারা বড় হোক না কেন, তাদের এ গুণটি থাকাই চাই। আর শিক্ষা মানে, এইসব অভ্যাস পাকাপোক্ত ক'রে দেওয়া। স্বস্ত্যয়নীর নীতি ক'টা যদি কেউ

এস্তামাল ক'রে ফেলতে পারে, তাকে কেউ হটাতে পারে না।

শরৎদা—ঠাকুর! আমরা যে industrial move (শিল্প-প্রসারের চেষ্টা) করব, কিন্তু আমাদের আশ্রমের industry (শিল্প)-গুলিই কি successful (সফল) হয়েছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো এগুলি ক'রে রেখেছি educational institutions (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) হিসাবে। জানি, এর ভিতর-দিয়ে অনেকগুলি লোক educated (শিক্ষিত) হ'য়ে উঠবে। এগুলি অর্থকরী কেমন ক'রে করতে হয়, তাও আমি জানি, কিন্তু আমি ভাবি, আপনাদের সবগুলি প্রতিষ্ঠানই যেন মানুষ-করী অর্থাৎ চরিত্রকরী—যাকে বলে character-producing, তাই হ'য়ে ওঠে। কিন্তু মানুষ যদি মানুষ হয়, আর যা'-কিছু হ'তে দেরী লাগবে না। আর, এই মানুষ হওয়ার মূলে আছে ইষ্টস্বার্থী যোগ্যতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ। Industrial instinct (শিল্পের সহজাত সংস্কার) থাকলেই যে সে-লোক আপনার এখানে কৃতকার্য্য হ'তে পারবে, তা' পারবে না। কারণ, অনেকে আছে, ব্যক্তিগত লাভের প্রেরণায় ঝুঁকিও নিতে পারে, টাকা, মানুষ, জিনিসপত্র, বাজার ইত্যাদির যোগাযোগ ক'রে ব্যবসায়িক সংগঠন পাকা ক'রে তুলতে পারে, এক কথায় initiative নিয়ে (স্বতঃ-প্রণোদনায়) মাথায় ও গা-গতরে খেটে অন্যকে খাটিয়ে profitable management (লাভজনক পরিচালনা) করতে পারে। কিন্তু তাকে যদি বলেন—ঠাকুরের মুখ চেয়ে সৎসঙ্গের জন্য তোমাকে করতে হবে, জিনিসটা গ'ড়ে তুলতে হবে, এতে তুমি ব্যক্তিগতভাবে কোন প্রত্যাশা রাখতে পারবে না, এমন-কি স্ত্রী-পুত্রসহ তোমাকে যদি আধপেটা খেয়ে থাকতে হয়, তার জন্যও তোমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে, তাহ'লে দেখবেন, তার তখন আর উৎসাহ থাকবে না। আবার, এখানে কাজকর্ম্ম করতে গেলে নানারকম interference (হস্তক্ষেপ) আছে, adverse criticism (বিরূপ সমালোচনা) আছে, undue insult (অসমীচীন অপমান) আছে। অনেকে আছে, যাদের টাকার উপর তত লোভ নেই, কিন্তু তারা হয়তো egoistic (অহঙ্কারী)। তাদের আবার সেগুলি ignore (উপেক্ষা) ক'রে বা manipulate (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে নিয়ে কাজ করার ক্ষমতা থাকে না। ফলে, আর কৃতকার্য্য হ'তে পারে না। আর আদত কথা, আমাদের ভেতর চৌকষ লোকের অভাব আছে। এখানে industry (শিল্প) ইত্যাদি ব্যাপারে কৃতকার্য্য হ'তে পারবে তারা, যারা চৌকষ ও out and out for the Ideal (পুরোপুরি আদর্শের জন্য)। মোটপর সন্ন্যাসী হওয়া লাগবে, কোন প্রবৃত্তি বা প্রত্যাশা তাদের বাগড়া দিতে পারবে না, এমনতর হওয়া চাই। আত্মস্বার্থসেবী যোগ্যতার একেবারে মানান্তার হয়নি, কিন্তু সে-যোগ্যতায় দেশের বড় একটা ঘাসজল খাচ্ছে না। দরকার আজ ইষ্টার্থসেবী যোগ্যতা ও তদনুযায়ী আত্মনিয়ন্ত্রণের। আপনাদের প্রতিষ্ঠানগুলির

মধ্যে যদি সেই ধরণের মানুষ আসে, দেখবেন, সবগুলি কিভাবে জাঁকিয়ে তুলবে। তারা শুধু বস্তু ও অর্থ সৃষ্টি করবে না, co-worker (সহকর্ম্মী)-দেরও মানুষ ক'রে ছেড়ে দেবে। আপনাদের এখানে কলও এমন হ'য়ে আছে যে, প্রতি-মুহূর্ত্তে মানুষ বোধ করতে বাধ্য যে তাকে অর্থস্বার্থী হ'লে হবে না। ইষ্টস্বার্থী হ'তে হবে, মানুষস্বার্থী হ'তে হবে। এই পরিবেশের মধ্যে প'ড়ে দায় ঠেকেও যদি কতকগুলি মানুষ পথে আসে তাও লাভ।

শরৎদা—দায় ঠেকে পথে আসার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধরেন, একজন হয়তো একজায়গায় চাকুরী করে, এবং যা' মাইনে পায় তা'তে তার বেশ চলে যায়। সে সেইটের উপর দাঁড়িয়ে হয়তো পরিবেশ-সম্বন্ধে অনেকখানি উদাসীন হ'য়েও চলতে পারে, যদিও জীবনের প্রয়োজনে পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা অপরিহার্য্য। কিন্তু আপনার অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য যদি পরিবেশের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়, তাহ'লে তখন ঐ খাতিরেও অন্ততঃ আপনি তাদের দিকে চাইবেন, তাদের জন্য করবেন। এইভাবে দায় ঠেকে করতে-করতে করার অভ্যাস হ'য়ে যায়। আর, এই করাটা যত স্বভাব হ'য়ে যায়, তাই-ই ভাল! প্রত্যাশা-পীড়িত করার মধ্যে একটা দৈন্য থাকে। তাই পরিবেশের জন্য করাটা অভ্যাসে পরিণত ক'রে ফেলতে হয়। আমার allowance (ভাতা) ইত্যাদি করবার ইচ্ছা ছিল না, আমি ভাবতাম, মানুষ মানুষের উপর দাঁড়াবে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের dependent (নির্ভরশীল) হ'য়ে, একটা বিরাট family-র (পরিবারের) মতো inter-dependent (পরস্পর নির্ভরশীল) হ'য়ে থাকবে। আর, প্রত্যেকে in-dependently (স্বাধীনভাবে) service (সেবা) দেবে যতভাবে ও যতখানি পারে। কিন্তু allowance-system (ভাতা-প্রথা) introduced (প্রবর্ত্তিত) হওয়ায় আমার সে-পরিকল্পনা অনেকখানি ভেস্তে গেছে। তবু মাঝে-মাঝে আপনাদের কাছে এজন্য-ওজন্য চাই এবং আপনাদের মানুষের কাছ থেকে ভিক্ষা ক'রে দিতে হয়, এ-ও একটা বাঁচোয়া। এতেও অন্ততঃ পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজনটা মাথায় থাকে। যেই-ই মানুষ ইষ্টকে ভোলে, পরিবেশকে ভোলে, সেই-ই তার deterioration (অধোগতি) সুরু হয়।

বহিরাগত একটি দাদা বললেন—স্বস্ত্যয়নীর সঙ্গে শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে ভাল ক'রে বোঝা যায় না, কারণ, যারা স্বস্ত্যয়নী করে না, তেমন অনেক লোককে দেখা যায় যে তারা হয়তো এসব কাজে খুব উন্নতি করছে, কিন্তু যারা স্বস্ত্যয়নী করে তারা হয়তো ব্যবসায়ে উন্নতি করতে পারছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বস্ত্যয়নী করা বলতে আমি বুঝি, স্বস্ত্যয়নীর ঐ নীতিগুলি পালন ক'রে চলা, ঐগুলি চরিত্রে মূর্ত্ত ক'রে তোলা। কথার কথা ধর, একজন ব্যবসাদার যদি সামান্য অসুবিধাতেই মূলধন ভাঙ্গতে সুরু করে, তা'তে কিন্তু

তার ব্যবসা টিকবে না। তাই একটা অভ্যাস দরকার যে, যত অসুবিধার সম্মুখীন হোক না কেন, মূলধনে হাত দেবে না। স্বস্ত্যয়নী যারা ঠিকমতো করে, তাদের এ অভ্যাস পাকা হ'য়ে যায়। তারা জানে, স্বস্ত্যয়নীর অর্থ ভাঙ্গা যাবে না—তা'তে হাত দেওয়া যাবে না, অর্থাৎ তা' নষ্ট যাতে হয় তা' করা যাবে না। এই ধাঁজটা যখন আসে, তখন স্বস্ত্যয়নী সিদ্ধ হয়। স্বস্ত্যয়নীর মধ্যে আছে পারিপার্শ্বিকের সেবানুসন্ধিৎসা, তার থেকে তাদের প্রয়োজন-পূরণের ফন্দী-ফিকিরও মাথায় আসে। এর থেকে হয় নূতন-নূতন উদ্ভাবন। সেবাবুদ্ধি থেকে মানুষ আবার হ'য়ে ওঠে যাজনজৈত্র। ব্যবসাদারী বিজ্ঞাপন আর যাজন—এ দুইয়ে তফাৎ আছে। এতে মানুষগুলিই আপন হ'য়ে পড়ে, আর বুদ্ধিও দিনের পর দিন খুলতে থাকে। আবার, তার ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধি প্রবল থাকে ব'লে সে পারিপার্শ্বিকের দ্বারা deluded (বিভ্রান্ত) হয় না, বরং তাদের সবাইকে mould (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে নিজের asset (সম্পদ্) ক'রে নিতে পারে। সে হয় master of the situation (অবস্থার প্রভু)। পরিস্থিতির উপর এই প্রভুত্ব যদি না আসে মানুষের, তবে বিশেষ বেকায়দা অবস্থায় সামাল দিতে পারে না। গতানুগতিক অবস্থায় এ-রকম পারে, কিন্তু emergency-র (সংকটের) সময় দিশেহারা হ'য়ে পড়ে। তাই স্বস্ত্যয়নীর চরিত্র যদি তৈরী হয় তবে শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে।

হরিদাসদা (ভদ্র) জমিজমা সম্পর্কে কতকগুলি জ্ঞাতব্য নির্দেশ জেনে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—সব জিনিসের রেকর্ডপত্র, ম্যাপ ইত্যাদি এমনভাবে রাখবে যে একটা কানা মানুষও যেন ঠিক পায়, কোথায় কী আছে। কোন ব্যাপারে জাবড়া ক'রে কিছু রাখবে না। আর মনে রেখো, শুধু নিজে খাটলে হবে না, অন্যকে দিয়ে খাটিয়ে নেওয়া চাই।

হরিদাসদা—আমি নিজে দিনরাত খাটতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু কারও পায় তেল দেওয়া আমার ভাল লাগে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—আমার কাজ উদ্ধারের জন্য যদি মানুষের পায় তেল দেওয়া লাগে তা' তুমি দেবা না কেন? ঐ টেক থাকলে কিন্তু ফেল প'ড়ে যাবা, পা'রে উঠবা না। একা কে কতখানি পারে? অন্যের সাহায্য দরকার হয়ই।

হরিদাসদা—যেভাবে পারি কাজ নষ্ট হ'তে দেব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লেই হ'লো।

বেলা বেড়ে উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে তামাক খেয়ে মাতৃমন্দিরের পিছন দিকে বাবলা-তলায় একটা বেঞ্চিতে এসে বসলেন। সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ু, গামছা, গড়গড়া, তামাক, টিকে, জলের ঘটি, পিকদানি ইত্যাদি নিয়ে আসা হ'লো! একটু পরেই শ্রীশ্রীঠাকুরের একবার কাশতে-কাশতে গলায় সুপারী আটকে যায়। তখনই খাবার জলের দরকার, কিন্তু দেখা গেল, ঘটিতে একটুও

জল নাই। তারপর জল নিয়ে আসতে কয়েক মিনিট কেটে গেল। এতে শ্রীশ্রীঠাকুর খুব কষ্ট পেলেন। জলটল খেয়ে সুস্থ হ'য়ে পরে বললেন—কথায় বলে, সাজার মা গঙ্গা পায় না, আমারও সেই অবস্থা, আমি সাজার ঠাকুর কিনা। প্রত্যেকেই ভাবে, অপরে করবে। আর, duty (করণীয়) সব ভাগ-ভাগ কিনা, কোন-একজনের মাথায় সবটা নেই। তাহ'লে এমন বিশৃঙ্খলা হয় না। আবার যে যেটুকু করে, সে সেটুকুও নিষ্ঠাসহকারে করে না। তাই ব'লে সবাই যে একরকম সে কথা বলি না। মোটপর অনেকের মধ্যে অনেকখানি ফাঁক আছে, সে ফাঁক ভর্ত্তি করার কেউ নেই। এর মধ্যে কেউ-কেউ আছে, তার করণীয় ব'লে যেটুকু মনে করে, সেটুকু ভালভাবে করে। অন্ততঃ সেটুকুও ভাল। তবে আমার গালাগালি দিতে ইচ্ছা করে প্যারীকে। ও যদি তেমন চৌকষ হ'তো, সবাইকে ঠিক ক'রে নিতে পারতো।

কালিদাসীমা—আমারই দোষ হয়েছে। জলের ঘটিতে জল আছে কিনা, সেটা দেখে আমার আগেই ঘটিতে জল ভ'রে রাখা উচিত ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি শুধু আজকের এ ব্যাপার নিয়েই বলছি না।........... আর আমার নিজের কষ্টের জন্যও ভাবি না। তোরা যদি তৈরী না হোস, তাহ'লে তোদের কষ্টই যে বেশী।

শরৎদা প্রভৃতি আছেন। কৃষিশিল্পের পুনরুজ্জীবনে আমাদের কী করণীয় সেই সম্বন্ধে পুনরায় কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জমি-সম্বন্ধে আমাদের একটা জ্ঞান থাকা চাই। যেমন, কোন্ জমিতে কোন্ ফসল ভাল হবে, কোন্ মাটিতে কী-কী chemical property (রাসায়নিক পদার্থ) আছে, এবং তা' কোন্ ফসলের পক্ষে উপযোগী, সেটা জানা দরকার। মাটি পরীক্ষা করার সহজ কতকগুলি তুক জেনে রাখতে হয়। সব জায়গায় তো আর laboratory (গবেষণাগার) পাওয়া যাবে না। কোন্ জিনিসে কী সার দিতে হয়, কোন্ সময়ে কোন্ ফসল দিতে হয়, শস্য কোন্‌টার পর কোন্‌টা বুনলে জমির উর্ব্বরাশক্তি বাড়ে, ফসলের পক্ষেও ভাল হয়, কোন্ সার কী পরিমাণ দিতে হয়, বীজ নির্ব্বাচন করতে হয় কিভাবে, বীজ রাখতে হয় কিভাবে ইত্যাদি সাধারণ কতকগুলি বিষয় জেনে রাখতে হয়। নিজেদের বাড়ীতে হাতেকলমে কৃষি কিছু-কিছু করা প্রয়োজন। আবার, যেখানে যে-জিনিসের চাষ হয় না সেখানে সে-জিনিস জন্মান যায় কিনা তা' experiment (পরীক্ষা) ক'রে দেখতে হয়। ধর, একসময় হয়তো এইসব জায়গায় আলু, কফি, ইত্যাদির চাষ হ'তো না, কিন্তু করতে আরম্ভ ক'রে এখন দেখা যাচ্ছে যে হওয়ার কোন বাধা নেই। কোন দেশে হয়তো নারকেল-সুপারি খুব হয়, আবার বহুস্থানে হয় না। যে-সব জায়গায় হয় না, সেইসব জায়গায় করা যায় কিনা, এবং কী প্রক্রিয়ায়, কী সারে তা' হ'তে পারে, তা' বের করতে হয়।

এগুলি করা কঠিন কিছু নয়। আমার মনে হয়, উপযুক্ত সার ও তদ্বিরের ফলে প্রায় জমিতেই প্রায় জিনিস ফলান যায়। অবশ্য কতকগুলি জিনিস আছে, যা' climatic condition-এর (আবহাওয়ার) উপর খুব নির্ভর করে। যেমন কমলা, আপেল, আঙ্গুর ইত্যাদি শীতপ্রধান দেশে জন্মে, সেগুলি এইসব আবহাওয়ায় উপজান কঠিন। তা'ও যে অসম্ভব তা' মনে হয় না।

শরৎদা—কৃষির সঙ্গে আমাদের গো-পালনের উপরও তো নজর দিতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। গরুই তো গৃহস্থের লক্ষ্মী। গাইগরু, ষাঁড়, বলদ সবই ভাল ক'রে তুলতে হবে। এদের breeding (জনন), লালন-পালন সবই ভাল ক'রে করতে হবে। গো-ধন একটা মস্ত ধন। গো-মাতার পূজা প্রচলিত আছে আমাদের এই ভারতে। গরু কি যে-সে জিনিস? শুনেছি, আজকাল এই যুদ্ধের বাজারে সৈন্যদের খাদ্যের জন্য বহু গরু বিক্রী হ'য়ে যাচ্ছে। এ বড় খারাপ কথা। আমাদের দেশের মুসলমানরা অনেকে গরু খায়, কিন্তু রসুল গো-কোরবাণী বা গরুর মাংস খাওয়ার কথা অনুমোদন করেননি। জীবের রক্তমাংস ঈশ্বরে পেঁছায় না এবং গরুর মাংস স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, এমনতর কথাই বরং রসুল বলেছেন। আপনারা যেখানে-যেখানে যাবেন, গৃহস্থেরা যা'তে গরু পোষে ও ভালভাবে গরুর আদর-যত্ন করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। হয়তো মানুষের বাড়ীর গোয়ালেই ঢুকে বসলেন, গোয়ালের শ্রী দেখে বোঝা যায়, সে-বাড়ীতে গরুর যত্ন কেমন। যদি কোথাও বেতাল দেখেন, তখনই ডেকে ধরিয়ে দেবেন।.........গরুর গোবর যেমন ভাল সার, গোয়াল ঝাড় দেওয়া মাটিও শুনেছি তেমনি ভাল সার। গোবর থেকে সার তৈরীর আবার কায়দা আছে। কৃষি করতে গেলে দেখা যায় জীবজন্তুর গু-মুত, হাড়-গোড়, পচা পাতা, হাবিজাবি সবই কাজে লেগে যায়।

শরৎদা—বিলেতী লাঙ্গল সম্বন্ধে আপনার কী মত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো ঠিক জানি না। তবে আমাদের জমির পক্ষে কোন্‌টা উপযোগী দেখতে হয়। শুনেছি, কোন-কোন জায়গায় ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করতে যেয়ে ফল খারাপ হয়েছে, আবার বহু জায়গায় জলের অসুবিধা আছে। বৃষ্টির উপর তো হাত নেই। তাই যেখানে-যেখানে সুবিধা আছে সেখানে খাল, পুকুর ইত্যাদি কাটতে হবে। এক গ্রামে গেলেন, সেখানে গ্রামের লোকের মধ্যে হুজুক তুলে তাদের দিয়েই এটা করিয়ে নিতে পারেন। কত লোক ব'সে থাকে, একযোগে করলে ক'দিন লাগে? বরং ছেলেবুড়ো সকলে মিলে এইসব কাম করলে একটা উৎসবের মতো লেগে যায়।

শরৎদা—আমাদের তো কোথাও গিয়ে খুব বেশী দিন থাকা সম্ভব হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি তো একলা না। আপনি না থাকতে পারেন, আরো পাঁচজন তো আছেন, এইভাবে মাথা খাটিয়ে যদি করিয়ে নেন, দেখবেন—'সৎসঙ্গ'

'সৎসঙ্গ' রব প'ড়ে যাবে।

আর, আমার একটা সখ আছে যে মানুষ, গরু, কুকুর, গাছপালা, ফল, ফুল ইত্যাদি সব রাজ্যেই অনুলোমক্রমিক মিশ্রণ ক'রে দেখি, তার ফল কী হয়। এদিক দিয়ে অনেক-কিছু সম্ভাবনা আছে।

শরৎদা—শিল্পের ব্যাপারে আমাদের কী করতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, বর্ত্তমান অবস্থায় agricultural industry-র (কৃষিভিত্তিক শিল্পের) দিকে আমাদের নজর দেওয়া ভাল। যেমন ধরেন, একজায়গায় চীনাবাদাম হয়, চীনাবাদাম থেকে তেল করলেন। এক জায়গায় নানারকম ফল হয়, ফল থেকে জ্যাম-জেলী ইত্যাদি করলেন। এক জায়গায় দুধ খুব পাওয়া যায়, এবং তা আবার খুব সস্তা, সেখানে হয়তো milk powder (গুঁড়া দুধ) করলেন। গুড় থেকে চিনি করলেন, মিছরি করলেন। পানকে main ingredient (প্রধান উপাদান) ক'রে এইসান্ এক চীজ বের করলেন যে, বিদেশে পর্য্যন্ত তা' চালান হ'তে লাগলো। প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখা লাগে, দৈনন্দিন ব্যবহারে লাগে কোন্ সব জিনিস। আর, সেগুলি তৈরীর দিকে জোর দিতে হয়! আপনারা বিভিন্ন জায়গায় যান, লোকেদের পরস্পরের মধ্যে আপনারা যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারেন। এতে market-এর (বাজারের) expansion-এর (বিস্তারের) ব্যাপারে আপনারা সাহায্য করতে পারেন। তবে আপনারা ঋত্বিক্, আপনাদের এমনতরভাবে এর ভিতর ঢোকা ভাল না, যা'তে আপনাদের go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি অর্থাৎ কথাখেলাপ) হ'তে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্যাদি যারা চালাবে তারা নিজেদের দায়িত্বেই চালাবে, সে-ব্যাপারে আপনাদের কোন ঝুঁকি থাকবে না।

প্রফুল্ল—কৃষিজাত দ্রব্যকে শিল্প-সামগ্রীতে পরিণত করতে গেলে তো যন্ত্রপাতির দরকার?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেগুলিও তোমাদের মাথা খাটিয়ে বের করতে হবে। এখানে কারখানা করার পিছনে আমার অনেক পরিকল্পনা ছিল। উপযুক্ত লোকও পেলাম না, তাই যা' করতে চাইলাম তাও হ'লো না। তোমরা বাইরে ঘোরাফেরা করার সময় লক্ষ্য যদি রাখ এবং প্রত্যেকটা department-এর (বিভাগের) জন্য যদি sincere (একনিষ্ঠ) ও efficient (দক্ষ) লোক জোগাড় কর, এখনও অনেক-কিছু করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর মাতৃমন্দিরের ভিতরে বিশ্রাম নেবার উপক্রম করছেন। মায়েদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন। ঘুম আসবার আগ পর্য্যন্ত তাঁদের সঙ্গে নানাবিষয়ে আলাপ করছেন। কোন একজনের প্রসঙ্গে কুমোরখালীর মা বললেন—আপনি যেমন বলেছেন, 'বাপের বাড়ী হামেহাল,

থাকলে নারী পয়মাল', মহাভারতেও তেমনি আছে, বিবাহিত মেয়েদের বেশীদিন বাপের বাড়ী থাকা ঠিক নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আছে নাকি?

কুমোরখালীর মা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনিবার্য্য কারণে যদি থাকতে হয়, সে আলাদা কথা, কিন্তু তা' না হ'লে বিবাহিত মেয়েদের বেশীদিন বাপের বাড়ী না থাকা ভাল। শ্বশুর-বাড়ীটা হ'লো শাসনের জায়গা, আত্মনিয়ন্ত্রণের জায়গা, ঐ শাসন থেকে আলগা থাকা ভাল না। তা'ছাড়া, মেয়েদের একটা মস্ত কাজ হ'লো স্বামীর সংসারের সকলকে সন্তুষ্ট ক'রে চলা। খুব মনোযোগসহকারে নিয়মিতভাবে এ-কাজগুলি না করলে, অভ্যাস নষ্ট হয়, সাধনার ব্যাঘাত হয়, অনুসন্ধিৎসা ও পরিচয় ঢিলে হ'য়ে পড়ে। সংসারের প্রত্যেকের রকম-সকম, চাহিদা, পছন্দ ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যদি নিবিড় পরিচয় না থাকে, তাহ'লে কিন্তু সেবা দিয়ে মন জয় করা যায় না। তাই দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকা ভাল না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কুমোরখালীর মা যেমন ক'রে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি পড়ে, তোরাও যদি তেমনি পড়িস, আলাপ-আলোচনা ও চর্চ্চা করিস, তা'তে একটা কাজের কাজ হয়, তোদের দেখাদেখি ছেলে-মেয়েরাও শেখে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর এক-এক ক'রে অনেকের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—কার বাড়ীতে রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি আছে, কার বাড়ীতে নেই।

পরে বললেন—এ সব বই প্রত্যেক ঘরেই রাখা দরকার। সংসার-খরচ থেকে বাঁচিয়ে মাঝে-মাঝেই তোরা কিছু ভাল-ভাল বই কিনতে পারিস। নিজেরা যদি পড়াশুনো করিস, ছেলেপেলেদের আর মারধোর ক'রে পড়াতে হয় না।

৩১শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৯ (ইং ১৪।৫।৪২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বাঁধের ধারে চৌকিতে বিশ্রাম নিচ্ছেন। কাছে বঙ্কিমদা, শ্রীশদা, হরিপদদা, শশধরদা, সতীশদা, তরুমা প্রভৃতি অনেকে আছেন। প্রফুল্ল সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলা থেকে কাজকর্ম্ম ক'রে ঘুরে এসেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে সস্নেহে কাছে ডেকে বললেন—কী রকম কী ক'রে আসলি, দেখে আসলি, গল্প কর্, শুনি।

প্রফুল্ল—আমরা প্রথমে মেদিনীপুর সহরে যাই। ওখানে সহরের সর্ব্ব-শ্রেণীর বহু বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে আমরা দেখা-সাক্ষাৎ ক'রে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ-আলোচনা করতে থাকি। সরকারী কর্ম্মচারীদের সঙ্গেও যোগাযোগ করি। মনোরঞ্জনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), ভূষণদা (মিত্র), অমর ভাই (ঘোষ)—প্রত্যেকেই বেশ স্ফূর্ত্তি সহকারে যাজন করতে থাকেন। ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে

প্রথম ৭।৮ জনের দীক্ষা হয়। দীক্ষাদানের পরই তাদের খুব যাজনে মাতিয়ে তোলা হয়। তারা আবার যাজনে লেগে যায়। আপনার ভাবধারা-সম্বন্ধে ওদের ওয়াকিবহাল করবার জন্য কয়েকটি আহ্বানধ্বনি বেছে নিই এবং তার অর্থ ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলি, আর সংক্ষেপে আপনার জীবনী ও কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে বলি। এতে যেন অল্প সময়ের মধ্যে ওরা অনেকখানি তৈরী হ'য়ে যায়। পরে মেদিনীপুরের District Organiser of Physical Education (ডিষ্ট্রিক্ট অর্গানাইজার অফ্ ফিজিক্যাল এডুকেশন), Livestock officer (লাইভষ্টক অফিসার), কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারী ইত্যাদি দীক্ষা নেন। পশু-জগতে অনুলোম-সংমিশ্রণ যে কতখানি কার্য্যকর এবং প্রতিলোম-সংমিশ্রণ যে কতখানি ক্ষতিকর সে-সম্বন্ধে লাইভ্ষ্টক অফিসার তপনদার কাছে অনেক কথা শুনলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওই সবগুলি টুকে রাখতে হয়।...........আর কোথায়-কোথায় গেলি?

প্রফুল্ল—খড়গপুর, বালিচক, তমলুক, মহিষাদল, গেঁওখালি ইত্যাদি জায়গায়ও গিয়েছিলাম। গেঁওখালিতে হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় তাড়াতাড়ি চ'লে আসতে হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওই তো গোলমাল করিস। শরীর ঠিক না রাখতে পারলে কি কাজ হয়? আর, ঐ জন্য আমারও একটা দুর্ভাবনা থাকে। এমন চালে চলা লাগে যে কিছুতেই অসুখ করবে না।.........এর পর আবার যখন পশ্চিমবঙ্গে বেরোবি, একলপ্তে অন্ততঃ পাঁচ হাজার বিঘা জমি সংগ্রহ করতে চেষ্টা করবি। বাসের জমি, চাষের জমি দুই-ই তার মধ্যে থাকা চাই, যা'তে সবরকমের কৃষি সেখানে করা যায়, আবার বাড়ীঘর, শিল্প-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিও করা যায়। কাছে নদী থাকে, রাস্তাঘাট থাকে, স্বাস্থ্য ভাল হয়, পরিবেশ ভাল হয়—এইসব দেখেশুনে নিতে হয়। মোটপর দরকার হ'লে সেখানে একটা second colony (দ্বিতীয় কলোনী) করার সুবিধা থাকা চাই। জমির জন্য কোন নজর দেওয়া চলবে না। যতদিন পর্য্যন্ত কলোনী গ'ড়ে না ওঠে ততদিন বিনা খাজনায় যা'তে হয় এবং পরে nominal (নামমাত্র) খাজনা দিলেই যা'তে চলে, তেমন ব্যবস্থা করতে হয়।

শ্রীশদা—এত সুবিধা কি দেবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুবিধা কি মানুষ এমনি দেয়? সুবিধা ক'রে নিতে হয়। আমরা মানুষের কাছে আব্দার ক'রে চাইতেই জানি না। মানুষ দেবে না কেন? দেবার জন্য মানুষ ব'সে আছে। নিতে জানা চাই। আর, আপনারা যা' করছেন, তা' যে সবারই স্বার্থ। সেই জিনিসটা তাদের সামনে উপযুক্তভাবে ধরা চাই। কাজ করতে যেয়ে negative (নেতিবাচক) ভাবকে আমলই দিতে

নেই। যা' করতে হবে তা' করা যাবে কিভাবে, সেইটেই বড় ক'রে ভাবতে হয়। প্রশ্নশূন্য হয়ে লাগলেই হয়। কত রাজা, জমিদার ও ধনীলোক আছে, যারা একটা সৎপ্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করতে উন্মুখ।

এমন সময় কলকাতা থেকে দুটি দাদা আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন। আজ বেশ গরম পড়েছে, তার উপর আবার মশা আছে, তাই তরুমা শ্রীশ্রীঠাকুরকে পাখা দিয়ে হাওয়া করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার গা-টা ঘামে প্যাচপ্যাচ করছে, একটু মুছে দে তো।

তরুমা ভিজে গামছা দিয়ে মুছে গামছাখানি আবার কেচে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভগীরথদাকে (সরকার) ডেকে কানে-কানে বললেন একজনকে দশটি টাকা দিয়ে আসতে। বললেন—আমি তোকে বলেছি, এ কথা যেন ঠিক না পায়। তুই নিজে থেকে দিচ্ছিস, সেইটেই যেন বুঝতে পারে। তা'তে তার আত্মপ্রসাদ ও আত্মপ্রত্যয় বাড়বে।

ভগীরথদা তখন-তখনই চ'লে গেলেন।

বঙ্কিমদা (রায়)—বিপক্ষের সঙ্গে ব্যবহারে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চারটি জিনিস প্রয়োগ করার বিধান আছে শাস্ত্রে। আপনাকে দেখি, সাম ও দানই প্রয়োগ করতে। ভেদ ও দণ্ডেরও কি প্রয়োজন নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কাউকে বিপক্ষে ব'লে ভাবিই না। আমি জানি, সবাই আমার এবং যার যা'তে ভাল হয়, তাই করতে চেষ্টা করি। ভেদ ও দণ্ডে যদি কারও মঙ্গল হয়, তা'তে আপত্তির কারণ কী? তবে প্রত্যেকটা মানুষকে আপনার ক'রে না পাওয়া পর্য্যন্ত আমার ভাল লাগে না। সাম ও দানের ভিতর-দিয়েই আপনার ক'রে পাওয়ার সুবিধা হয়। সাম মানে, নিজের সাম্যভাবের impulse (সাড়া) দিয়ে তার মধ্যেও সাম্য অর্থাৎ balance এনে দেওয়া। তবে এর মধ্যেও alert (হুঁশিয়ার) হ'য়ে চলা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু সময় চুপচাপ থাকলেন। পরে বঙ্কিমদাকে বললেন—যারা জমিটমি কিনছে তাদের বিশেষ ক'রে ব'লে দিও, যা'তে স্থানীয় লোকের সঙ্গে ভাবসাব ক'রে নেয়। আশেপাশের লোকজনের সঙ্গে যদি খাতির না থাকে, তাহ'লে কিন্তু অনেক ভিতরের খবর পাওয়া যায় না। আবার, গ্রাম-এলাকায় পরস্পর-বিরোধী দল থাকে, কোন একদলের হ'য়ে যাওয়া ভাল না। সব দলের সঙ্গে বন্ধুতা ক'রে নিতে হয়, প্রত্যেক দলই যেন মনে করতে পারে, এরা আমাদের আপনজন। তাহ'লে সবার উপরে থেকে যাকে দিয়ে যা' করাবার করিয়ে নেওয়া যায়, আবার তাদের মধ্যেও সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায়। এটা ধ'রেই নিতে হবে যে মানুষের মধ্যে inferiority (হীনম্মন্যতা) আছেই, তার দরুন অযথা ঈর্ষ্যা, আক্রোশ ও শত্রুতার সম্মুখীন হ'তে হবে আমাদের। তুমি কারও কোন ক্ষতি

না করা সত্ত্বেও, এমন-কি ভাল করা সত্ত্বেও তারা তোমাকে বেকায়দায় ফেলতে চেষ্টা করবে। বিশেষতঃ যদি তারা দেখে যে তুমি বড় হ'য়ে যাচ্ছ, তাহ'লে তারা তোমার বিরুদ্ধে লাগবেই। আগে থাকতে এগুলি আঁচ ক'রে নিয়ে, তা' যা'তে মাথা-তোলা দিতে না পারে, সেইজন্য বিনয় ও সৌজন্যে সকলের অনুকম্পা আকর্ষণ ক'রে রাখতে হয়।

বঙ্কিমদা—এ যেমন সত্য, তেমনি এ-কথাও ঠিক যে মানুষ যদি বুঝতে পারে যে আমাদের ঘাঁটালে তাদেরও ভয়ের কারণ আছে, তাহ'লে তা'তেও অনেকটা সমীহ ক'রে চলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার জন্য নিজেদের অনেকখানি প্রস্তুতি রাখা লাগে। প্রস্তুতি যদি না থাকে, অথচ কতকগুলি মানুষ যদি বিরোধী হ'য়ে ওঠে, তখন সামাল দেওয়া মুশকিল হয়। তবে সব প্রস্তুতি সত্ত্বেও এমনভাবে চলা লাগে, যা'তে বিরোধ না হয়। শক্তি-সমন্বিত বিনয়-ব্যবহারই তাই ভাল। মানুষের দম্ভকে excite (উত্তেজিত) না ক'রে, তার পোষণ-প্রবৃত্তিকে excite (উত্তেজিত) করাই যুক্তিযুক্ত। প্রয়োজন ও প্রত্যাশা না থাকলেও কখনও-কখনও মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা ভাল, তা'তে মানুষের অহং খুশি থাকে। আবার, অযাচিতভাবে নিজে থেকে বুঝে-সুঝে মানুষের জন্য করাও ভাল।............ আর একটা কথা—জমি-জমা যারা কিনবে, তাদের ব'লো, হিসাবপত্র যেন ঠিক রাখে। তুমিও হিসাবপত্র সব ভাল ক'রে বুঝে নেবে। নিজে থেকে যদি হিসাবপত্র না-ও দেয়, চেয়ে নেবে। Strict supervision-এর (কড়া-তত্ত্বাবধানের) মধ্যে না থাকলে মানুষ অনেক সময় খারাপ হ'য়ে যায়। মানুষকে খারাপ হওয়ার সুযোগ দেওয়া ভাল না। দুর্ব্বলতা যখন মানুষকে আশ্রয় করে, তখন প্রথমে সে ঠিক পায় না, কিন্তু গোড়া থেকে খবরদারী যদি করা যায়, তাহ'লে গলদ জমতে পারে না। তোমাদের তাই অনেক খাটা প্রয়োজন। মানুষ নিয়ে চলা কম কথা নয়।

শ্রীশদা—সবচাইতে কঠিন ব্যাপারই তো দেখি, লোকচরিত্র বোঝা ও লোক-ব্যবহার ঠিকমতো করা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের আচার-ব্যবহার ভাল ক'রে দেখতে হয়। একজন হয়তো ভাল-ভাল কথা বলছে, সেই কথা শুনে বোঝা যাবে না লোকটা কেমন? বলার ভঙ্গীটা লক্ষ্য করতে হবে। অনেকের দীনতার কথা বলার মধ্যেও একটা আত্মপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধি থাকে, আবার অনেকে হয়তো রোখালো কথা বলে কিন্তু তার মধ্যেও থাকে একটা শ্রদ্ধা-প্রীতির ভাব। শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা কার মধ্যে কতখানি জীবন্ত সেইটে লক্ষ্য ক'রে দেখতে হয়। আবার করা, বলা ও ভাবার সামঞ্জস্য কেমন তাও লক্ষ্য করতে হয়। অনেকে দেখা যায়—কথায় খুব দড়, কিন্তু কাজের বেলায় নারাজ। কাজ না দেখে শুধু কথা শুনে মানুষকে বিচার

করার মতো ভুল আর নেই। আবার, কাজ দেখতে গেলেও নিজের ধারণা-অনুযায়ী তা' দেখলে চলবে না। অনেক সময় আমরা নিজেদের মনগড়া ধারণা-অনুযায়ী দেখি। কে কী উদ্দেশ্যে কেন কী করছে, তা' তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করি না। আপনি হয়তো একজনকে বকছেন, তাই দেখেই মনে করলো, শ্রীশদা খুব রাগী। কিন্তু তার মঙ্গলের জন্যই যে তাকে শাসন করছেন, তা' হয়তো আর বুঝলো না। আবার, মানুষ তার অসতর্ক মুহূর্ত্তে কেমন ব্যবহার করে, তাই দেখে তার চরিত্র বোঝা যায়। বাড়ীর লোকের সঙ্গে বা চাকরবাকরের সঙ্গে ব্যবহার দেখে ঠিক পাওয়া যায়, তার স্বাভাবিক রকমটা কী। অনেকে আবার দীনকে দয়া করে আত্মতুষ্টির জন্য, কিন্তু মহৎকে শ্রদ্ধা করতে পারে না, বরং তাঁদের বিধ্বস্তই করতে চেষ্টা করে। এরা কিন্তু মূলতঃ ইতর-প্রকৃতির। তাই প্রধান দ্রষ্টব্য হ'চ্ছে, active attachment for superior and Ideal (শ্রেয়জন এবং আদর্শের প্রতি সক্রিয় অনুরাগ)। ওইটে যদি থাকে, তার মধ্যে যত দোষই থাক, সেগুলি নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে উঠবেই। কিন্তু ঐ অনুরাগ নেই অথচ বাহ্যতঃ নানা সদ্‌গুণ আছে, সে কিন্তু আদৌ নির্ভরযোগ্য লোক নয়। উচ্চে শ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা কার কতখানি, তাই হ'ল চরিত্রের মস্ত পরখ। ঐ শ্রদ্ধা যদি আবার শ্রেয়জনের তোয়াজ-সাপেক্ষ হয়, তাহ'লে হবে না। তাঁর ভর্ৎসনা বা দুর্ব্ব্যবহারেও শ্রদ্ধা কতখানি অটুট থাকে দেখতে হবে। তাঁর দুঃখ, বিপদের সময় কি করে, তা'ও লক্ষ্যণীয়। মহৎকে যে স্বার্থ ক'রে নিয়ে অচ্যুতভাবে চলতে পারে, জানবেন তার ভিতর মাল আছে। বাহ্যতঃ তার যত অসঙ্গতি থাক না কেন, জানবেন সে মহাসাধু। আর, মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে গিয়ে প্রত্যেকের সঙ্গে তার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী ব্যবহার করবেন। তা' যদি করেন তাহ'লে দেখবেন, লোকে আপনার ধন্যি-ধন্যি করবে। আপনার ব্যবহারে মানুষ যেন স্ফূর্ত্তি পায়, তৃপ্তি পায়, আনন্দ পায়। প্রীত ক'রে প্রীত হওয়ার বুদ্ধি থাকলে মানুষকে আপন ক'রে তুলতে দেরী লাগে না। ন্যায্য সুখ্যাতি করার অভ্যাসটা এস্তামাল ক'রে ফেলতে হয়। আবার, কারও দোষের কথা বলতে গেলেও যথাসম্ভব মিষ্টি ক'রে বলতে হয়। এককথায় বুদ্ধি রাখা লাগে, যার সঙ্গে যাই করি না কেন, তা' যেন তার ও অন্যের বাঁচা-বাড়াকে পুষ্ট করে। তাই আমি কই ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার কথা। ঐ একসূত্র ঠিক রাখলেই সব সূত্র ঠিক থাকে।

শ্রীশদা (রায়চৌধুরী) কোন্ অবস্থায় কী করলে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার সহায়ক হবে বা হবে না, তা' বোঝাই তো কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কঠিন কিছুই না। আন্তরিকভাবে মানুষ যদি ঐ-ই চায়, তবে ঠিক বুদ্ধি জোয়ায়। যদি কখনও কোন ভুল হয়, তা'ও করার পথে ঠিক ক'রে নিতে পারে।.........কিসে আপনার ভাল হয়, তা' বুঝতে তরুর কি কষ্ট হয়?

শ্রীশদা—নিজের স্বার্থের খাতিরেই তা' অনেকখানি বুঝতে পারে, কারণ ও জানে, আমার সঙ্গেই ওর জীবন জড়িত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনিও যদি তেমনি জানেন যে আমার সঙ্গে আপনার জীবন জড়িত, তাহ'লে আমার পক্ষে কোন্‌টা ভাল হয়, মন্দ হয়, তা' বুঝতে তত অসুবিধা হবে না। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর যে সম্পর্ক, ইষ্টের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তার চাইতেও গভীর।

বাঁশবনে একটা পাখী ডাকছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পাখীটা ডাকছে কেমন ব্যাকুলভাবে। মনে হয়, ও যেন কাকে খুঁজছে কিন্তু পাচ্ছে না। আর ডাকের ভিতর-দিয়ে বলছে, 'ওগো! তুমি কোথায়? তুমি কোথায়?' প্রকৃতির ভিতর সব-কিছুই চলে একটা টানের নেশায়। এই নেশা না থাকলে চলাও থেমে যায়।

প্রফুল্ল—চেতন পদার্থের মধ্যে না হয় নেশা আছে, কিন্তু অচেতন পদার্থের মধ্যে কি নেশা আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অচেতন যে কী আছে, তাই বোঝা যায় না। যা' অচেতন মনে হয়, তারও চেতনা আছে। আমরা হয়তো এখন ঠিক পাচ্ছি না, পরে ঠিক পাব। তেমন সূক্ষ্মশক্তিসম্পন্ন যন্ত্র যদি বের করা যায়, তা' দিয়ে দেখান যেতে পারে যে প্রত্যেক যা'-কিছুর ভিতরই চেতনা আছে।

প্রফুল্ল—কেষ্টদা বলছিলেন এখানকার জন্য কতকগুলি উপযুক্ত কৃষক-পরিবার জোগাড় করতে। কিন্তু বাড়ীঘর ছেড়ে মানুষ কি বরাবরের জন্য আসতে চাইবে? এ ব্যাপারে কিভাবে অগ্রসর হ'লে সুবিধা হবে বুঝতে পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথম কথা হ'লো তাদের দীক্ষিত ক'রে তোলা। কোনরকম লাভ বা লোভের প্রত্যাশা দেখিয়ে মানুষ আনলে চলবে না। আবার, যারা life-এ (জীবনে) unsuccessful (অকৃতকার্য্য), সেই সব লোকও আনতে যেও না। কিছুই করতে পারে না, তাই এখানে আসলো—কোনভাবে তোমাদের উপর দিয়ে দিন চলবে এই আশায়, তাদের দিয়ে কাজ হবে না। তাই বেছে-বেছে লোক আনবে, যা'তে তারা pauper (দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত) না হয়, ungrateful (অকৃতজ্ঞ) না হয়। যারা হবে তোমাদের হাতিয়ার, তারা যদি অন্যের ভাঙচিতে ভোলে, দুঃখ-কষ্ট বা লোভানীতে টলে যায়, তাহ'লে কিন্তু বিপদের কথা। তাদের সবরকম দুঃখ-কষ্টের জন্য প্রস্তুত ক'রে আনবা, তবে প্রাণপণ চেষ্টা করবা যা'তে যথাসম্ভব সুযোগ-সুবিধা দিতে পার। অবশ্য, দুঃখ-কষ্টের ভিতর-দিয়ে না গেলে মানুষের দরদ হয় না। প্রথম আমলে যারা এখানে এসেছিল, তারা কত অভাবের মধ্যে দিন কাটিয়েছে, আবার নিজেরা কত কষ্ট ক'রেও প্রতিষ্ঠানগুলি গ'ড়ে তোলার ব্যাপারে সাহায্য করেছে। তাই তাদের

অনেকেরই আশ্রমের প্রতি একটা মমতা গজিয়ে উঠেছে, এ-স্থান ছেড়ে তারা যেতে চায় না।

প্রফুল্ল—অনেক দিন দুঃখ-কষ্ট স'য়ে থেকেও, পরে চ'লে গেছে, আপনার সঙ্গে বা আশ্রমের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না, এমন লোকও তো দেখা যায়! তাদের মধ্যে কেউ-কেউ আবার নিন্দাবাদও করে। এর কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর কারণ, তারা যে স্বার্থপ্রত্যাশা নিয়ে এসেছিল তা' পূরণ হয়নি। তাই ইষ্টের কাছে আসতে গেলে ইষ্টকে সেবা করার প্রত্যাশা ছাড়া অন্য কোন প্রত্যাশা রাখতে নেই। অন্য প্রত্যাশা থাকলেই ছিটকে পড়তে পারে। ....আর, ঐ যে লোক আনবা, তারা যেন পরাক্রমী হয়। সাহস, পরাক্রম, বীর্য্য যদি না থাকে, তাহ'লে তারা তোমাদের বল হবে না।

শ্রীশদা—দেশের লোকের মধ্যে বীর্য্যবত্তা জাগিয়ে রাখার জন্য আমরা কী করতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, ঢাল-সড়কি-খেলা, অসিখেলা, ধনুর্ব্বিদ্যা, মল্লযুদ্ধ, নানাবিধ অস্ত্রচালনা শিক্ষা, বীর্য্যের উদ্বোধন হয় এমনতর গীতবাদ্য ও শ্লোগানসহ ড্রিল, প্যারেড ও নানাবিধ খেলা ইত্যাদির অনুষ্ঠান করা ভাল। মাঝে-মাঝে কৃত্রিম যুদ্ধাদির ব্যবস্থাও করতে হয়। এতে আক্রমণ ও আত্মরক্ষা দুই দিকেরই শিক্ষা হয়। সবচাইতে বেশী ক'রে শিক্ষা দিতে হয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার বুদ্ধি। নির্ভীকতা একটা বড় কথা। তাই ব'লে আমি হঠকারিতার সমর্থন করি না। নিজেরাও কোথাও principle forsake ক'রে (আদর্শ বিসর্জ্জন দিয়ে) compromise (আপোষরফা) ক'রে চলবেন না, আর অন্য কাউকেও তা' করতে দেবেন না। বেশীর ভাগ মানুষের দিকে চাইলেই মনে হয়, তারা ভীরু, কাপুরুষ, বুকে বল নেই। এটা একটা জাতের moral imbecility-র (নৈতিক পঙ্গুতার) পরিচায়ক। তাই অন্যায় যা', দুর্ব্বলতাবশতঃ তাকে কখনও প্রশ্রয় দেবেন না, প্রশ্রয় দিলে আপনাকেই কিন্তু পেয়ে বসবে তা'।

শ্রীশদা—অনেক সময় বিরুদ্ধপক্ষ এত প্রবল থাকে যে সেখানে কিছু করতে যাওয়া বিপজ্জনক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেখানে যে-অবস্থায়, যেমন ক'রে করলে প্রতিবিধান হয়, তাই করতে হবে। অনেক সময় চুপ ক'রে থেকে শক্তি-সংগ্রহ করতে হয়। তার মধ্যেও আবার মন্ত্রগুপ্তি চাই। তবে যাজনের প্রয়োজন আছে সব সময়। অন্যায়টা যে কেন অন্যায় সেটা তার উপর ফেলে সে যা'তে বুঝতে পারে, তেমনভাবে কথাবার্ত্তা বলতে হয়। হয়তো বলছি নিজের উদাহরণ দিয়ে, তা'তে সে চটে না। কিন্তু বুঝতে পারে। অনেক সময় উপযুক্ত সুযোগের জন্য অপেক্ষা করা লাগে। কিন্তু যখন বোঝা যায় যে, বাধা না দিলে অত্যন্ত ক্ষতিকর

হবে, আশু বিপদ ঘটবে, তখন বাধা দেওয়াই লাগে। আর, সে-বাধাটা দিতে হয় ভীমঝঞ্ঝার মতো ক'রে। যেখানে প্রচণ্ডভাবে বাধা দেওয়া দরকার, সেখানে তা' না ক'রে যদি feeble protest (মৃদু প্রতিবাদ) করা যায়, তা'তে কাজ খারাপ হয়। অনেক বাড়ীতে দেখা যায়, বাপ-মা বা অভিভাবক যারা, তারা ছেলেপেলেদের হরদম নিষেধ করছে ও আদেশ দিচ্ছে, কিন্তু ছেলেপেলেরা তা' মানছে না, এতে না-মানাটাকেই পাকা-পোক্ত ক'রে দেওয়া হয়। সোজাসুজি নিষেধ বা আদেশ যথাসম্ভব কম করতে হয়, আর করলেও এমনভাবে করতে হয় যা'তে তা' পালন করেই। বলতে হয় এমন ক'রে, যা'তে বুঝটা ফুটে ওঠে এবং করতে আগ্রহ হয়।

বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য) এসে দাঁড়াতে জিজ্ঞাসা করলেন—তেলাকুচোর গুণ কী বীরেনদা?

বীরেনদা বললেন—বই দেখে আসি।

বই নিয়ে এসে পড়লেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মনে রাখেন যেন। ঐ জায়গাটায় বরং একটা কাগজ দিয়ে রাখেন।.........দ্যাখেন বীরেনদা! আজকাল টি-বি রোগ খুব বেড়ে যাচ্ছে। স্কিজোমাইসেটিন যে বের করা হয়েছিল, ওটার উপর আর work (কাজ) করা হ'লো না। আমার মনে হয়, স্কিজোটা improve (উন্নত) করতে পারলে টি-বি-র একটা প্রতিবিধান হ'তো। আমার মাথায় যা' আসে, সেই অনুযায়ী research (গবেষণা) করতে পারে এমন লোকেরই তো অভাব। বিশ্ববিজ্ঞান আমার বড় সাধের জিনিস, কিন্তু লোকের অভাবে আজ তা' তালাবন্ধ হ'য়ে আছে। কেষ্টদা একা ক'দিক সামলাবে? গোপালের স্থান আর পূরণ হ'লো না, পূরণ হবে কিনা তা'ও জানি না। দ্যাখেন, আজকাল আপনারা কতলোক দীক্ষা দিচ্ছেন, কিন্তু তার বেশীর ভাগই বাজারী। রামদাস যে চতুর লোকের কথা বলেছেন, সে চতুর লোক আর জোগাড় হ'চ্ছে না। চতুর মানে চারচোখা মানুষ, চৌকষ মানুষ। ধর্ম্ম বলতে আমি যে সর্ব্বতোমুখী সঙ্গতিশীল কেন্দ্রানুগ কর্ম্মময় সার্থক জীবনের কথা বলি, তা' অনেকেরই মাথায় ধরে না। ভাবে, আমাকে দিয়ে পরকালের পথ ক'রে নেবে। কিন্তু পরিবার, দেশ, সমাজ, জাতি ও জগৎকে যে আদর্শ-অনুযায়ী ভিতরে-বাইরে সব দিক দিয়ে গ'ড়ে তুলে উন্নত ও সমৃদ্ধ ক'রে দুনিয়াটাকেই স্বর্গ ক'রে তুলবে, সে-কথা আর ভাবে না।

বীরেনদা—আপনার কাছে এত শোনা ও আপনাকে এত দেখা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে সে-সংকল্প জাগে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক-একজনের এক-এক obsession (অভিভূতি) থাকে, সে তা'তেই আটকে থাকে। তাই দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না। আবার, আলস্য আমাদের অত্যন্ত প্রিয়। ওর জন্য যতখানি খাটুনি প্রয়োজন, তা' আমরা

খাটতে চাই না। খাঁটি মানুষ যারা তারা ইষ্টের মুখ চেয়ে সবার মঙ্গলের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রেই আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ লাভ করে, তা' না ক'রেই তারা তৃপ্তি পায় না, আর এই যে করে, এর পিছনে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের ধান্ধা থাকে না। এই করাই তাদের স্বভাব। অমনতর মানুষ জন্মায়, ঘসেমেজে করা যায় না।

এরপর সুধামা আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে বললেন—সুধা নাকি?

সুধামা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টদা কী করে?

সুধামা—খেয়ে-দেয়ে গল্প করছেন। ডাকব নাকি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, এমনিই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

অনুমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—কি রে, নিবারণের চিঠি পাইছিস নাকি?

অনুমা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী লিখিছে?

অনুমা—লিখেছেন, কাজকর্ম্ম ভালই হ'চ্ছে। তবে ৩০০ টাকা ক'রে সংগ্রহ করার ব্যাপারে বেশী সুবিধা করতে পারছেন না, তাই একটু মন খারাপ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল ক'রে চেতায়ে লিখে দে।

অনুমা—আমি তো লিখবই। আর আপনার এখান থেকেও যদি কেউ উৎসাহ দিয়ে চিঠি দেন, তাহ'লেও ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—তোর চিঠির কাছে আর কারও চিঠি লাগবে না। এ বাবা, খোদের চিঠি।

উপস্থিত সকলে হাসতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্যি! স্ত্রী যদি স্বামীকে ইষ্টকর্ম্মে প্রেরণা দেয়, তা'তে সে যতখানি উৎসাহ বোধ করে, অন্য কিছুতে অমন কমই ক'রে থাকে। নিবারণ হয়তো বাইরে বেশ কাজকাম করছে, এখন অনু যদি অভাব, অভিযোগ, দুঃখ-কষ্টের কথা জানিয়ে চিঠি দেয়, তাহ'লে নিবারণ কিন্তু সে-চিঠি পেয়ে flat (চিৎ) হ'য়ে পড়বে। তখন তার জেল্লা থাকবে না। কিন্তু আশা, ভরসা, স্ফূর্ত্তি দিয়ে যদি চিঠি দেয়, সে-চিঠি পেয়ে আরো উদ্দাম হ'য়ে উঠবে। মেয়েদের সব সময় বুদ্ধি রাখা লাগে, স্বামীকে আরো বড় ক'রে তুলবে কিভাবে, তাকে টেনে নাবালে কিন্তু দুঃখ ঘুচবে না। বাস্তব দুঃখকষ্ট থাকলেও তা' হাসিমুখে স'য়ে নিতে হয়।

অনুমা—ছেলেপেলের কষ্ট দেখলে তখন মন খারাপ হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেলেপেলের কষ্টের লাঘব হবে তো স্বামীর কর্ম্মশক্তির স্ফুরণের ভিতর-দিয়ে। তাই কষ্টের কামড় স'য়েও স্বামীর যা'তে যোগ্যতা বাড়ে, কৃতিত্ব বাড়ে, সেই চেষ্টা করতে হয়। এতে বরাবর কষ্ট করা লাগে না। আর, আশু কষ্টের হাত থেকে রেহাই পেতে গিয়ে স্বামীকে যদি ব্যতিব্যস্ত কর,

ফুটতে সুযোগ না দাও, তবে ছেলেপেলের কষ্টকেই কায়েম ক'রে তোলা হবে। ....আরে পাগল! আমি কই অতো ঘাবড়াস ক্যান্? একটা ঋত্বিক্ কি যে-সে জিনিস? সে হ'লো uncrowned king (মুকুটবিহীন রাজা), কারণ, সে হ'লো মানুষের রাজা। যার তফিলে ঋত্বিকতার চরিত্র থাকে, যার তফিলে মানুষ থাকে, তার কি কোনদিন অভাব থাকে। আর অভাব-বোধে পীড়িত বোধ করাটাই একটা অলক্ষুণে ব্যাপার। অভাব মানেই ভাব না থাকা। কাউতে ভাব থাকলে, তা'তে মানুষের মন এতখানিই ভরা থাকে যে, প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব বা অসুবিধা থাকলেও তা' তার মনকে অধিকার ক'রে বসতে পারে না। সন্তোষও থাকে তার প্রচুর। বুনো রামনাথের কথা শুনেছিস তো? এক রাজা তাকে বেশ কিছু দেবেন ব'লে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন, আপনার কি কিছু অনুপপত্তি আছে? তিনি ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা করেন, তা'তে তিনি এতই তন্ময় যে তাকে যে সাংসারিক অভাব-অভিযোগের কথা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, তা' তিনি ধারণাই করতে পারেননি। তিনি বললেন— 'আমার কাছে তো তেমন কোন অমীমাংসিত সমস্যা নেই।' যতভাবেই জিজ্ঞাসা করা হ'চ্ছে, তিনি ঐভাবে জবাব দিয়ে চলেছেন। পরে যখন খোলাখুলি ভাবে সাংসারিক অভাব-অভিযোগের কথা জিজ্ঞাসা করা হ'লো তিনি হেসে বললেন— 'না, আমার কিছুরই অভাব নেই। আমার ক্ষেতে কিছু ধান হয়, আর ঐ যে আমার বাড়ীর সামনে তেঁতুল গাছ দেখছেন, ওর পাতা দিয়ে আমার স্ত্রী ঝোল রান্না ক'রে দেন, আমি মহাপরিতোষ সহকারে নিত্য সেই অন্নব্যঞ্জন ভোজন করি।' সব কথা আমার মনে নেই। আমি ওদের কাছে শুনেছি,............তাই দেখ, নেশা থাকলে কেমন হয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেয়ে ওখান থেকে উঠে পড়লেন।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৪৯ (ইং ৬।৬।৪২)

বিকালের দিকে শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রম-প্রাঙ্গণে বাবলাতলায় একখানি বেঞ্চে বসেছেন। দাদা ও মায়েদের মধ্যে অনেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সমবেত হয়েছেন। একটি আনন্দঘন পরিমন্ডল রচনা হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকেই নানা জনের কাছ থেকে নানাবিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন। বীরেনদার কাজে জিজ্ঞাসা করলেন—লিভারের জন্য যে ওষুধটা করতে বলেছিলাম, সেটা ক'রে কাউকে খাওয়ায়ে দেখিছেন নাকি?

বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য)—গাছগাছড়া যা' দরকার, এখনও সব জোগাড় করতে পারিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাড়াতাড়ি জোগাড় ক'রে ফেলেন। যে-কাজ করবেন ব'লে

মাথায় নেবেন, তা' করতে দেরী করবেন না, ফেলে রাখবেন না। ওতে nerve-এর (স্নায়ুর) co-ordination (সঙ্গতি) নষ্ট হ'য়ে যাবে। এই co-ordination (সঙ্গতি) ভাঙ্গলে, progress (উন্নতি)-ও খতম হ'য়ে আসে।

উমাদা (বাগচী)—কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুভচিন্তা-অনুযায়ী কর্ম্ম যতটুকু করা যায়, ততটুকুই মানুষের শক্তি বাড়ে। কাজ না করলে শক্তি বাড়ে না।

উমাদা—শুভচিন্তাটারও তো একটা মূল্য আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিষ্ক্রিয় শুভচিন্তা একটা বিলাস হ'তে পারে, কিন্তু ওতে কোন লাভ হয় না, বরং অভ্যাস খারাপ হ'য়ে যায়। ভগবান আমাদের যেমন চিন্তাশক্তি দিয়েছেন তেমনি কর্ম্মশক্তি দিয়েছেন। তিনি চান না যে আমরা একটাকে পঙ্গু ক'রে রেখে আর একটাকে বাড়িয়ে তুলি। আবার, একটাকে পঙ্গু ক'রে রাখলে আর একটাও পঙ্গু হ'য়ে উঠতে চায়। শুভচিন্তা অনুযায়ী কাজ করলে চিন্তা-শক্তিও বৃদ্ধি পায়। শুধু চিন্তা নিয়ে থাকলে চিন্তার মধ্যেও আড়ষ্টতা এসে যায়, তার মধ্যে নূতনত্ব বা উপভোগ থাকে না। ধর, তুমি একখানি ছবি আঁকবা, এ সম্বন্ধে যদি শুধু মাথায় plan (পরিকল্পনা) আঁট, অথচ তাকে বাস্তবে রূপ না দাও, তবে তুমি ঠাওরই পাবে না, তোমার চিন্তার মধ্যে ত্রুটি কোথায় আর তার improvement (উন্নতি)-ই বা কী হ'তে পারে। সব কাজ সম্বন্ধেই এই কথা। ধর, তুমি চিঠি লেখ। একটা চিঠির উত্তর দেওয়া সম্বন্ধে তুমি যত সুন্দর-সুন্দর কথাই ভেবে রাখ না কেন, সেগুলি বাস্তবে না লেখা পর্য্যন্ত কিন্তু ঠিক পাবে না, আরো ভাল ক'রে চিঠিটা লেখা যায় কি ক'রে। কাজ আমাদের মাথাকেও সাফ করে। তাই চিন্তা ও কাজ দুই-ই চাই। সেই জন্য আছে যজন, যাজন।

উমাদা—আশ্রমে নিজেদের মধ্যে যাজন করব কাকে? এখানে প্রত্যেকেই তো আপনার কথা জানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাজন সর্ব্বত্র করতে হয়। পরিবারে-পরিবারে যাজন সব চেয়ে বেশী দরকার। যাজন মানে তো উপদেশ দেওয়া নয়। ইষ্টকে ভালবাসলে সব ব্যাপারেই সহজভাবে ইষ্টের কথা এসে পড়ে। ইষ্টপ্রসঙ্গই যাজন। লক্ষ্য রাখতে হয়, পরিবার-পরিবেশের প্রত্যেকেই যা'তে ইষ্টকে জীবনে মুখ্য ক'রে নিজের কর্ম্মনিঃসৃত ফল দিয়ে তাঁকে তুষ্ট, তৃপ্ত ও নন্দিত ক'রে তুলতে চেষ্টা করে। এই active urge (সক্রিয় আকূতি)-ই হ'লো আনন্দ ও উপভোগের প্রাণ। সব সময়ই নিজে ঐ উদগ্র আগ্রহ নিয়ে চলতে হয় ও পরিবেশকেও ঐ ভাবে ভাবিত ক'রে তুলতে হয়। নিজেকে সন্দীপ্ত রাখার জন্যই যাজন প্রয়োজন। সবকিছুর মধ্যে তাঁকে নিয়ে যদি ব্যাপৃত না থাকি, তবে জীবনটা কাটাব কী নিয়ে? তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লেই অশান্তি, জ্বালা-যন্ত্রণা। আমি তাই কই

তোমরা ঘর, সংসার সব কর, কিন্তু তাঁকে নিয়ে, তাঁর জন্য। তাঁর জন্য জীবন, তাঁর জন্য সংসার, তাঁর জন্য সমাজ হ'লে যাজন স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে। অনুরাগ থাকলে যাজনমুখরতা ফুটে উঠবেই। আর বাইরে থেকে দীক্ষিত, অদীক্ষিত যারাই আসুক, তাদের সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপ-আলোচনা করা লাগে। আশ্রম থেকে ঘুরে গেলে একটা মানুষ যদি নূতন জীবন না পায়, তাহ'লে তোমরা করলে কী? ছোট হোক, বড় হোক, যেই আসুক, তাকে যথাযোগ্য আদর-আপ্যায়ন করতে হয়। তোমাদের ব্যবহারে যেন প্রত্যেকের প্রাণ ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়। নিজে থেকে আগ্রহ-সহকারে মানুষের কাছে এগিয়ে যেতে হয়, খোঁজ-খবর নিতে হয়, কথাবার্ত্তা বলতে হয়। এই অভ্যাস তোমাদের খুব কম। এতে তোমরাও বঞ্চিত হও, অন্যেও বঞ্চিত হয়। ফলকথা, মানুষকে আপন ক'রে নেবার সুযোগ কখনও হারাতে নেই। আবার, তোমরা কয়েকজন মিলে যদি আশ্রমের বাড়ী-বাড়ী যাও, ঘোরাফেরা কর, ঘরোয়াভাবে সেবা-সাহায্য, আলাপ-আলোচনা কর, তাহ'লে দেখবে, আশ্রমের মধ্যে একটা নূতন হাওয়া খেলতে থাকবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর লোচনাদাকে (ঘোষ) দিয়ে বঙ্কিমদাকে ডাকতে পাঠালেন।

বঙ্কিমদা (রায়) আসলে বললেন—হরেন কিংবা কাউকে পাবনায় পাঠিয়ে আমাকে একটা ওষুধ আনিয়ে দিবি।

বঙ্কিমদা—কী ওষুধ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্যারীর কাছ থেকে শুনে নে। তাড়াতাড়ি আনিয়ে দে। একজনকে দেওয়া লাগবে আমার। সে আবার খুব অভিমানী মানুষ। পেতে যদি একটু দেরী হয়, তাহ'লে মন খারাপ হ'য়ে যাবে। মুখে কিছু বলবে না, কিন্তু ভিতরে অসন্তুষ্ট হবে।

বঙ্কিমদা—গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে আপনি দেবেনও, আপনার কাছ থেকে নেবেও, আবার আপনার উপর অভিমান করবে। এ বড় বিচিত্র ব্যাপার!

শ্রীশ্রীঠাকুর—অভিমান মানেই হ'চ্ছে নিজের ওজনকে বড় ক'রে ভাবা। ভালবাসতে যারা জানে না, আত্মপ্রীতিই যাদের সম্বল, তারা অভিমান নিয়েই থাকে। যে যা' নিয়েই থাক, আমি ভাবি—বাঁচাটা তার অব্যাহত থাক, আমার করণীয়ে যেন কোন ত্রুটি না থাকে। তারপর তার যদি কোন দিন মর্জ্জি হয়, সে যদি ভালবাসতে শেখে, শিখুক। আর না শেখে যদি, আমিই বা কী করতে পারি, আর তুমিই বা কী করতে পার? কিন্তু ভালবাসতে না শিখলে মানুষের ত্রাণ নাই। ভগবানই বল, গুরুই বল, পিতামাতাই বল, গুরুজনই বল, তাঁদের ভালবাসা যতই পাই না কেন তা'তে আমাদের কোন লাভ নেই, লাভ আছে—আমরা যদি তাঁদের ভালবাসি সেই ভালবাসায়। মানুষ এই সহজ কথাটা বোঝে না। সেবা করতে চায় না, সেবা পেতে চায়।

এরপর বঙ্কিমদা চ'লে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর উমাদার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কথকতা শুনতে তোর কেমন লাগে রে?

উমাদা—খুব ভাল।

অক্ষয়দা (দেব), সনৎদা (ঘোষ) প্রভৃতির কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনাদের কেমন লাগে?

প্রত্যেকেই একবাক্যে বললেন—খুব ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পৌরাণিক কাহিনীগুলির মধ্যে যে-সব বাজে মাল ঢুকে গেছে সেগুলি সাফ ক'রে নিয়ে rational way-তে (যুক্তিসঙ্গতভাবে) পুরাতন ঐতিহ্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে কথকতা জিনিসটা যদি নূতন ক'রে ঢেলে সাজায়ে নেওয়া যায়, তবে ওর ভিতর-দিয়ে লোকশিক্ষার খুব সুব্যবস্থা হ'তে পারে। মানুষ গল্প-পিয়াসী, মানুষ আড্ডাপ্রিয়। এই রকমগুলিকে ইষ্ট ও কৃষ্টি-প্রতিষ্ঠার কাজে লাগাতে হবে। পঞ্চাননদার মতো মানুষ যদি এই কাজে হাত দেয়, তাহ'লে বোধ হয় ভাল পারে। সংস্কৃত জানে, গল্পও জমিয়ে তুলতে পারে, গান জানে আবার আপন তালে নাচেও, লাগলে পাগল ক'রে দিতে পারে। তবে এ নিয়ে লেগে থাকা লাগে। দু'দিন করলাম, তারপর বন্ধ ক'রে দিলাম, তা'তে হয় না। আশ্রমে এক-একজন এক বা একাধিক বিষয় নিয়ে যাগ-প্রদীপ জ্বালায়ে যদি ব'সে থাকে, তবে বাইরে থেকে যারা আসবে, তাদের যার যে-বিষয়ে interest (অনুরাগ) আছে, সে সেইদিকে ভিড়ে পড়তে পারে। আশ্রমটাকে ক'রে রাখতে ইচ্ছা করে একটা বুড়ীর হাঁড়ির মতো ক'রে। সব মাল-মসলা মজুত থাকবে, যা' চাও তাই পাবে। আমার মাঝে-মাঝে ভয় হয়, যেমন যুদ্ধ-বিগ্রহের হিড়িক, কত রকম ইজিমের ছড়াছড়ি, তারপর আবার প্রতিলোমের যাজন—বুঝি বা আমাদের সম্পদ্ সব লোপ পেয়ে যায়। তাই প্রাচীন ও বর্ত্তমান যা'-কিছু জীবনীয়, তা' ধ'রে রাখতে ইচ্ছা করে। রূপটা যদি ঠিক থাকে, এ বন্যার মধ্যেও যদি টিকে থাকে, তবে চারাতে পারবও। ব'সে-ব'সে পাগলের মতো একলা-একলা কত কথাই যে ভাবি তার ঠিক নেই।

ইন্দুদা (বসু)—কথকতার ভিতর-দিয়ে যাজন খুব ভাল হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-কথা আর কও কেন? মানুষকে পাগল ক'রে দেওয়া যায়। তোমরা লাগই না যে।.........কথকতার ভিতর-দিয়ে যে শুধু পুরাণ ও শাস্ত্রতত্ত্ব ব্যাখ্যা হবে, তা' কিন্তু আমি চাই না। আমার ইচ্ছা করে যে, প্রসঙ্গক্রমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব বিষয়ই কথকতার ভিতর-দিয়ে পরিবেষণ করা হবে। তোমরা পড়াবার সময় যদি ঐরকম কর, তাহ'লে দেখবে, ছাত্রদের মাথা খুলে যাবে। একটা বিষয় পড়াতে গিয়ে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু বিষয় শিখিয়ে দিতে পার। ধর, ইতিহাস পড়াচ্ছ, সেই প্রসঙ্গে ভূগোল, অঙ্ক, বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাজনীতি,

অর্থনীতি সবই আমদানী করতে পার।

ইন্দুদা—এক তো আমরা জানিই না অতো বিষয়, অন্ততঃ আমি তো জানি না, আর জানলেও একসঙ্গে অতো বিষয়ের অবতারণা করতে গেলে ছেলেদের মাথায়ও ঢুকবে না, আর পাঠ্য বিষয়ও পড়িয়ে শেষ করা যাবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও তোমাদের ভুল ধারণা। ছেলেদের কাছে ছেলেদের মতো করেই পরিবেষণ করতে হবে, যা'তে তাদের মাথায় ধরে। কোথায় কতটুকু বলতে হবে, তারও মাত্রাজ্ঞান চাই। একটা বিষয়কে বিভিন্ন দিক থেকে যদি দেখতে ও দেখাতে পার, তবে সে-বিষয় সম্বন্ধে তার যে জ্ঞানটা হবে সে জ্ঞানটা হবে পাকা। সেটাকে বইয়ের বিষয়, পড়ার বিষয় ও পরীক্ষার বিষয় হিসাবে না ভেবে সে নিজের জীবনের বিষয় হিসাবে দেখতে শিখবে। কইতে জানলে এর ভিতর দিয়ে হুড়হুড় ক'রে আগায়ে যাওয়া যায়। ছেলেদের মাথা যত চাঙ্গা ক'রে তুলতে পারবা, তত দেখবা—তারা নিতান্ত কম বোঝে না, তাদের মাথায় নিতান্ত কম ধরে না। কিন্তু তাদের ভিতর ঢুকতে হবে তাদের জীবনের দরজা দিয়ে।

একটি দাদা আসামে মিলিটারীতে কাজ করেন, তিনি আশ্রমে এসেছেন, এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে আসলেন। যুদ্ধের পরিণতি কী হ'তে পারে সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারা জিতবে, কারা হারবে, তা কি আর আমি বলতে পারি? সে-সব ব্যাপার বরং তোরা বুঝিস। কিন্তু রকম দেখে মনে হয়, এর জের আরো অনেকদিন চলবে। ক্ষয়ক্ষতিও ঢের হবে। তার ভিতর-দিয়ে যদি মানুষ শিক্ষালাভ করে, তাদের চিন্তাধারা যদি বদলায়, তাহ'লেও একটা মানে হয়। মানুষের মধ্যে যত সময় ধর্ম্মবোধ জাগ্রত না হয়, তত সময় তার নিস্তার নাই। আর, ধর্ম্মবোধের মূল কথা হ'চ্ছে, অন্যের বাঁচা-বাড়ার সহায়তা করা, ওটা না করলে নিজের বাঁচা-বাড়াই টিকবে না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর দাদাটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই যেখানে থাকিস, সেখানে কমলার মধু পাওয়া যায় না?

দাদাটি বললেন—পাওয়া যায়, কিন্তু শীতকালে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সামনের শীতকাল পর্য্যন্ত যদি ওখানে থাকিস, কিছু কমলার মধু জোগাড় ক'রে পাঠাস তো।

দাদাটি আগ্রহ-সহকারে বললেন—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পাঠাব।

সৈন্য-বিভাগের রীতিনীতি, আইন-কানুন, আহার-বিহার, শিক্ষা, কাজকর্ম্ম, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি সম্বন্ধে রকমারি প্রশ্ন ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেক কথা শুনলেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বেড়াতে বেরুলেন।

কেষ্টদা তাঁর বাড়ীর পাশে একটা কৃষিক্ষেত করেছেন, নিজে হাতে-কলমে সেখানে কৃষি করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর হাঁটতে-হাঁটতে সেই বাগানের দিকে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখে কেষ্টদা হাতে-মাটিমাখা অবস্থায় বেরিয়ে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার কাজের ক্ষতি করলাম নাকি?

কেষ্টদা—ক্ষতি আবার কী? সখ ক'রে করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, করা খুব ভাল। কৃষি-সম্বন্ধে লাখ বক্তৃতা করার থেকে এই যে নিজ হাতে করছেন, এর দাম ঢের বেশী। আচার্য্য মানেই এই। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যা' আচরণ করে, সেই আচরণই একটা মর্য্যাদালাভ করে, আর তা' চারিয়ে যেতে দেরী হয় না। ঋত্বিক্‌রা field-এ (কর্ম্মক্ষেত্রে) যেয়ে মানুষের ক্ষেত-খামারে নামে' নিজেরা যদি একটু কাজকাম করে, তা'তে কিন্তু মানুষে খুব উৎসাহ পায়। ঋত্বিক্ কেবল দেখবে, কেবল শিখবে, কেবল করবে, কেবল করাবে। একটা অফুরন্ত উৎসবের উপর রেখে দেবে মানুষগুলিকে।

কেষ্টদা ইতিমধ্যে হাত ধুয়ে নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যাবেন নাকি?

কেষ্টদা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

এইবার সবাই মিলে বেরিয়ে পড়লেন। বেলা প'ড়ে এসেছে, তবে গরমের দিন, তাই এখনও বেশ রোদ আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর গ্রামের পথ বেয়ে অগ্রসর হলেন। যেতে-যেতে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এক-একজনের সঙ্গে একটু ক'রে কথা ব'লে নিচ্ছেন। মাসীমার বাড়ীর দরজায় এস ডাক দিলেন—ভেল্কুর মা! কী কর?

মাসিমা ও ভেল্কু উভয়েই দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—বসবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন না, একটু হে'টে আসি।

বড়দার বাড়ীর পাশে এসে তাঁর খোঁজ নিলেন। বড়দার শরীর তত ভাল ছিল না। বড়দা বেরিয়ে আসতেই বললেন—তুই বেশী নড়াচড়া করিস না। এখন শরীর কেমন?

বড়দা হাসিমুখে বললেন—এখন অনেক ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্যিই ভাল, না, আমাকে খুশি করবার জন্য ভাল কচ্ছিস?

বড়দা—সত্যিই ভাল। গা-ব্যথা, মাথা-ব্যথা ঢের ক'মে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য একখানা চেয়ার আনালেন বড়দা, কিন্তু তিনি না ব'সেই আবার রওনা দিলেন। যেতে-যেতে কেষ্টদার দিকে চেয়ে বলছেন—বড়বৌ, বড়খোকা, মণি এদের সবারই লক্ষ্য হ'লো আমাকে নিরুদ্বিগ্ন রাখা। কষ্টের মধ্যে থাকলেও বলবে—বেশ আছি। আর কষ্টও এদের উপর দিয়ে কম যায়নি।

কেষ্টদা—হ্যাঁ, বড়খোকার তো এখনও বেশ অসুবিধার ভিতর-দিয়ে চলতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি একেবারে public property (সাধারণের সম্পত্তি)

হ'য়ে গিছি। সবাইকে নিয়ে বিব্রত থাকি, ব্যাপৃত থাকি, কিন্তু ওদের যে একটু খোঁজখবর রাখব, তা' আর হ'য়ে ওঠে না। বড়খোকার শুনি খুব লোকপালী স্বভাব। নিজের ঘরে খাবার থাক বা না থাক, ওর আওতায় যে-সব লোক আছে, তাদের কাউকে কষ্ট পেতে দেবে না। আগে তাদের ব্যবস্থা করবে, তারপর সংসারের। ছেলেপেলেগুলিও বেশ কষ্টসহিষ্ণু, কোন বাহানা নেই।

বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য)—ওদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটা বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। বেশ বোঝা যায়,—সাধারণ থেকে স্বতন্ত্র। সমবয়সী ছেলেদের উপর অশোকের যে আধিপত্য, তা' দেখে মনে হয়—ও যেন born-leader (জন্মগতভাবে নেতা)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হওয়াই স্বাভাবিক।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাঁটতে-হাঁটতে কেমিক্যাল-ওয়ার্কস্-এর কাছে আসলেন। কমলদা (ভট্টাচার্য্য) একখানা চেয়ার এনে দিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর কেমিক্যালের মাঠে বসলেন।

ব'সে বললেন—বিমলদাও শুনিছি বাগান করার উপর খুব জোর দিচ্ছে।

কেষ্টদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার কেমন লাগে এ-কাজ?

কেষ্টদা—ভালই লাগে। নিজ হাতে কিছু করতে পারলে একটা আত্মপ্রসাদ হয়। বিভিন্ন জেলায় যদি আমাদের কতকগুলি ভাল branch (শাখা) হয় এবং সেই সমস্ত জায়গায় যদি কৃষিস্থান, তপোবন, শিল্প-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি করা যায়, তাহ'লে আপনার ইচ্ছেটা তাড়াতাড়ি চারিয়ে যায়। আজকাল কৃষকদের মধ্যে যে-সব movement (আন্দোলন) করে, তা'তে তাদের যোগ্যতা বাড়াতে চেষ্টা করে না, বরং তাদের ক্ষেপিয়ে তুলে যতটুকু কর্ম্মক্ষমতা আছে, তা'ও নষ্ট ক'রে ফেলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষকে যদি কেবল পরের দোষ দেখতে শেখান যায়, তা'তে কখনও ভাল হয় না। দোষ দেখতে হয় তো সে নিজের। আমি যদি খেতে না পাই, সে-দোষ আমার এবং আমার ক্ষমতা বাড়িয়ে তার প্রতিকার করতে হবে—এমনটা ভাবাই ভাল।

কেষ্টদা—ওরা এইখানে জমিদারের শোষণের কথা বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কই, আমি যদি নিজেকে শোষিত হ'তে দিই, সেও তো আমার দোষ। আর দ্যাখেন, আজকাল ধুয়ো উঠেছে শোষণ, শোষণ। জমিদাররা প্রজাদের পোষণ কতখানি যে করে, সে কথা আমরা কই না। আমাদের মধ্যে আছে বিরোধের বিলাস, তাই বেছে-বেছে ঐগুলিই কই। কিন্তু বাস্তব করা তাদের যে কতখানি আছে, সেটা চোখ এড়িয়ে যায়। যেখানে মিল আছে, সেখানে মিলটাকে ignore (উপেক্ষা) ক'রে বিরোধের কথা বড় ক'রে

বলা আমার ভাল লাগে না। ওতে আপন মানুষকে পর ক'রে দেওয়া হয়। জমিদারের প্রজার জন্য বুক দিয়ে করা, প্রজার জমিদারের জন্য আপ্রাণ করা—এসব দৃষ্টান্ত ও ঘটনার অভাব নেই। আপনারা সেইসব ঘটনা খুঁজে বের করেন। যা'তে মিল হয় তাই করেন। প্রত্যেককে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে কোন লাভ হবে না। এতে শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাবে, সবাই লোকসানের ভাগী হ'য়ে গেছে। কারও কেউ নেই। আজকাল আবার হিন্দুদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ভেদবুদ্ধি জাগানর খুব চেষ্টা চলেছে। বৈশ্য ও তপশীলী জাতিদের মধ্যে প্রচার করা হয়—বামুন, কায়স্থরা তোমাদের ঘৃণা করে, তোমাদের উপর অবিচার করে, তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে তোমাদের। কতরকম গরম-গরম বক্তৃতা যে দেয়, তার কি কোন ঠিক আছে? এতে যে শ্রদ্ধাপ্রীতি নষ্ট হ'য়ে সমাজ খান-খান হ'য়ে ভাঙ্গতে বসে, তা' আর বোঝে না।...........ঘৃণা কোথায় দেখলো তা'ও বুঝি না। খাতির তো কারও নিতান্ত কম ছিল না। বাড়ীর চাকর, সেও যদি বেশী বয়স্ক হ'তো, তাও তো তাকে দাদা, কাকা—এইরকম একটা কিছু ব'লে ডাকা লাগতো।

মিলিটারী দাদাটি সঙ্গে ছিলেন। তিনি বললেন—ঘৃণা ও দুর্ব্ব্যবহার অনেক জায়গায় ছিল এবং এখনও দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, সাধারণতঃ পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাবই ছিল প্রবল, এখন propaganda (প্রচার) ক'রে এইটে বোঝান হয়েছে যে, উচ্চতর বর্ণে'রা ঘোর অপরাধী। এর ফলে তারাও rigid (শক্ত) হয়েছে। তাই, আগের সম্পর্ক এখন আর নেই। ভুল বা অন্যায় যে কিছু হয়নি, আমি সে-কথা বলতে পারি না। কিন্তু সেটা বিকৃতি। বর্ণবিধানের উদ্দেশ্য ভুলে যেয়ে তার বিকৃতির দিকটার উপর যদি আমরা জোর দিই, তাহ'লে তো আমরা লাভবান হব না।

উক্ত দাদা—বামুন যে, তার যদি বামুনের মতো চরিত্র না হয়, তবে তাকে বৈশ্য বা শূদ্র শ্রদ্ধা করতে যাবে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃত বামুন যে, সে কখনও কারও কাছ থেকে শ্রদ্ধা দাবী করে না। তার চরিত্র স্বতঃই মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। আবার শ্রদ্ধাবান যে তার সান্নিধ্যে কিন্তু অশ্রদ্ধার্হ ব্যক্তিও শ্রদ্ধালাভের যোগ্য হ'য়ে ওঠবার প্রেরণা পায়।

রাধারমণদা (জোয়ার্দ্দার)—কথাটা বুঝতে পারলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, তুমি বাইরে কোথাও গেছ। তুমি আশ্রমে অনেকদিন ধ'রে আছ শুনে কেউ যদি তোমার সঙ্গে খুব সশ্রদ্ধ ব্যবহার করে, তাহ'লে তোমারও তখন বুদ্ধি হবে, আমাকে যখন আশ্রমের লোক ব'লে এতখানি শ্রদ্ধা করে, আমিও এমনভাবে চলতে চেষ্টা করব যা'তে এদের শ্রদ্ধার সম্মান রাখতে পারি।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাক খেলেন। গ্রামের লোক ২।১ জন যাঁরা

ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের ডেকে কুশল প্রশ্নাদি করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—চুনীকে চিঠি দিছেন নাকি?

কেষ্টদা—হ্যাঁ।

প্রফুল্ল—কেষ্টদার চিঠিগুলি অত্যন্ত inspiring (উদ্দীপনাপূর্ণ) হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাইতো কেষ্টদাকে কই সবার কাছে চিঠিপত্র লিখতে।

কেষ্টদা—কর্ম্মীরা যে বাইরে থেকে চিঠিপত্র দেয়, দেখে বোঝা যায়, কাজ-সম্বন্ধে কার ধারণা কতখানি আছে এবং কে কতখানি করছে। অনেকের চিঠি দেখে মনে হয়, করণীয় সম্বন্ধে তাদের ধারণাই অস্পষ্ট, এবং কাজ যা' করছে তাও এলোমেলো। আবার, কেউ-কেউ কাজের ভিতটা পত্তন করে ভাল, সব দিকেই লক্ষ্য আছে, আর তাদের চিঠি থেকেও সেটা ধরা পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাজটা যার ধান্ধা হ'য়ে না ওঠে, ঐ-ই যার ধ্যান-জ্ঞান না হয়, তার মাথায় খেলে না। গান আছে—ভাবিলে ভাবের উদয় হয়। ঐ নিয়ে ভাবা লাগে। সেই অনুযায়ী করা লাগে, আর নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করা লাগে। কাজের পারম্পর্য্য সম্বন্ধে ধারণা চাই। তেস্‌রা চাষ আগে দিলে হবে না। আর, লোককে দিয়ে দেওয়াবার অভ্যাস খুব করতে হয়। যারাই দেয়, তাদেরই টান বাড়ে।

কেষ্টদা—প্রত্যাশা নিয়ে যদি দেয়, যদি ভাবে, ঠাকুরকে দিলে গ্রহদোষ খণ্ডন হবে, আর সেই বুদ্ধি থেকে দেয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওসব বুদ্ধি ভাল নয়, ওতে টান-গজানর পক্ষে অন্তরায়ই হ'য়ে ওঠে। তবে দিতে-দিতে, করতে-করতে একটা মমতা এসে পড়ে। শুধু ইষ্টকে দেওয়া নয়, পিতামাতা, গুরুজন, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব সকলকেই যা'তে মানুষ দিতে অভ্যস্ত হয়, তা' করা লাগে। দিতে-দিতে মানুষের দারিদ্র্য ঘুচে যায়।

সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। চারিদিকে বেশ একটা শান্তির আবেশ। সবাই ইষ্ট-সান্নিধ্যে ইষ্টচিন্তামগ্ন, নীরব।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু সময় পরে বললেন—আমার কিন্তু অজস্র কয়লা চাই। তার ব্যবস্থা আগে থেকে ক'রে রাখ। সবার সঙ্গে এমন ভাবসাব ক'রে রাখতে হয়, যে কিছুতেই আমার কাজ যেন suffer না করে (ক্ষতিগ্রস্ত না হয়)।

কেষ্টদা—প্রফুল্ল ও চুনী তো আসানসোলের দিকে যেতেই পারলো না। শরীর ভাল না থাকায় বর্দ্ধমান সহর থেকে অন্যদিকে চলে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Iron muscles and nerves of steel (লৌহের মতো পেশী ও ইস্পাতের মতো স্নায়ু) চাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর work (কাজ) করতে হবে unfatigued, untired (অক্লান্তভাবে)। 'নিরাশীর্নিম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ'। নিরাশী নির্ম্মম হ'য়ে struggle (সংগ্রাম)-কে enjoy (উপভোগ) করতে

শিখতে হবে। যাদের এই temperament ও liking (প্রকৃতি ও পছন্দ) আছে, ঐ ঠেলায় তাদের শরীরও ধীরে-ধীরে ভাল হ'য়ে ওঠে। যাদের চরিত্রে এটা নেই, যারা তথাকথিত peace-loving (শান্তিপ্রিয়), আবার মনে-মনে দ্বন্দ্বযুক্ত অর্থাৎ সংশয়ী, তা'ছাড়া শ্রমকুণ্ঠ, তাদের জন্য এ-কাজ নয়, তারা আসলেও টিকে থাকতে পারে না।............নেশা থাকলে মানুষ কাজ হাসিল না ক'রে সোয়াস্তি পায় না, আর সময় মতোই কাজ সমাধা করতে চেষ্টা করে। চলার রকমও তারা ধীরে-ধীরে এমন ক'রে তোলে, যা'তে অসুস্থ হয়ে পড়তে না হয়।

কেষ্টদা—আজকাল কর্ম্মীদের এমন বহু জায়গায় যেতে হ'চ্ছে যেখানে একজনও দীক্ষিত লোক নেই। সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায় যেয়ে কাজের পত্তন করার ভিতর-দিয়ে তাদের অনেকখানি experience (অভিজ্ঞতা) gain (অর্জ্জন) করার সুবিধা হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই তো ভাল। আর, নূতন জায়গায় যেয়ে অপরিচিত লোকের বাড়ী যদি অতিথি হ'তে হয়, তবে শ্রদ্ধেয়, গণ্যমান্য লোকের বাড়ীতে হওয়াই ভাল। তা'তে সহজেই সবার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে যাওয়া যায়। আপনাদের তো 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'—পরমপিতার আস্তানা ছড়ানই আছে, যেয়ে উঠলেই হ'লো। আর যেখানে যেয়ে উঠবেন, তাদেরই একেবারে মুগ্ধ ক'রে ফেলবেন ব্যবহার দিয়ে। কোথাও কারও বাড়ীতে গিয়ে থাকলে সব সময় লক্ষ্য রাখতে হয়—তাকে সংগ্রহ ক'রে কী এনে দেওয়া যায়। তার মর্য্যাদায় যাতে আঘাত না লাগে, এমনভাবে দিতে হয়। তার বাড়ীতে আপনার থাকাটাই সব দিক থেকে তার লাভের কারণ হ'য়ে দাঁড়ান চাই, সে যেন burden (ভার) ব'লে feel (বোধ) করার অবকাশ না পায়। আমি যখন কুষ্টিয়া যেতাম, যে-বাড়ীতে গিয়ে থাকতাম, সেখানে লোকে এত জিনিসপত্র নিয়ে আসতো যে রাখবার জায়গা হ'তো না।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৪৯ (ইং ৮।৬।৪২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের পিছন দিকে আশ্রম-প্রাঙ্গণে বাবলাতলায় একখানি বেঞ্চে ব'সে আছেন। অনেকেই সেখানে উপস্থিত আছেন। গরমের দিন, তাই ছায়ার মধ্যেও গরম লাগছে।

একটি মা তাঁর পুত্রবধূর দুর্ব্ব্যবহারের কথা বলছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একটু সময় শুনে বললেন—ও-সব কথা শুনলে আমার মন খারাপ হ'য়ে যায়। গুরুজনকে যদি ভক্তি না করে, তাহ'লে সুখী হবে কার আশীর্ব্বাদে?—তোমার আর কি? তুমি না হয় চোখ-কান বুজে স'য়ে যাবা। পরমপিতার কাছে ওদের মঙ্গলই প্রার্থনা করবা। কারণ, ওদের যদি কষ্ট হয়, সে তো তোমারই পাঁজরে যেয়েই লাগবে। কিন্তু ছেলেপেলেরা এই সব আচার, ব্যবহার তো দেখছে,

তাদের শিক্ষাটা কী হবে? আমি কেবল সেই কথাটাই ভাবি। তাদের পরকাল যে ঝরঝরে ক'রে দিচ্ছে। যাক, তুই মনে কোন দুঃখ করিস না। শাশুড়ী হিসাবে তুই দেখিস, তোর দিক দিয়ে কোন ত্রুটি না থাকে। বৌ খুব ভাল ব্যবহার করলে, তোর পক্ষে যেমনতর ব্যবহার স্বাভাবিক হ'তো, তাই করতে চেষ্টা করিস। এ সত্ত্বেও যদি দুর্ব্ব্যবহার করে, মনে করিস নেহাৎ তোর কর্ম্মফল।

মা-টি বললেন—যখন অকথা, কুকথা কয়, তখন আমারও মাথা ঠিক থাকে না, আমারও যা' মুখে আসে, ব'লে দিই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা'তে লাভ হবে না। তা'তে সে নিজের দুর্ব্ব্যবহার সম্বন্ধে অনুতপ্ত বা তোমার প্রতি শ্রদ্ধাবনত হবার সুযোগ পাবে না। সেই জন্য নিজের চলন খুব নিখুঁত রাখা লাগে। পরিবেশ যদি খুব খারাপ হয়, সেটা একদিক দিয়ে সুবিধে, খারাপের মধ্যে আমরা কতখানি ভাল থাকতে পারি, আর খারাপকে কতখানি ভাল ক'রে তুলতে পারি, সেইটেই তো আমাদের সাধনার পরখ।

ভবানীদা—ঐভাবে চললে নিজের পক্ষে ভাল হ'তে পারে কিন্তু কারও শাসন হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের উপর অতোখানি অধিকার থাকলে বরং শাসন করার ক্ষমতা হয়। কেউ যদি রেগে আত্মহারা হ'য়ে যায়, সে আবার শাসন করবে কি? যে নিজেকে শাসন করতে জানে, তার শাসনেই কাজ হয়।

পাবনার সিনেমা হলে 'পরিচয়' ব'লে একখানি বই চলছে। বইখানি বিয়োগান্তক। সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ আশা, ভরসা, উৎসাহ পায় যা'তে, যাত্রা, থিয়েটার, সিনেমার ভিতর-দিয়ে তাই দেখানই ভাল। বাঁচার খোরাক, উন্নতির খোরাক যত জোগান যায়, তাই ভাল। আর, দরকার আমাদের কৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। 'কৃষ্টি', 'কৃষ্টি' করে, কিন্তু কৃষ্টি বলতে যে কী বোঝায়, তা' অনেকেই জানে না। তাই লোক পেলে ও টাকা পেলে নানারকম বই লিখিয়ে ষ্টুডিও ক'রে, ফিল্ম তোলার ব্যবস্থা করতাম। যাজন চাই অত্যন্ত। তা'ছাড়া উপায় নেই।

কালীদা (সেন)—যাজনমূলক বই সব সময় চলে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাহিত্য বা নাটকের সঙ্গে যাজনের কোন অসঙ্গতি নেই। সাহিত্য ও নাটকের মধ্যে যে-ভাবে যাজন চলতে পারে, সেইভাবে যাজন করা লাগবে। ধর্ম্মরসের রসিক যে, তার যাজন বেখাপ্পা হয় না। যে রসের রসিক না, ভাবের ভাবুক না, সে তাল ঠিক রাখতে পারে না। উপদেশের আমদানী ক'রে ফেলে।

পশুপতি (বসু)—উপদেশের কি প্রয়োজন নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—উপদেশ দিতে গেলেও দিতে হবে পরম অন্তরঙ্গভাবে, উপদেশ

গ্রহণ করতে পারে এমনতর স্থান, কাল, পাত্র ও পরিস্থিতি সৃষ্টি ক'রে।

আসামের একটি দাদা আশ্রমে এসে সম্প্রতি উপনয়ন নিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তার দিকে চেয়ে বলছেন—বিধিমাফিক উপনয়ন নিলে চেহারার মধ্যে কেমন যেন একটা জ্যোতি খুলে যায়।

দাশুদার দিকে চেয়ে বললেন—তাই না?

দাশুদা (রায়)—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর উক্ত দাদাকে বললেন—উপনয়ন যখন নিছিস, খুব সদাচারে চলবি কিন্তু। কত পুরুষের ব্রাত্যদোষ খণ্ডন ক'রে আজ খাঁটি বৈশ্য হ'য়ে দাঁড়ালি, তোর বংশে এখন থেকেই যেন এই ধারা চলতি থাকে, এর যেন খেলাপ না হয়।

উক্ত দাদা—আপনার আশীর্ব্বাদ। আমাদের সমাজের মধ্যে আরো এর প্রচলন না করতে পারলে তো চলা মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর (জোরের সঙ্গে)—প্রচলন করবি ব'লেই তো নিছিস। ভাবিস ক্যান্? প্রচলন করাই লাগবি। এ তো inferiority-র (হীনম্মন্যতার) competition (প্রতিযোগিতা) নয়, এ হ'লো স্ববৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী আচার। এ না-করলেই যে ক্ষতি।.........আমাদের বিপ্র ঋত্বিক্‌দের মধ্যে উপযুক্ত কয়েকজন পৌরোহিত্যের কাজকর্ম্ম শিখে নেয়, তাহ'লে ভাল হয়। আমি গোসাঁইকে বলেছি, কয়েকজনকে ঠিক ক'রে দিতে।

উমাদা (বাগচী)—পুরোহিত বা আচার্য্য যদি আচারবান না হন তাহ'লে কিন্তু মানুষের শ্রদ্ধা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো নিশ্চয়ই। সে-দিক দিয়ে ঋত্বিক্‌দের মধ্যে বরং আচারবান লোক পাওয়া যাবে, আর তারা ব্যাপারটাও বোঝে।

আসামের দাদাটি বললেন—আমি সাধারণ গৃহস্থ মানুষ, ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে কায়ক্লেশে সংসার প্রতিপালন করি। কিভাবে চললে আমার সব দিক বজায় থাকে, যদি দয়া ক'রে ব'লে দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার যা'-কিছু করণীয়, সবই যদি নিষ্ঠার সঙ্গে, কৃতিত্বের সঙ্গে, যথাসময়ে, ক্ষিপ্রভাবে না কর, তাহ'লে কিন্তু হবে না। কোন কাজেই গাফিলতি করবা না—সে ব্যবসা-বাণিজ্যই হোক, ছেলেপেলে মানুষ করাই হোক, লোকলৌকিকতাই হোক। শুধু এইটুকু ভেবে চলবে, ঘরসংসার তোমার ইষ্টার্থে। সদ্ভাবে অর্থ যত উপায় করতে পার ততই ভাল। সদ্ভাবে বলতে আমি বুঝি, অন্যের বাঁচাকে বা স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ না ক'রে বরং পরিপুষ্ট ক'রে! অর্থ বেশী ক'রে উপার্জ্জন করতে বলছি ব'লে মনে ক'রো না, অর্থের উপর আসক্ত হ'তে বলছি। অর্থ হবে তোমার সেবাযজ্ঞের উপকরণ। গৃহস্থ হিসাবে ইষ্ট, পরিবেশ ও পরিবার সকলের প্রতিই তোমার দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ব যা'তে ভাল ক'রে

পালন করতে পার সেই জন্যই অর্থ। যত পার মানুষকে দেবে এবং সেটা শুধু অর্থ নয়,—স্নেহ, প্রীতি, সদ্ব্যবহার, সৌজন্য, প্রশংসা, অভয়, আশা, ভরসা, আশ্রয়। এক-একজন গৃহস্থ বহু মানুষের আশ্রয়স্থল যদি হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে আর ভাবনা থাকে না। তোমার পরিবারটা যদি দশ জন মানুষের হয়, তুমি মনে করবা, আমার পরিবারে পঁচিশ জন মানুষ, এবং পঁচিশ জনকে ভরণ-পোষণ দিতে গেলে যেভাবে প্রস্তুত হ'তে হয়, সেইভাবে প্রস্তুত হবা এবং তা' দিয়ে নিজের পরিবারের লোকের ভোগবিলাসের উপকরণ না বাড়িয়ে অন্যকে টানবা যতটা পার। তা'ও কাউকে সাহায্য দিয়ে পঙ্গু ক'রে দেবা না। সে আবার অন্যের জন্য যা'তে করে তা' দেখবা। এইভাবে যদি চল তাহ'লে দেখবা, তুমি যে তল্লাটে থাক, সে তল্লাটে আর অভাব থাকবে না।

শশধরদা (সরকার)—যার-যার নিজের সংসার ঠেকানই তো দায়, তারপর এত দায়িত্ব নেওয়া তো কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটাকে কঠিন ক'রে তুলিছ ব'লেই তো আজ সংসার চালান দায় হ'য়ে পড়িছে। মানুষ সংসারে ঢুকতোই নিত্য পঞ্চমহাযজ্ঞ করবার জন্য, তার মধ্যে কেউ বাদ পড়তো না। আর এই পঞ্চযজ্ঞ ছিল অবশ্যকরণীয়।

দুলালীমা—এই নিত্য পঞ্চমহাযজ্ঞ কী একটু ভাল ক'রে বলুন তো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথম হ'লো ঋষিযজ্ঞ বা ব্রহ্মযজ্ঞ। ঋষিরাই হলেন জ্ঞানবিজ্ঞানের উৎস। তাঁরা যে জ্ঞান দিয়ে গেছেন, তা' আয়ত্ত করতে হবে এবং অন্যকেও তা' আয়ত্ত করাতে হবে। একে বলে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা। আর, জীয়ন্ত ঋষি যিনি, সঙ্গ ও সেবায় তাঁকে তুষ্ট-পুষ্ট ক'রে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। এ সবই ঋষিযজ্ঞের মধ্যে পড়ে। তোমরা যে যজন-যাজন কর তা'ও প্রকারান্তরে ব্রহ্মযজ্ঞ। ব্রহ্মযজ্ঞ মানে, যার ভিতর-দিয়ে মানুষ বৃদ্ধি পায়। জ্ঞানের অনুশীলনের ভিতর-দিয়েই মানুষ বৃদ্ধি পায়। যে লোক সংসারে ঢুকে কেবল উদর-চিন্তা নিয়ে থাকে, জ্ঞান-আহরণের চেষ্টা করে না, তার উন্নতি খতম হ'য়ে যায়।

তারপর দেবযজ্ঞ। দেবতা মানে, যাঁরা নিজেদের চরিত্র, গুণপনা, ঐশীবিকাশ ও ভাবৈশ্বর্য্যের ভিতর-দিয়ে লোকসমক্ষে দেদীপ্যমান হ'য়ে আছেন। দেবযজ্ঞ মানে, ঐ দেবতাদের অনুধ্যান ক'রে তাঁদের ভাব নিজের ভিতর সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলা এবং বাস্তব উৎসর্গে তাঁদেরও পরিতুষ্ট করা। শাস্ত্রে আছে, "সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ"—অর্থাৎ সদ্‌গুরুর মধ্যে সমস্ত দেবতারই অধিষ্ঠান আছে। তাই ইষ্টচিন্তা, ইষ্টের ইচ্ছানুযায়ী নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করা, ইষ্টকে বাস্তব নিবেদন ইত্যাদি দেবযজ্ঞের মধ্যে পড়ে।

আবার আছে পিতৃযজ্ঞ। পিতৃপুরুষের দৌলতেই আমরা দুনিয়ার মুখ দেখি ও দুনিয়ায় ক'রে খাই। তাঁদের দয়া ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। তাঁদের দেওয়া রক্ত ও গুণপনার জোরেই আমরা চলি। তাই তাঁদের তৃপ্তি যা'তে হয়,

তা' আমাদের অবশ্যকরণীয়। পিতামাতা বে'চে থাকলে জীবন্ত গৃহদেবতা বোধে নিত্য তাঁদের সর্ব্বপ্রকারে সেবা করা উচিত। নয়তো নিত্য তর্পণ করার বিধি আছে। এতে পিতৃপুরুষের স্মরণ-মননের ভিতর-দিয়ে তাঁদের গুণগুলি আমাদের ভিতর সঞ্জীবিত থাকে। একটা আত্মপ্রসাদও লাভ করা যায়।

দারোগাদা—পরলোকগত পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করলে তাঁরা কি কোন তৃপ্তি পান? বিশেষতঃ তাঁরা যদি অন্য কোথাও জন্মগ্রহণ ক'রে থাকেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রদ্ধার সঙ্গে যার উদ্দেশ্যে যাই নিবেদন করা যাক না কেন, সূক্ষ্মভাবে হ'লেও তা' তাকে একটা তৃপ্তির জোগান দেয় ব'লেই আমার মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর টুলুমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—তোর ছাওয়াল কেমন রে?

টুলুমা—আজকাল একটু ভাল আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওকে সম্পূর্ণ ভাল ও মোটাসোটা ক'রে তুলতে পারিস তাহ'লে যে হয়!...........তোর ছাওয়াল কিন্তু খুব মাতৃভক্ত আছে।

টুলুমা—তা' আছে। এখন আপনার দয়ায় সুস্থদেহে বে'চেবর্ত্তে থাকলে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল ক'রে যত্ন করিস। পরমপিতার দয়া শক্তিমান হয় আমাদের করাকে আশ্রয় ক'রে।

দুলালীমা—পঞ্চযজ্ঞের আর দুটো তো বললেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (হেসে সবার দিকে চেয়ে বললেন)—ভবী ভুলবার নয়। তা' কী-কী বলিছি?

হরিপদদা—ঋষিযজ্ঞ বা ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর আছে নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ। অতিথি-সৎকার ও দুঃস্থ পরিবেশের বাস্তব সেবা-সাহায্যকে বলা যায় নৃযজ্ঞ। পরিবেশকে বাদ দিয়ে আমরা বাঁচতে পারি না, তাই তাদের সর্ব্বপ্রকার সেবা আমাদের করতে হবে। গৃহীর কর্ত্তব্য হ'লো আগে অতিথিকে খাইয়ে তারপর সে খাবে। অতিথিকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করার রীতি আছে আমাদের দেশে। কথা হ'চ্ছে, আমার দ্বারস্থ হ'য়ে কেউ যেন অভুক্ত না থাকে, বিমুখ না হয়, আমি ঘর বে'ধেছি সবার সেবার জন্য। ভূতযজ্ঞ বলতে ইতর জীবজন্তু থেকে আরম্ভ ক'রে গাছপালার পর্য্যন্ত সেবা করা বুঝায়। একটা গরুকে দেখছ জল না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে, তুমি কলের থেকে এক বালতি জল তুলে তাকে খেতে দিলে, সেটাও ভূতযজ্ঞের মধ্যে পড়বে। সাধারণতঃ নিজ আহার্য্যের অগ্রভাগ সশ্রদ্ধভাবে তাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করার রীতি আছে। আদত কথা হ'লো, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবার সঙ্গে নিজের যোগসূত্রটা বোধ করতে অভ্যস্ত হওয়া। এগুলি যদি ভাবায় থাকে, করায় না থাকে, তাহ'লে হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে খেপুদার বারান্দায় যেয়ে বসলেন। পিসিমা ঘরে ছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর ডাক দিলেন—খুকি! কী করিস রে?

পিসিমা বললেন—'কিছু করি না।' এই ব'লে বেরিয়ে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বয়। তোর সঙ্গে যে একটু ফাঁকে ব'সে কথা ক'ব, তার লগ্নই হ'য়ে ওঠে না।

পিসিমা—আপনিও ব্যস্ত থাকেন ব'লে বিরক্ত করি না। আমারও ইচ্ছা করে আপনার কাছে যেয়ে বসি, গল্পটল্প করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর রহস্য ক'রে বললেন—তোমার যে খুব ইচ্ছা করে তা' মনে হয় না। তুমি তো আমাকে এড়িয়েই চল। আমি আর কী করব?

পিসিমা—আপনি লোকজন নিয়ে থাকেন, তাই আপনার কাছে যাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর মধ্যেই গেলি হয়। দরকার মতো আমি কথা বলতে পারি। আমার মমতা বড় অবাধ্য। সকলের জন্যই আমার প্রাণ ছটফট করে। যা' হোক, তোরা ভাল আছিস, সুস্থ আছিস, সুখে-স্বচ্ছন্দে আছিস—এইটে দেখলেই মনে হয় আমি যেন ব'র্ত্তে গেলাম।

পিসিমা বললেন—আমি ভালই আছি।

এরপর কিছু সময় ভ্রাতা-ভগ্নীতে নিভৃতে আলাপ হ'লো।

পরে বঙ্কিমদা (রায়) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর জল খেতে চাইলেন। পিসিমা জল দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বঙ্কিমদার দিকে চেয়ে স্নেহল কণ্ঠে বললেন—ওর ধরণ-ধারণের মধ্যে মা'র রকম কিছু-কিছুটা টের পাওয়া যায়, তাই না?

বঙ্কিমদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার বঙ্কিমদাকে বললেন—কতকগুলি ভাল mason (রাজমিস্ত্রী), carpenter (ছুতোর মিস্ত্রী), agricultural expert (কৃষিপারদর্শী), mechanic (কারিগর) ও military training (সামরিক শিক্ষা) দিতে পারে, এমনতর লোক তাড়াতাড়ি জোগাড় করতে পারিস? দু'দিনের জন্য এসে চ'লে গেল তা'তে হবে না। খাক না-খাক, মাটি-কামড়ে প'ড়ে থাকবে, আমাকে ছেড়ে যাবে না কিছুতেই,—এমনতর লোক দরকার। যেমন তোরা আছিস। লোক বেগোর আমার চিন্তাগুলি চিন্তাই থেকে যা'চ্ছে, আর এটা আমার পক্ষে বড়ই painful (কষ্টদায়ক)। কোনদিন আমার এমনতর অভ্যাস না। এখন আমার তোমাদের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। টাকা জোগাড় হ'লো তো মানুষ আর জোগাড় হ'চ্ছে না। তাড়াতাড়ি কর্। দেরী হ'লে অনেক জিনিস ফস্কে যাবে। এখানকার জন্য যে লোক সংগ্রহ করবা, বেছে-বেছে সব রকম লোক যদি আন, তাহ'লে পরের হাত-ধরা হ'য়ে থাকা লাগে না। তারাই আবার অনেককে শিখিয়ে নিতে পারে। এই যে

লোক-আনার কথা বলছি, ভাল-ভাল লোক এনে দাও, দেখোহানে কাণ্ড গুরুতর হ'য়ে যাবিনি।

বঙ্কিমদা—এখানে ব'সে যা' চেষ্টা করা যেতে পারে, তা'তো করছি। যদি বলেন, বেরিয়ে চেষ্টা করতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, তাইতো! তোমরা সকলে বেরোও, আর আমি এখানে হাবাগঙ্গারামের মতো একলা-একলা প'ড়ে থাকি!

বঙ্কিমদা হেসে বললেন—তাহ'লে কী করব বলুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার যা' বলার তা' তো বলিছি, এখন যেমন ক'রে যা' করলে তা' হয়, তাই করবা। আমি না পারার explanation (কৈফিয়ৎ) শুনতে রাজী নই, আমার কাজ হাসিল ক'রে দেওয়া চাই এবং সে এখানে ব'সেই।

বঙ্কিমদা—তাই হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (উল্লসিত কণ্ঠে)—সাবাস! মন্দ আর কারে কয়? দীনতার থেকে দৃঢ়তাই আমি বুঝি ভাল।

—এই ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর নাটকীয় ভঙ্গীতে উঠে পড়লেন। তাঁর সুঠাম তনু নৃত্যের ছন্দে দুলে উঠলো।

বেলা প'ড়ে গেছে, সূর্য্য অস্ত যায়-যায়। বাঁধের নীচে খানিকটা দূরে একটা জায়গায় একখানি চৌকী পেতে দেওয়া হয়েছে। চৌকীর উপর আছে মাদুর ও বালিস। শ্রীশ্রীঠাকুর সেই চৌকীতে এসে বসেছেন। তাঁর খালি গা, গলায় পৈতেটি ঝুলছে। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ তাঁর আরো উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে পড়ন্ত সূর্য্যের আভা লেগে। একটা দিব্য আনন্দের আবেশ তাঁর সারা দেহমনে। কী যেন এক তীব্র আকর্ষণ তাঁর চোখে-মুখে। শুধু মনে হয়—মধু, মধু, মধু। আকাশ, বাতাস, জল, মাটি, স্থান, কাল, পাত্র সবই মধুময়। এই মোহন পরিবেশে ভক্তবৃন্দ তাঁকে ঘিরে আনন্দের মধুচক্র রচনা করেছেন।

চৌকীর চারিপাশ জুড়ে নীচেয় বসেছেন সবাই, আর শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছেন সবার উপর দিয়ে, তাঁর মুখে লেগে রয়েছে এক অপূর্ব্ব অমৃত-মধুর হাসি।

বাইরে থেকে একটি ভাই কর্ম্মী হবার অনুমতি চেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে চিঠি দিয়েছে, সেই কথা উত্থাপন করা হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কষ্টের জন্য যদি প্রস্তুত থাকে তবে আসতে বল। 'ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা, নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।' আর consent-এর (অনুমোদনের) কথা যদি বল, তবে আমার whole literature (সমগ্র সাহিত্য)-ই তার consent (অনুমোদন)।

আশীর্ব্বাদ সম্পর্কে বললেন—কাজ যে করে, তার সঙ্গে-সঙ্গে আমার আশীর্ব্বাদ ঘোরে।.........আমি তো কেবল বাহন খুঁজি, ভাবি, কে আমায় একটু

কাঁধে ক'রে ব'য়ে নিয়ে বেড়াবে। কিন্তু যেখানে নির্ভয়ে আশ্রয় করতে পারি, তেমনতর কাঁধ বড় পাই না। মানুষ বৌ-ছাওয়ালের বোঝা, খেয়ালের বোঝা অক্লেশে বইতে পারে, কিন্তু আমার বোঝায় অল্পেতেই কাতর হ'য়ে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বালিসে ঠেস দিয়ে পশ্চিমাস্য হ'য়ে কথা বলছেন, মাঝে-মাঝে পা-দুখানি নাচাচ্ছেন। হঠাৎ সুশীলাদিকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি রে! আমার কথা ঠিক না?

সুশীলাদি (হালদার)—এমন হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার লোভ বড় বেশী কিনা। অতখানি মানুষ সহ্য করতে পারে না। ভাবে, ভাল রে ভাল! এ মিনসের বোঝা ব'য়ে আমার লাভটা কী?

সকলে একযোগে হেসে উঠলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (গম্ভীরভাবে)—ঐ-ই ব্যাপার। ভাবে, ঠ'কে যাবে।

প্রতুলদা (দেব) প্রশ্ন তুললেন—অনেকে মনে করেন, আর্য্যসমাজ-বিধানের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এর উত্তর কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকটি মানুষ যখন সমান নয়, তখন সমআচরণে ফয়দা কী হবে? যার যেমন বৈশিষ্ট্য, যার যা'তে ভাল হয়, তার বেলায় তাই করা লাগবে। একে যদি বৈষম্য বল, তাহ'লে নাচার। তোমার পেট খারাপ, বার্লি খাওয়া প্রয়োজন, তাই তোমাকে বার্লি দেওয়া হ'লো, পায়স দেওয়া হ'লো না, আর যে পায়স খেয়ে সহ্য করতে পারে, তাকে হয়তো পায়স দেওয়া হ'লো। একে কি বৈষম্য বলবে? আমাদের উদ্দেশ্য হ'লো অবনতকে উন্নত করা, উন্নতকে আরো উন্নত করা, বড়কে ছোট করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বড়র মধ্যে অপকর্ষের কিছু যদি থাকে, সেই অপকর্ষতার পথ রুদ্ধ করতে হবে, উন্নতির পথ অবাধ করতে হবে। ফলকথা, বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করতেই হবে—উন্নতিকে অক্ষুণ্ণ রেখে। তার জন্যই যা'-কিছু। এমনতর সাম্য আর হ'তে পারে না। তোদের যে নিজেদের সমাজ-সম্বন্ধে, কৃষ্টি-সম্বন্ধে গৌরব-বোধ নেই। তাহ'লে মানুষকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারতিস, তোদের সমাজবিধান কতখানি scientific (বৈজ্ঞানিক), কতখানি rational (যুক্তিযুক্ত), কতখানি divine (ভাগবত)। সব কথা ছেকে যদি নিয়ে আস, তবে দাঁড়ায়—জন্মগত বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে, ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হ'য়ে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী করা। এতে আজ যে কৃষক আছে, কাল সে হয়তো দেশের একটা leader (নেতা) হ'য়ে দাঁড়াবে, প্রত্যেকের ভিতর যতখানি আছে, সবখানি integrated (সংহত) হ'য়ে ঠিকরে বেরুবে। Beyond oneself (একজনের বাইরে) যদি একটা standard (দাঁড়া) না থাকে, তবে মানুষ নিজের স্বার্থ দেখতে গিয়ে বৃত্তির ঘোরে প'ড়ে যায়। তাই নিজের স্বার্থ বজায় রাখতে গেলেই ইষ্টের স্বার্থ বজায় রাখতে হবে।

এরপর কেষ্টদা ও শরৎদা (কর্ম্মকার) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোরা ওঠ্। কেষ্টদাদের সঙ্গে একটু কথা কই।

কেষ্টদা, শরৎদা ও প্রফুল্ল রইলেন।

কেষ্টদা একটু দূরে বসেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কাছে আগায়ে বসেন, নইলে কথা ক'য়ে যুত হয় না।

কেষ্টদা চৌকীর কাছে এগিয়ে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শরৎদা বাংলার সব জেলায় ইন্‌সিউরেন্সের কাজ নিয়ে ঘুরবে, সেই সঙ্গে আমার কাজ করতে পারবে। আমি বলছি, immediately (সত্বর) defence guard (রক্ষীদল), agricultural farm (কৃষিক্ষেত্র) ও workshop (কারখানা) এই তিনটি জিনিস সর্ব্বত্র start (চালু) করা লাগে। Defence guard (রক্ষীদল) আত্মরক্ষার প্রস্তুতির সঙ্গে-সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার পূর্ত্তকাজ করবে—যেমন রাস্তাঘাট ঠিক করা, জঙ্গল পরিষ্কার করা, পুষ্করিণী কাটা, খাল কাটা, আল বাঁধা ইত্যাদি ; পা'ট (মজুর) রাখবে না, নিজেরাই করবে। এই কাজের জন্য যুবকদের মধ্যে ঢুকতে হবে, দলে-দলে তাদের দীক্ষিত ক'রে তুলতে হবে, disciple (শিষ্য) হবার ভিতর-দিয়ে তাদের আসবে normal discipline (সহজ নিয়মানুবর্ত্তিতা)। আর, বাংলার প্রত্যেক থানায় সৎসঙ্গের branch (শাখা) থাকবে। প্রত্যেক থানায় সৎসঙ্গ-কৃষিক্ষেত্রের জন্য অন্ততঃ ২০০ বিঘা জমি জোগাড় করতে হবে। জমিটা branch-এর (শাখার) কাছাকাছি হওয়া চাই। কর্ম্মীরা সেখানে হাতেকলমে কৃষি করবে, চারদিকে কৃষি-সম্পর্কিত নানা তথ্য সরবরাহ করবে, কৃষির সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে সকলের চোখ খুলে দেবে, প্রত্যক্ষ ক'রে দেখাবে। এতে সারা বাংলায় কৃষির পুনরুজ্জীবন হ'য়ে যাবে, বাংলা থেকে ভারতের অন্যান্য জায়গায়ও ছড়িয়ে পড়বে। আর, ঐ কৃষিক্ষেত্রের উপর দিয়ে কর্ম্মীদের ভরণপোষণও চ'লে যাবে। কৃষিক্ষেত্র যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে একটা ক'রে workshop (কারখানা)। তা' সেই এলাকায় mechanical service (কারিগরি সেবা) দেবে, cottage industry-র (কুটির-শিল্পের) machinery (যন্ত্রপাতি) manufacture (তৈরী) করবে। বহুলোক যেখানে দীক্ষিত হ'য়ে যাবে, সেখানকার কাঁচামাল ও অন্যান্য সুবিধা দেখে লিমিটেড কোম্পানী ক'রে একটু বড় রকমের শিল্প-প্রতিষ্ঠানও করতে হবে। কারখানাটা তার সহায়ক হিসাবে থাকবে, মেরামতের কাজ-কর্ম্ম করবে। কোন সৎসঙ্গী ব্যক্তিগত দায়িত্বে এটা চালাবে। কর্ম্মীরা সবার মাথায় কৃষি, শিল্প সম্বন্ধে নেশা ধরিয়ে দেবে। আর যাই করেন, গোড়ায় চাই যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি ও সদাচার। এই ভিত না হ'লে কোন কাজ দানা বাঁধবে না। থানায়-থানায় ২০০ বিঘা জমি সংগ্রহ করা কঠিন কিছু নয়। এটা এখনই করা যায়।

শরৎদা বললেন—চেষ্টা করব।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে, মাঠের মধ্যে কেমন একটা নিবিড় থমথমে রহস্যের আবেশ।

কেষ্টদা বললেন—সবই তো করা যায়। কিন্তু কর্ম্মী কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা আছে, তাদেরই এমন আগুন ক'রে ছেড়ে দেন যে, তারা যাকে ছোঁবে তার আর রেহাই থাকবে না সাধ্যমতো এই কর্ম্ম না ক'রে—তা' সে যেখানে যা' নিয়েই থাক না কেন।

কথা হ'চ্ছে এমন সময় অক্ষয়দা (পুততুণ্ড) আসলেন। যজন-পদ্ধতি সম্পর্কে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—ফরিদপুরে একটা ঘর ভাড়া নেন, যেখানে ২৪ ঘণ্টা লোকজনের যাতায়াত, আলাপ-আলোচনা, আড্ডা চলতে থাকবে। লোকগুলির running active complex-এর (চলমান সক্রিয় বৃত্তির) মধ্য-দিয়ে ঢুকতে হয়, তাহ'লে তারা interested (অন্তরাসী) হ'য়ে ওঠে। আসল কথা হ'লো judicious praise (সমীচীন প্রশংসা), মানুষের ego (অহং)-কে tackle (নাড়াচাড়া) ক'রেই সব করা যায়।

প্রবৃত্তির ভিতর-দিয়ে মানুষকে ধরবেন, কিন্তু সাবধান, সে যেন আপনাকে হজম ক'রে না ফেলে। সেই জন্য নিষ্ঠা খুব পাকা রাখা লাগে।

বিশিষ্ট ও সাধারণ দুই দিকেই লক্ষ্য রাখা চাই। মানুষকে পট-পট ক'রে বন্ধু ক'রে ফেলতে হবে—তার হাড়ি-নাড়ি, আত্মীয়-স্বজন, চৌদ্দ পুরুষের খবর জেনে ফেলবেন। শক্ত জায়গায় প্রথম এক-আধবার গিয়ে হয়তো শুধু কতকগুলি লোকের সঙ্গে ভাবসাবই ক'রে আসলেন, তাদের কিছু জানতে দিলেন না। একজনের পরিচয় নিয়ে গেলেন, দশজনের সঙ্গে পরিচিত হলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে কেষ্টদাকে বলছেন—দীক্ষা বহুগুণ বাড়িয়ে ফেলুন। এমন কর্ম্মী চাই—যারা বাইরে অনবরত কাজ করতে পারবে। শরৎদার সঙ্গে, প্রফুল্লর সঙ্গে এত কর্ম্মী থাকবে যা'তে ওরা একদিনে প'চিশ জায়গায় মিটিং করতে পারে। কাজের জন্য নিজেদের গাড়ীরও ব্যবস্থা করতে হবে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বালিসটা কোলের উপর রেখে ঝুঁকে ফিসফিস ক'রে বললেন—আমরা সব নাড়াবুনের দল, কাজ করতে হ'চ্ছে কীর্ত্তনীয়ার। তবে আশা হয় এই যে পরমপিতার কাজ অজ্ঞাত, অখ্যাতদের দিয়েই হ'য়ে থাকে।

প্রফুল্ল—দীক্ষিতের সংখ্যা তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি করা যায় কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক-একটা মানুষকে দীক্ষা দিয়েই এতখানি উদ্দীপ্ত ক'রে দিতে হয় যে, সে অবিলম্বে আর দশজনকে দীক্ষিত করাবেই। এতে ঘূর্ণির বেগে কাজ চলতে থাকবে।

একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে গম্ভীরভাবে বললেন—সব দিক যখন ভাবি, আতঙ্কের মতো লাগে। শুনলাম polygamy (বহুবিবাহ) banned

(নিষিদ্ধ) হ'য়ে যাচ্ছে, এ একটা সর্ব্বনাশের পথ, বিশেষ মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হ'য়ে যাবে। নিকৃষ্টের সংখ্যা সমাজে বেশী, সুতরাং তারা আরো বাড়বে। শ্রেষ্ঠের সংখ্যা কমই র'য়ে যাবে, আর, আমাদের দেশের মেয়ে অন্যদেশে চালান হবে। যাই বলেন, সত্তাক্ষয়ী যা' তার প্রতিকার না করলে কিন্তু নিজের ও পরিবেশের প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই শত্রুতা সাধন করা হবে। তা' কি ভাল?

একটু বাদে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠলেন। বাঁধের কাছে সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় কেষ্টদার হাতখানি ধ'রে নিলেন।

৬ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৪৯ (ইং ২২।৭।৪২)

সম্প্রতি সপ্তদশ ঋত্বিক্-অধিবেশন সমাপ্ত হয়েছে। কর্ম্মীদের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত আছেন। তাঁদের মধ্যে ২০।২৫ জন প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সমবেত হয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দে তাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন। কেমন ক'রে কাজের দ্রুত প্রসার হ'তে পারে সেই সম্বন্ধে বলছেন—

Worker-এর (কর্ম্মীর) number (সংখ্যা) খুব বাড়াতে হয়। আর, নিজেদের সঙ্গে রেখে তাদের train up (তৈরী) ক'রে তুলতে হয়। তোমাদের প্রধান কাজ হ'লো, নিজেরা ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্ন হওয়া এবং অন্যকেও ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্ন ক'রে তোলা। ইষ্টের স্বার্থ ছাড়া নিজের স্বার্থ বলতে আর কিছু থাকবে না, ইষ্টের প্রতিষ্ঠা ছাড়া নিজের প্রতিষ্ঠা বলতে কিছু থাকবে না। এইটে যার মধ্যে যত প্রতিষ্ঠালাভ করবে, সে তত পরিবেশের জীবন-বৃদ্ধির হোতা হ'য়ে উঠবে। মানুষ তার প্রতি তত আকৃষ্ট হ'য়ে উঠবে, প্রতিষ্ঠাও হবে তার তেমনি। অবশ্য ঐ রকমটা কাজের ভিতর-দিয়ে প্রতিফলিত হওয়া চাই। ইষ্টকে ভালবাসলে আত্মনিয়ন্ত্রণটা হ'য়ে ওঠে স্বাভাবিক, তিনি যা' পছন্দ করেন না, তা' করতে ইচ্ছা করে না—প্রবৃত্তির ঝোঁক সেদিকে যতই থাক না কেন। আবার, তিনি যেটা পছন্দ করেন, সেটা না ক'রেই পারা যায় না, তা'তে যত কষ্টই হোক। তোমাদের ভিতর মানুষ এই বাস্তব আত্মনিয়ন্ত্রণের দৃষ্টান্ত যেন প্রতিমুহূর্ত্তে দেখতে পায়, এতে লোকের যে উপকার হবে, তার তুলনা হয় না। মুখে লাখ কথা কওয়ার থেকে এই চলনের দাম অনেক বেশী। আর, তোমাদের চাই অনুসন্ধিৎসু সেবাবুদ্ধি। সব সময় শ্যেনদৃষ্টি নিয়ে চলবে—কি ক'রে কার কতটুকু কাজে লাগতে পার। প্রত্যেকটা মানুষই বাঁচা-বাড়ার কাঙ্গাল, এই বাঁচা-বাড়ার খোরাক যাকে যতভাবে, যতখানি জোগাতে পার, তার কসুর করবে না। সব সময় স্ফূর্ত্তিতে থাকবে, আনন্দে থাকবে, তোমাদের কাছে এসে মানুষ যেন একটা নূতন জীবন পায়। এই রকমগুলি তোমাদের মধ্যে থাকলে সহকর্ম্মীদের

মধ্যেও অজ্ঞাতসারে ঢুকে যাবে। আর, ideology (ভাবধারা)-টা comparative study-র (তুলনামূলক অধ্যয়নের) ভিতর-দিয়ে ভাল ক'রে আয়ত্ত করতে হয় এবং তাদেরও করিয়ে দিতে হয়। নাম-ধ্যান, ইষ্টভৃতি-স্বস্ত্যয়নী, সদাচার—এগুলি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হয়। নিজের ভিতর ঢিলেমী থাকলে, অন্যের ভিতরও তার সংক্রমণ হয়। আবার, নিজেরা ঠিকমতো চললেই যে সকলকে ঠিক ক'রে তুলতে পারবা তা'ও কিন্তু নয়। মানুষের জন্মগত রকম যেমন, তার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। তাই, কর্ম্মী-নির্ব্বাচন করার ব্যাপারে ওদিকে লক্ষ্য রাখবে।

নিবারণদা (বাগচী)—কী লক্ষ্য করতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখবে, সে ইষ্টকে দিয়ে নিজের কাজ বাগাতে চায়, না ইষ্টের জন্য নিজেকে বাগাতে চায়।

কালিদাসদা (মজুমদার)—যে ইষ্টস্বার্থ চায়, সঙ্গে-সঙ্গে নিজের স্বার্থও চায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজ স্বার্থ যদি ইষ্টার্থে হয়, তাহ'লে দোষ হয় না। কিন্তু ইষ্টস্বার্থের বিনিময়ে যদি কেউ নিজস্বার্থের পূরণ চায়, তাহ'লে তাকে সন্দেহ ক'রো। ....আর একটা কথা, কর্ম্মীদের যেমন নিজেদের সঙ্গে রাখবে, তেমনি তারা যা'তে এখানে এসেও একাদিক্রমে কিছুদিন থাকে, সে ব্যবস্থাও করবে। প্রত্যেক conference-এ (ঋত্বিক্-অধিবেশনে) তাদের আসাই চাই। এখানে আসা-যাওয়া ঠিক থাকলে অনেকখানি চাঙ্গা থাকে। সৎসঙ্গীদেরও মাঝে-মাঝে এখানে পাঠাতে হয়।

অনিলদা (গঙ্গোপাধ্যায়)—অনেক সময় কর্ম্মক্ষেত্রে দেখা যায় যে কর্ম্মীদের পরস্পরের মধ্যে মিলমিশ নেই, একজন আর একজনের কথা শুনতে পারে না, এর দরুণ সৎসঙ্গীদের মধ্যেও disintegration (ভাঙ্গন) দেখা দেয়। এ সম্বন্ধে কী করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেখানে above-এ (ঊর্দ্ধে) থেকে পরস্পরের মধ্যে মিলমিশ যা'তে হয়, তাই করতে হয়। অনেক সময় পরস্পরের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি থাকে, তার নিরসন ক'রে দিতে হয়। ধর, গুরুদাসের সঙ্গে গোপেনের বিরোধ আছে। তুমি গুরুদাসের কাছে গিয়ে গোপেনের নাম ক'রে বলছ—গোপেনদার অন্তরে বড় ব্যথা যে তোমার মতো একজন ইষ্টপ্রাণ কর্ম্মীর সঙ্গে তার ভুল বোঝাবুঝি হ'য়ে গেছে। গোপেনদার একান্ত ইচ্ছা, তোমার সঙ্গে আগের মতো মেশেন, কিন্তু একটা সঙ্কোচের দরুন এগুতে সাহস পান না, অথচ এ জন্য গভীর মর্ম্মপীড়া বোধ করেন। তোমার প্রতি তার বিশেষ স্নেহ ও শ্রদ্ধা। তুমি এর পর সুযোগ পেলেই নিজে থেকে তার কাছে এগিয়ে যাবে। আবার, গোপেনের কাছে গুরুদাসের গোপেনের প্রতি মনোভাব সম্বন্ধে এমন ক'রে বলছ, যা'তে

গুরুদাসের সঙ্গে মৈত্রীসম্পর্ক স্থাপনের জন্য তার প্রাণে একটা তীব্র আগ্রহের সঞ্চার হয়। এইভাবে দৌত্য ক'রে মিলমিশ ঘটান যায়। এতে যদি অযথার্থ ভাষণের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, তাও কিন্তু মিথ্যার পর্য্যায়ে পড়ে না। অনেক সময় দুজনের সামনাসামনি জিনিসটা এমন হাল্কা ক'রে ধরা যায় যে, তা' আর জট পাকাতে পারে না। আমি তো হামেশাই এমন ক'রে থাকি। হয়তো তুমি একজনকে বকেছ, তা'তে তার মন খারাপ হ'য়ে গেছে। সে এসে আমাকে সেই কথা বলল—আমি পরে তোমাদের দুজনের সামনে হেসে বললাম—ও একটু বোকা আছে, ধমক-টমক খেলে ঘাবড়ে যায়। আমাকে বলছিল, অনিলদা আমাকে ভালও বাসে খুব, কিন্তু যখন ধমক দেয় তখন মন খারাপ হ'য়ে যায়। তুমি হয়তো বললে—আমার মনটা সেদিন একটু খারাপ ছিল, তাই বোধ হয় একটু রুষ্টভাব প্রকাশ পেয়েছে। এই কথায় জিনিসটা জল হ'য়ে গেল। কতরকম কায়দা আছে। সব সময় বুদ্ধি রাখা লাগে, কেমন ক'রে মানুষের সঙ্গে মানুষের সৌহার্দ্দ্য ঘটে, তা' যেমন কথায়, তেমনি কাজে। অবশ্য অসৎ বা অন্যায্য যদি কিছু থাকে, তা' নিরোধ করা লাগে। আমার ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস ছিল, যদি কখনও পৈতেয় জটা পাকিয়ে যেত, সেটা ঠিক না করা পর্য্যন্ত যেন আমার কিছুতেই ভাল লাগত না। মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধ দেখলেও তার নিরসন না করতে পারলে আমার যেন ভাল লাগে না। তোমাদের মধ্যেও যদি ঐ নেশা থাকে, তাহ'লে দেখতে পাবা, অনেক জটিলতাই তোমরা সরল ক'রে তুলতে পারবা। ধ্যানী যে তার কাজ হ'লো নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধান। সেটা শুধু চিন্তার বেলায় নয়, কাজের বেলায়ও, আবার শুধু নিজের ব্যাপারে নয়, পরিবেশের ব্যাপারেও। দায়িত্বের তোমাদের শেষ নেই।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য)—এত দায়িত্ব কি পালন করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত করা যায়, তত পারা যায়। আমার জোঙাল যদি বইতে চাও, তবে আমি যা' চাই তা' করা তোমাদের সুখের হবে। তোমরা আমার হাত-পা। আমার করাটা তোমরা করছ, তাই তো দেখতে ইচ্ছে করে। তাহ'লে তো বুঝতে পারি, আমি কতখানি expanded (বিস্তৃত) হ'য়ে গিছি। তোমাদের ভিতর-দিয়ে আমার চ'রে বেড়াতে ইচ্ছা করে সর্ব্বত্র।

বিরাজদা (ভট্টাচার্য্য)—ঠাকুর! বিশ্বাসটা পাকা হয় কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিশ্বাস জিনিসটা শ্বাসক্রিয়ার মতো সহজ। ওটা এতই পাকা যে ও-সম্বন্ধে সন্দেহ, অবিশ্বাস বা প্রশ্ন আসে না। কারণ, ওটা প্রত্যক্ষ। মানুষের ভালবাসা যা'তে, বিশ্বাসও তা'তে। ঐ তার জীবন। তা'তে অবিশ্বাস আস্‌লে সে তো আর নেই। সদ্‌গুরুর-সান্নিধ্যে এসে মানুষ positively (বাস্তবে) যতটুকু তাঁকে follow (অনুসরণ) ক'রে,—unexpectantly (অপ্রত্যাশী হ'য়ে), out of love (ভালবেসে),—তার ভিতর-দিয়ে তার যে experience

(অভিজ্ঞতা) হয়, সেই experience (অভিজ্ঞতা)-ই তাকে ব'লে দেয় যে, বিশ্বাসের অমনতর স্থল আর নেই। কারণ, মানুষ জীবনে অতো সুখ আর কিছুতে পায় না, অতো স্বস্তি আর কিছুতে পায় না। ঐটুকুই তার জীবনের অমৃত। তাই বিশ্বাস না ক'রে সে যাবে কোথায়? অনেকের love at first sight (প্রথম দেখাতেই ভালবাসা) হয়। তাদের বিশ্বাসও হয় স্বতঃ। বিশ্বাস যাকে বলে, তা' একবার হ'লে, কখনও নষ্ট হয় না। বিশ্বাস সম্বন্ধে সত্যানুসরণে অনেক কথা আছে।

বিরাজদা—তার অনেকগুলি আমার মুখস্থ আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কন্ তো দেখি।

বিরাজদা—বিশ্বাসই বিস্তার ও চৈতন্য এনে দিতে পারে, আর অবিশ্বাস জড়ত্ব, অবসাদ, সংকীর্ণতা এনে দেয়।

বিশ্বাস যুক্তি-তর্কের পার, যদি বিশ্বাস কর, যত যুক্তি-তর্ক তোমায় সমর্থন করবেই করবে। তুমি যেমনতর বিশ্বাস করবে, যুক্তি-তর্ক তোমায় তেমনতর সমর্থন করবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেশ সুন্দর তো!

বিরাজদা—আরো আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক'ন।

বিরাজদা—ভাবেই বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা। যুক্তিতর্ক বিশ্বাসকে এনে দিতে পারে না। ভাব যত পাতলা, বিশ্বাস তত পাতলা, নিষ্ঠা তত কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাব মানে জানেন তো? ভাব মানে হওয়া। হওয়ার পিছনে থাকে করা। যার করা যত বেশী থাকে, তার ভাব বা হওয়াও হয় ততখানি। আবার, ভাবের মানে অনুরাগও হয়। অর্থাৎ, ইষ্টের জন্য করা ও ভালবাসা যার যত বেশী, তার বিশ্বাসও তত গভীর।

বিরাজদা—সব জানাশোনা সত্ত্বেও যে অনেক সময় মন ট'লে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনের রাজ্যে মানুষের ওঠাপড়া আছেই। ওদিকে খেয়াল দিতে নেই। বিশ্বাসের প্রতিকূল চিন্তা যখন মনে জাগে, তাকে কিছুতেই আমল দিতে নেই। তার অনুকূল চিন্তা যেগুলি, সেগুলিকে তখন মনের উপর দৃঢ়ভাবে আরোপ করতে হয়। সঙ্গে-সঙ্গে সেইভাবে বলতে হয়, করতে হয়, লিখতে হয়, গান গাইতে হয়। তখন আর সেটা দাঁড়াতে পারে না। গভীর বিশ্বাসী যারা, তাদের সঙ্গ করলেও ভাল ফল হয়। বিশ্বাস হারালেই কিন্তু মানুষ নিঃসম্বল, দেউলিয়া। তার বল, শক্তি, জ্ঞান কিছু থাকে না, সে দিন-দিন নিস্তেজ ও জড় হ'য়ে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে মৃদু-মৃদু হেসে বলছেন—একটা লোক চোর, ধাউড়, গুণ্ডা, বদমায়েস বা লুচ্চা হ'য়েও যদি একনিষ্ঠ হয়, তার বরং গতি আছে, কিন্তু যে বহুনৈষ্ঠিক, যে wabbler (অস্থিরমতি), সে যদি moralist (নীতিপরায়ণ)-ও হয়, তবু তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। রত্নাকর বা বিল্বমঙ্গল type-এর (ধরণের) যারা, তাদের জন্য কোন ভাবনা নেই। ভাবনা হ'লো তাদের নিয়ে, যাদের মধ্যে খোলামেলা রকম নেই, ভালবাসা নেই।

রত্নেশ্বরদা (দাসশর্ম্মা)—তাদের উপায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সদ্‌গুরুকে ধ'রে যদি লেগে থাকে, তাহ'লেও অনেকখানি হয়। এ জীবনে যতটুকু এগোল, তার উপর দাঁড়িয়ে পরজীবনে আবার এগোতে পারে।

রত্নেশ্বরদা—পরজীবনের কথা তো অনিশ্চিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের জানার মধ্যে নেই, তাই অনিশ্চিত। কিন্তু যারা বিশ্বাস করে, তাদের কাছে অনিশ্চিত নয়। তবে পরজীবনের উপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত থাকাটা আমার পছন্দ হয় না। আমি ভাবি, যা' করতে হবে বা পেতে হবে তা' এখনই। এই urge-এ (আকূতিতে) করার speed (গতি) বেড়ে যায়। তবু সবার সব metal (উপাদান) থাকে না, তাই সময় নেয়।

বাইরে থেকে আগত একটি মা বললেন—আমার ভাগ্য বড় খারাপ, আমার পুত্রবধূর সন্তানাদি হয়, কিন্তু বাঁচে না। পর-পর তিনটি সন্তান এইভাবে গেল। আপনি আশীর্ব্বাদ করেন যেন এমনতর না হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্যারীকে দিয়ে ভাল ক'রে চিকিৎসা কর। প্যারীকে বললে সে ওষুধ লিখে দেবে।

উক্ত মা—আপনি মুখে আশীর্ব্বাদ করলেই হবে, ওষুধ আর লাগবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' বলি, তা' যদি না শুনিস, নিজের খেয়াল মতো আশীর্ব্বাদ যদি চাস, তাহ'লে তো আমি অপারগ। জারিজুরি আমার কিছু জানা নেই। আমি জানি, যা'-কিছু ঘটে, তার একটা কারণ আছে, এবং সে-কারণের নিরাকরণে অবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটে। এবং যেটা যেমন ক'রে সম্ভব, সেটা তেমন ক'রেই করতে হয়। এর মধ্যে ঠাকুরালীর প্রয়োজন করে না। মেয়ে হো'ক, পুরুষ হো'ক—সবার জানবার চেষ্টা বেড়ে যাক, করবার চেষ্টা বেড়ে যাক, তা' দেখতে পেলেই আমার ভাল লাগে। নচেৎ আমাকে ধ'রে যদি তোমাদের আজগবীতে আস্থা বেড়ে যায়, তাহ'লে বুঝব সে আমারই দুর্ভাগ্য।..........

শ্রীশ্রীঠাকুর মা-টিকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোর বৌ লেখাপড়া জানে?

উক্ত মা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবে 'নারীর নীতি', 'নারীর পথে' ও স্বাস্থ্য, সদাচার, আহার, গর্ভচর্য্যা ইত্যাদি বিষয়ক বই পড়তে দিবি। একা-একা পড়ার থেকে, সে পড়লো আর তোরা পাঁচজনে শুনলি, একসঙ্গে আলোচনা করলি, এমন হ'লে

আরো ভাল হয়। প্রত্যেকটা পরিবারে এই সব চর্চ্চা যত হয়, ততই ভাল। জীবনচলনায় সাধারণভাবে যা'-যা' লাগে, সব বিষয়েই পড়াশুনো, আলোচনা, চর্চ্চা হয়, সেই-ই ভাল। আর, এগুলি শুধু জেনে রাখলে হবে না। করবার জন্য জানতে হবে, আর না করলে জানাও হবে না। এইভাবে যদি চল, তাহ'লে দেখবে, পাড়ার অন্যান্য পরিবারেও এসব ছড়িয়ে যাবে, তারাও উপকৃত হবে। সবাই যে দীক্ষা নেবে এবং সবাইকে যে এখানে দীক্ষা নিতে হবে, এমন কোন কথা নয়, কিন্তু তোমাদের দৃষ্টান্তে মানুষের বাঁচার পথ নিরাবিল ও প্রশস্ত যদি না হ'লো, তাহ'লে তোমরা করলে কী?

ভোলানাথদা (সরকার)—আপনার অনেক কথা আমরা শুনি না, তা' সত্ত্বেও আপনি বিরক্ত না হ'য়ে পারেন কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিরক্ত হ'লে যদি আমার interest (স্বার্থ) fulfilled (পূরণ) হ'তো, তাহ'লে বিরক্ত হ'তে আমার বাধা কী? আমার interest (স্বার্থ) হ'লো—আপনাদের উপযুক্ত ক'রে তোলা।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে খবরের কাগজ প'ড়ে শোনান হ'লো। সম্পাদকীয় স্তম্ভে আইন, শৃঙ্খলা সম্বন্ধে একটা মন্তব্য বেরিয়েছে।

সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের দেশে আইন, শাসন-ব্যবস্থা, শাস্তি, উত্তরাধিকার, প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন, মন্ত্রী বা কর্ম্মচারী নিয়োগ, দূত বা চর নিয়োগ, ইত্যাদি সব ব্যাপার কিভাবে পরিচালিত হ'তো, ভাল ক'রে জানা লাগে। সেগুলি যদি না জানি, তবে পরে হয়তো ভুলে যাব যে আমাদের নিজেদের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা একদিন চালু ছিল। যদি কোনদিন স্বাধীন হই, তাহ'লেও হয়তো গতানুগতিকভাবে ইংরেজদেরটা অনুকরণ ক'রে চলব। আমাদের দেশের ইতিহাসই তো আমরা ভাল ক'রে উদ্ঘাটন করিনি। আর করব কি ক'রে? পর-পর পেষণই তো চলছে।

ইতিমধ্যে শরৎদা আসলেন। শরৎদাকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহ সহকারে বললেন—শরৎদা! বসেন।

শরৎদা (হালদার) প্রণাম ক'রে বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দেখেন, কর্ম্মীদের অনেকেরই পড়াশোনা করবার অভ্যাস নেই। কেষ্টদা, আপনি বা সুশীলদা যারা নানাবিষয় পড়াশুনা করেন, তারা যদি কর্ম্মীদের নিয়ে ব'সে বৈঠকী আলাপ-আলোচনা করেন, তাহ'লে আপনাদের কাছ থেকে ওরা অনেক বিষয় শিখতে পারে। আপনি নিজেও যদি science (বিজ্ঞান) শিখে নেন, তাহ'লে ভাল হয়। আর, আমি কচ্ছিলাম, politics ও administration (রাষ্ট্রনীতি ও শাসন-ব্যবস্থা) সম্বন্ধে আমাদের দেশে বাস্তবে কি-রকম কী ছিল, সেগুলি ভাল ক'রে জেনে নিতে। আমাদের দেশ কোন্ বিষয়ে কি-রকম ছিল, তা' যদি না জানি, তাহ'লে ভবিষ্যতে দেশকে গ'ড়ে তোলা মুশকিল হবে।

শরৎদা—রামায়ণ, মহাভারত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মনুসংহিতা ইত্যাদি বই থেকে এসব বিষয়ে অনেক কথা জানা যায়। প'ড়ে-শুনে মনে হয়, বর্ত্তমানের তুলনায় তখন দেশ আরো advanced (উন্নত) ছিল। প্রজার মঙ্গলসাধনই ছিল তখন রাজার প্রধান কর্ত্তব্য। রাজার আত্মনিয়ন্ত্রণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হ'তো। কথা ছিল—রাজা যদি জিতেন্দ্রিয় হন, তাহ'লেই তিনি উপযুক্ত-ভাবে শাসন করতে পারবেন। রাজা ধর্ম্মভ্রষ্ট হ'লেই যে রাজ্য, ঐশ্বর্য্য সব নষ্ট হ'য়ে যায়, এ-কথা ছিল সর্ব্ববাদীসম্মত। রাজধর্ম্মের একটা বিশেষ প্রাধান্য ছিল, কারণ, রাজধর্ম্মদ্বারাই সকলে protected (রক্ষিত) হয়। সে-কালে রাজাদের স্বেচ্ছাচারী হবার উপায় ছিল না। সমাজ ও ধর্ম্মের অনুশাসন তাদের মেনে চলতে হ'তো। রাজার মন্ত্রিসভায় সব বর্ণের লোকই থাকতেন। রাজা মন্ত্রিসভার সঙ্গে ব'সে যে-সব সিদ্ধান্ত করতেন, তা' আবার প্রজাদের মধ্যে প্রচার ক'রে তাদের মতামত জানা হ'তো। বিশেষক্ষেত্রে প্রজাদের রাজা মনোনীত করবার কথাও পাওয়া যায়। আগের কালে আইন-প্রণয়ন করতেন ঋষিরা। জ্ঞানীর সম্মান ছিল রাজার অবশ্যকরণীয়। আজকালকার মতো আগেও রাজাদের বাজেট পেশ করতে হ'তো। Reserve fund (সংরক্ষিত তহবিল) যা'তে ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়, সেদিকে নজর দিতে হ'তো। সৈন্যবল-বৃদ্ধির উপরও যথাযথ দৃষ্টি ছিল। রাজ্যমধ্যে ভিক্ষুক, দস্যু, দরিদ্র ও মূর্খ থাকা ছিল রাজার পক্ষে দোষণীয়। দুর্ভিক্ষের সময় রাজকর আদায়ের বিধান ছিল না। কর-গ্রহণের বেলায়ও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা হ'তো যা'তে প্রজাগণ পীড়িত না হয়। কৃষিই ছিল তখন লোকের প্রধান উপজীবিকা। কৃষির উন্নতির জন্য তাঁরা অনেক কর্ম্মচারী নিয়োগ করতেন। Irrigation-এর (জলসেচনের) সুব্যবস্থা ক'রে দিতেন। শুনেছি, পূর্ব্বে বায়ুর সাহায্যেও ক্ষেতে জল দেওয়া হ'তো। অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্য দুইরকম বাণিজ্যের প্রসারের প্রতিই রাজা লক্ষ্য রাখতেন। শিল্পের সমাদরও তাঁরা বিশেষভাবে করতেন এবং উপযুক্ত যারা তাদের নানাভাবে পুরস্কৃত করতেন। জনস্বাস্থ্যের প্রতি তাঁদের খুব লক্ষ্য ছিল। প্রত্যেকে যা'তে বিহিত সদাচার পালন ক'রে চলে এবং বর্ণাশ্রমের ব্যত্যয় না ঘটায়, সেদিকে কড়া নজর ছিল। আমি বিভিন্ন জায়গায় যা' পড়েছি, খাপছাড়াভাবে তার কিছু-কিছু বললাম। কিন্তু সত্যিই ওগুলি খুব ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের দেশের প্রধান জিনিস ছিল, ভাল মানুষ আমদানী করা এবং তাদের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী উৎকর্ষের ব্যবস্থা করা। আপনারা খেটে-পিটে আবার তার ভিতটা পত্তন ক'রে দিয়ে যান। (সুর ক'রে)—মন রে তুমি কৃষিকাজ জান না, এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা। ....একটু পরে হাসতে-হাসতে বলছেন—চাণক্যের মতো লোক দরকার, শিবাজীর মতো লোক দরকার। খুব ধুরন্ধর না হলি এই বাজারে হবি নানে।

শয়তানের উপর শয়তানী ক'রে তাকে দিয়েও পরমপিতার কাজ বাগায়ে নিতে হবে। তক্ষকের মতো হওয়া চাই। শয়তানী আমিও নিতান্ত কম জানি না, লোক পালি সব মিসমার ক'রে দেওয়া যায়। কিন্তু সব কথা আলোচনা করা ভাল না। আবার, আলোচনা করলেও অনেকে উল্টো বোঝে। যাই ক'ন, ইষ্টপ্রাণ চতুর লোকের প্রয়োজন খুব বেশী। (অলপক্ষণের মধ্যে তাঁর চোখেমুখে নানা ভঙ্গিমার বিজলী চমক খেলে গেল।)

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার ওখান থেকে উঠে একবার প্রস্রাব করতে গেলেন। সেখান থেকে ফেরবার পথে কাজল ভাইকে একটু আদর ক'রে আসলেন। তারপর আবার এসে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় বসলেন। হরপ্রসন্নদা (দাস) এসে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হরপ্রসন্ন, এবার ব'লে অসম্ভব কান্ড করিছ! কেষ্টদা ও মন্মথদার কাছে শুনলাম।

হরপ্রসন্নদা—কী যে করলাম, তা' তো বুঝতে পারি না। নানা জায়গায় ঘুরেছি আর লোকের কাছে আপনার কথা বলেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো! তদ্‌গতচিত্তে যে করে, সে আর বুঝতে পারে না, কী করলো। সুর ক'রে—'মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবম্।'

একটা আকুল মূর্চ্ছনা ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো চতুর্দ্দিকে। শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখেমুখে এক ললিত-মধুর ভাবের আবেশ। সবাই মুগ্ধনেত্রে চেয়ে রইলেন সেদিকে।

বিরাজদা (ভট্টাচার্য্য) একটু পর প্রশ্ন করলেন—রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক ব্রাহ্মণের মধ্যে বিবাহপ্রথা চালু করা সম্বন্ধে আপনার কী মত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কোন আপত্তি নেই। তবে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে খুব হিসেব ক'রে দিতে হয়, দেখতে হয়, যা'তে কোনমতে প্রতিলোম সংস্রব না ঢোকে, হিসাব ক'রে inter-provincial marriage (আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহ) যদি চালান যায়, তা'তে সারা ভারতের সংহতির দিক দিয়ে অনেকখানি সুবিধা হয়। আর স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও বোধ হয় ভাল হয়।

অতুলদা (পুততুন্ড)—খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে নাকি বিধান আছে, ঘৃতপক্ক জিনিস অন্য জাতির হাত থেকে খাওয়া যায়। তার কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর থেকে বোধ হয় infection (সংক্রমণ) কম হয়। সদাচারের প্রধান জিনিস হ'লো physical (শারীরিক) ও mental (মানসিক) contamination (দুষ্টি) এড়িয়ে চলা। অনেক সময় mental contamination-এর (মানসিক দুষ্টির) দিকে চেয়ে যেখানে-সেখানে না খাওয়া ভাল। প্রত্যেকের মানসিক অবস্থা-অনুযায়ী তার থেকে একটা

radiation (বিকিরণ) বেরোয়, সেই radiation (বিকিরণ) আবার অন্যকে influence (প্রভাবিত) করে। সেই জন্য শুধু খাওয়া কেন, সবাইকে সব সময় ছোঁয়াও ভাল নয়—বিশেষতঃ মানুষ যখন সাধন-ভজন, ব্রত-প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি নিয়ে ব্যাপৃত থাকে। এগুলি কোন কুসংস্কারের কথা নয়। সাদা চোখে দেখা যায়। আবার, সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কার করলে তা'তেও ধরা পড়তে পারে। সদাচার নিয়ে আমাদের দেশে কিছুটা বাড়াবাড়ি হয়েছে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ধীইয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, প্রত্যেকটার পিছনে তাৎপর্য্য আছে। তবে কোন্টা কেন করব বা করব না—এটা জানা না থাকলে ধীরে-ধীরে অজ্ঞতা ও অবান্তর গোঁড়ামি ঢুকে পড়ে। কিন্তু এটা ঠিক জেনো—সদাচারের মধ্যে ঘৃণার কোন স্থান নেই। আমি একবার কলকাতায় এক মেসে খিচুড়ীর সঙ্গে পেঁয়াজ খেয়ে রাত্রে ১০৫ ডিগ্রী জ্বর উঠে গেল। পরে আমার মনে হ'লো, যারা পেঁয়াজ খায়, সবারই অমনতর উত্তাপ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, কিন্তু খেতে-খেতে অভ্যস্ত হ'য়ে যাওয়ার দরুন ঐ অস্বাভাবিক রকমটাকেই তাদের স্বাভাবিক লাগে, তাই তারা পরে আর ঠাওর করতে পারে না। তার মানে, nerve-এর (স্নায়ুর) sensation (বোধ) কতখানি irregular (অনিয়ন্ত্রিত) হ'য়ে যায়, তাই বুঝে দেখ।

এরপর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী), বীরেনদা (মিত্র), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), পণ্ডিত (ভট্টাচার্য্য), মনোরঞ্জনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রভৃতি আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সবাইকে একসঙ্গে আসতে দেখে খুশি হ'য়ে বললেন—আপনার সঙ্গে যে একদঙ্গল লাগেই থাকে, এ আমার খুব ভাল লাগে। বৃদ্ধোপসেবনের মধ্য-দিয়ে যে মানুষ কত জিনিস পায়, তার ঠিক নেই। একসঙ্গে ওঠা-বসা, আলাপ-আলোচনা করা, কাজকাম করা—এর ভিতর-দিয়ে অনেক পাওয়া যায়। (চুনীদার দিকে চেয়ে)—দ্যাখ্, অলস আড্ডায় কিন্তু ভাল হয় না। অনুসন্ধিৎসু সেবাবুদ্ধি নিয়ে সঙ্গ করতে হয়। কেষ্টদার সঙ্গে হয়তো তুমি খেয়ে উঠলে, কেষ্টদা আঁচাবার সময় হয়তো জিভটা দিয়ে দাঁতের গোড়াটা বুলোচ্ছে, তাই দেখেই যদি বুঝতে না পার যে কেষ্টদার একটা দাঁত-খোঁচার খড়কে দরকার, এবং তখনই যদি সেটা এনে না দেও, তাহ'লে কিন্তু অনেক খাঁকতি থেকে যাবে। অনেক সময় আমাদের নজরেই পড়ে না। নজরে না পড়া মানে, বেহুঁশ হ'য়ে আছি। জড়তা আমার উপর আধিপত্য করছে।

কেষ্টদা—সেবা করা ভাল, কিন্তু সেবা নেওয়া ভাল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারও সেবা নেওয়ায় তার যদি ভাল হয়, তা' নেবেন না কেন? আবার, আপনার যাকে সেবা করার তাকে করবেন। স্নেহের পাত্র যারা, তাদেরও সেবা করা যায়। ধরেন, আপনাকে হয়তো একজনে ৫টা ফজলি আম খেতে দিয়ে

গেছে, আপনি কেটেকুটে সকলকে যদি ভাগ ক'রে দেন ও নিজেও খান, তা'তে তো আটকায় না।

কেষ্টদা—আগে আপনি অনেককে কত গায় তেল মাখিয়ে পর্য্যন্ত দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এখনও সেবা করতেই লোভ হয়, সেবা নিতে ভাল লাগে না। প্রথম-প্রথম সেবা নিতে খুব কষ্ট হ'তো, কিন্তু মানুষ মনঃক্ষুণ্ণ হয় ব'লে নিতে বাধ্য হতাম, তারপর পায়ের অসুখ হ'য়ে অনেকখানি বেকায়দায় প'ড়ে গেলাম।

এমন সময় শরৎ কর্ম্মকার-দাকে আসতে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর সোল্লাসে ব'লে উঠলেন—এই যে নিয়ন্তাজী এসে গেছে। শরৎদা স্বস্তিবাহিনীটা যদি ঠিক-ঠিক গ'ড়ে তুলতে পারে, তাহ'লে একটা কামের কাম হয়। সেইদিন সন্ধ্যায় হোম-কুণ্ডের সামনে যখন মন্ত্রপাঠ ক'রে স্বস্তিসেবকরা আহুতি দিচ্ছিল, আমার কিন্তু দূর থেকে সে দৃশ্য খুব ভাল লাগছিল। দেখেন, nurture (পোষণ) যদি দিতে পারেন, তাহ'লে ঠিক পাবেন, কতখানি instinctive wealth (সহজাত সম্পদ্) জাতের মধ্যে dormant (সুপ্ত) র'য়ে গেছে। এমনি ঠিক পাওয়া যায় না, বর্ণচোরা আমের মতো থাকে। সেই দিন ভাইদের লাঠিখেলার সময়ও দেখলাম, কয়েকজনের চোখেমুখে যেন ঝিলিক দেয়। মাল আছে, মাল আছে, খুঁজে বার করতি হবি। রাত একটা, অভিনয় অনেক। তাই speed (বেগ) খুব বাড়ায়ে দেওয়া লাগবি। আপনার একখানা গাড়ী থাকলি কিন্তু কাজের খুব সুবিধা হয়।

শরৎদা—এখন যুদ্ধের বাজারে অসুবিধা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী যে ক'ন? ও-সব ব্যাটাছেলের কথা না। 'মারি অরি, পারি যে কৌশলে।' অবস্থা ও পরিস্থিতি যত জটিল দেখি, আমার তো তত স্ফূর্ত্তি লাগে যায়, ভাবি, এই তো আমার সুযোগ। এটা ঠিক জানবেন—পরিস্থিতি যত প্রতিকূল হবে এবং তাকে যতখানি কাবেজে আনতে পারবেন, ততখানি কিন্তু আপনার বড় হবার সুযোগ। আপনাদের movement-এর (আন্দোলনের) যে stand (দাঁড়া), আপনারা যদি চলতে জানেন, কে যে আপনাদের নিজের ক'রে নেবে না, জানি না।

৭ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৯ (ইং ২৩।৭।৪২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে খেপুদার বারান্দায় একখানা বেঞ্চের উপর ব'সে আছেন। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি হ'চ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে লোকজন বেশী নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণাস্য হ'য়ে ব'সে বৃষ্টি দেখছেন। কেমন যেন একটা উদাস, আনমনা ভাব। পরে সরোজিনীমাকে বলছেন—এক-এক সময় হঠাৎ মা'র কথা

মনে প'ড়ে মনটা বিষণ্ণ হ'য়ে যায়। দুনিয়াটা মনে হয় ফাঁকা।

সরোজিনীমা—তবু তো আপনি মনের দুঃখ মনে চেপে সকলের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা স্বভাবে করায়। কাউকে নিজে থেকে আলাদা ভাবতে পারি না। তাই নিজের স্বস্তির জন্যই প্রত্যেকের জন্য যা' পারি করতে চেষ্টা করি। এমনি ক'রে অনেকখানি ভুলে থাকি। নচেৎ মা'র কথা মনের কোণে অল্পবিস্তর লেগেই থাকে।

ধীরে-ধীরে বৃষ্টি ক'মে আসলো। বাবলাতলার নীচেটা খানিকটা জায়গায় মাঝে-মাঝে বৃষ্টির দরুন পিছল হয়েছে। একটি মা ঐ পথ দিয়ে যাবার সময় প্রায় আছাড় খাচ্ছিলেন আর কি। তাই দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বঙ্কিমদাকে ডাকিয়ে ঐ জায়গাটা চেঁছে ফেলে খানিকটা সুরকি ও বালি ওখানে দেবার ব্যবস্থা করতে বললেন।

বঙ্কিমদা (রায়) নির্দ্দেশমতো ব্যবস্থা করলেন।

রাধারমণদা (জোয়ার্দ্দার)—আমি আগেই বলেছিলাম কয়েকখানা ইঁট পেতে দেবার কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বললে তো হয় না, হয় নিজে করতে হয়, না হয়, কাউকে দিয়ে করিয়ে নিতে হয়। শিরদার তো সরদার।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে রাধারমণদাকে বললেন—দ্যাখ্, আমরা কথাই কইতে জানি না। কী উদ্দেশ্যে কোন্ কথা কচ্ছি, তাই-ই খেয়াল থাকে না। অনেক সময় নিজেদের কথা দিয়েই নিজেদের উদ্দেশ্যকে পণ্ড ক'রে তুলি। তুমি হয়তো একজনের কাছে গেছ তার সাহায্যে কোন কাজ উদ্ধার করতে। কথাটাই হয়তো এমনভাবে পাড়লে যা'তে সে চ'টে গেল। অথচ তোমার খেয়াল নেই যে তুমি কী করছ। খানিকটা বাগ্-বিতণ্ডা, চটাচটি ক'রে পরে হয়তো ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে আসলে, আর লোকের কাছে তার নিন্দা ক'রে বেড়াতে লাগলে। কিন্তু এতে তোমার ফয়দাটা হ'লো কী? তাই নিজের কথাবার্ত্তা, ব্যবহারকে নিজের শত্রু ক'রে রেখো না। সেগুলি যেন তোমার বান্ধব হয়।

রাধারমণদা—মনে তো অনেক মতলব আঁটি, কিন্তু কাজের সময় ওলটপালট হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যাপারটা হ'চ্ছে কী জান? আদর্শের উপর বা সত্তার উপর অনুরাগ যদি ঢিলে থাকে, তাহ'লে আদর্শ বা সত্তার স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে গায় বাধে না। কাল তুমি বঙ্কিমের সঙ্গে যেভাবে কথা বলছিলে, তা' দেখে আমার মনে হচ্ছিল, আমার যে কাজের দায়িত্বটা তুমি নিয়েছ, সেটা তুমি থোড়াই কেয়ার কর। সেই কাজটা হাসিল করার জন্য তোমার মনটা রঙ্গিল ক'রে তোলনি। তা' যদি করতে তবে ওভাবে ওকে চটিয়ে দিতে না। সাধনা মানে—নিজের

যা'-কিছুকে ইষ্টানুগ উদ্দেশ্যের অনুপূরক ক'রে তোলা।

রাধারমণদা—কি রকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার কথাবার্ত্তা, চালচলন, আচার-ব্যবহার, অভ্যাসগুলি এমন দুরস্ত ক'রে তুলতে হবে যা'তে যখন আমি যে-কাজ তোমাকে দিই, কিংবা তুমি নিজে থেকে আমার যে-কাজের দায়িত্ব নাও, এক-কথায় মঙ্গলকর যা'-কিছুই তুমি করতে চাও, তা' করার পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি না হয়। যেখানে, যে-অবস্থায়, যে-কাজে, যার সঙ্গে যেমন করা লাগে তাই করতে হবে। এতে নরমও লাগবে, গরমও লাগবে, কিন্তু সবটা নিজের control-এ (আয়ত্তে) থাকবে। Self-control (আত্মসংযম) নিয়ে যদি কেউ ঝগড়া করে, তা'ও কত মিষ্টি লাগে। গোপাল এই দিক দিয়ে খুব ঝানু ছাওয়াল ছিল।.......... চলার পথে কেষ্ট-ঠাকুরের কথা সব সময় স্মরণ রাখবি। গিরীশ ঘোষ ভীমের মুখ দিয়ে কওয়াইছেন, বড় সুন্দর—(অভিনয়ের ভঙ্গীতে)—

"অতি ছল, অতি খল, অতীব কুটিল,
তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল,
তুমি লজ্জাহীন, তোমারে কি লজ্জা দিব
সম তব মান-অপমান
নহে ক্ষত্র হ'য়ে কহ, কৃষ্ণ, ক্ষত্রিয়-সদনে
পরাজয়-ভয়ে রণে হও পরাঙ্মুখ!
নিন্দা-স্তুতি সমান তোমার
কি হইবে রুষ্ট কথা ক'য়ে?
কিন্তু নাম ধর ভক্তাধীন,
কায়মনোপ্রাণ অর্পণ করেছি রাঙ্গা পায়,
তথাপি যদ্যপি তুমি না বুঝ বেদনা,
রণস্থলে, দেবতামণ্ডলে
উচ্চকণ্ঠে করিব প্রচার—
নহ তুমি লজ্জানিবারণ!
নহ কভু ভক্তাধীন!
নহে কেন কর হতমান?
হ'লে কণ্ঠাগত প্রাণ—
কৃষ্ণনাম আর না আনিব মুখে!"

নিন্দাস্তুতি যে যাই করুক, তিনি কিন্তু উদ্দেশ্যে অমোঘগতি।

একটি মা এসে প্রণাম ক'রে বললেন, ঠাকুর! আমার কয়েকটি কথা জানবার আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে বললেন—বল্।

উক্ত মা—সেবা-যত্ন করা সত্ত্বেও যদি কারও মন পাওয়া না যায়, সেখানে করা যায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেবার প্রধান জিনিস হ'লো মানুষের মনটাকে উৎফুল্ল ও আনন্দিত ক'রে তোলা। তা' যদি না করতে পারলে তবে জানবে, সেবা করা হয়নি। অনুসন্ধিৎসু নজরে মানুষের প্রয়োজনকে বোধ ক'রে নিয়ে, তবে তার পূরণ করতে হয়। এতে মানুষ খুশি হয়। তার জীবনীয় খুশিটাই যেন তোমার কাম্য হয়। কোন রকম স্বার্থ-চাহিদা নিয়ে সেবা করতে গেলে, তার পূরণ না হ'লেই মনে ক্ষোভের সঞ্চার হবে, এবং সেবার ভিতরও তার অভিব্যক্তি দেখা যাবে, তা'তে ফল হবে উল্টো।

সরোজিনীমা—নিজের জন্য কোন চাওয়া থাকবে না, এ তো কঠিন কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কঠিন কিছু না। তোমার ছাওয়ালের ভালটাকে যেমন নিজের ভাল ব'লে মনে কর, এই রকমটা আর কী! ভালবাসলেই এই রকম আসে। তবে প্রীতি-প্রত্যাশা ব'লে জিনিসটা থাকেই। তোমার খোকা তোমাকে যদি ভাল না বাসে, যদি তাচ্ছিল্য করে, তাহ'লে কিন্তু তোমার মনে লাগবেই। তা' সত্ত্বেও তুমি কিন্তু তার মঙ্গলই চাও, এবং যা'তে তার মঙ্গল হয়, তাই-ই কর। ভালবাসা জিনিসটাই একটা বেহিসাবী জিনিস। কাউকে সত্যি-সত্যি ভালবেসে ফেললে তার থেকে আর রেহাই নেই। কাউকে ভালবাসলে, তার যা'তে ভাল হয়, তাই করতে ইচ্ছা করে, আর যত তা' করা যায়, ততই ভালবাসা শিকড় গেড়ে বসে। কিন্তু তুমি একজনের জন্য যতই কর না কেন সে যদি তোমার জন্য কিছু না করে, তাহ'লে কিন্তু তোমার প্রতি তার ভালবাসা গজাবে না।

কালিদাসীমা—আমরা তো জানি, কাউকে যদি ভালবাসা যায়, তাহ'লে তার ভালবাসাও পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' সব সময় হয় না। যদি সে ইচ্ছা ক'রে ভাল না বাসে, তাহলে লাখ ভালবাসাও নিষ্ফল হ'য়ে যেতে পারে। অবশ্য একেবারে যে নিষ্ফল হয়, তা' নয়। মানুষ একটা জায়গায় বাঁধা আছে, সেটা হ'ল তার জীবন। এই জীবনের পরিপোষণ যেখান থেকে পায়, তাকে সে দীর্ঘকাল অবজ্ঞা ক'রে চলতে পারে না। তাই শেষ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হয়। কিন্তু স্বার্থের খাতিরে আকৃষ্ট হওয়া ও ভালবাসার টানে আকৃষ্ট হওয়া এ দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক আছে। তবে ভালবাসা পাক বা না পাক, যে ভালবাসতে পারে, সে শেষ পর্য্যন্ত লাভবান হয়। আমি মানুষকে ভালবেসে কম দাগা পাইনি জীবনে। কিন্তু তবু আমার একটা আত্মপ্রসাদ এই আছে যে, আমার তরফ থেকে আমি সকলের ভালতেই বাস ক'রে চলেছি। তাই মনে আমার কোন দুঃখ নেই। ভালতে ব্যাপৃত থাকলে ভালই কাটে জীবন। আর, সদ্ভাবে ভাবিত হ'লে তার

সংস্পর্শে অন্যের অন্তর্নিহিত সদ্ভাবও পুষ্ট হ'য়ে ওঠে। তাই সব দিক দিয়েই লাভ।

সুরমামা—আপনাকে ভালবাসতে ইচ্ছা করে, কিন্তু প্রাণভ'রে ভালবাসতে পারি না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাকে যদি ভালবাসতে ইচ্ছা করে, তাহ'লে দেখতে পাবে, তোমার করা, বলা, ভাবা, চলন, চরিত্র, ব্যবহার—সবই আমাকে, আমার ইচ্ছাকে অনুসরণ ক'রে চলছে, তা' যদি না করে, তাহ'লে বুঝবে—ইচ্ছা খাঁটি নয়, ওর মধ্যে গলদ আছে।

আশ্রমের এক দাদা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—তার মেয়ে রাস্তা দিয়ে কাশীপুর যাবার সময় কয়েকটি ছেলে বিসদৃশ ইঙ্গিত করেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মেয়েকে একলা-একলা যেতে দাও কেন? তোমাদের নিজেদের দোষই তো বেশী। মেয়ে পালা কি সহজ কথা? মায়েরাই যে ভাল ক'রে জানে না, মেয়েরা একটু বড় হ'লে তাদের কিভাবে চালনা করতে হয়। যে-সব ছেলেরা মেয়েদের প্রতি অভদ্র ইঙ্গিত করে, তারা তো অমানুষ! তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়াই উচিত। কিন্তু আমি ভাবি—আমরা মেয়েদের এমন ক'রে তুলতে পারব না কেন, যা'তে তাদের দেখে অতি বড় পাষণ্ডও শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে নত হ'য়ে ওঠে! তাদের ভিতর অমনতর ব্যক্তিত্ব গজিয়ে তুলতে যেমনতর শিক্ষার প্রয়োজন, তাই তাদিগকে দিতে হবে। কোমল ও কঠোর দুইয়েরই বিহিত সমাবেশ করতে হবে। তাদের একটা ভ্রূকুটি দেখেই যেন ভয়ে মানুষের হাড় কেঁপে যায়।......... যাহোক, ঐ ছেলেগুলি সম্বন্ধেও খোঁজ হাটাও। ভবিষ্যতে এমনতর ব্যাপার যা'তে না ঘটতে পারে, তার ব্যবস্থা কর। বঙ্কিমের সঙ্গে আলাপ কর। খারাপ কিছুর প্রতিবিধান করতে গিয়েও খুব সাবধানে করতে হয়, যা'তে reaction (প্রতিক্রিয়া) না হয়।

এখন ভজহরিদা (পাল), গোপেনদা (রায়), উমাদা (বাগচী), প্রকাশদা (বসু), তারকদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রভৃতি আরো অনেকে এসে জড় হয়েছেন। তাঁকে ঘিরে একটা অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যের পরিমণ্ডল রচিত হয়েছে, যেখানে এসে মানুষের দুঃখজ্বালা স্বতঃই নিবারিত হয়, অন্তর ভ'রে ওঠে স্বাচ্ছন্দ্যের সুধাস্বাদে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভজহরিদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কিরে, কী খবর?

ভজহরিদা—ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টদার সঙ্গে আলাপ করিছিস?

ভজহরিদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব শুনে-মিলে ঠিক ক'রে নিয়ে যা। খেপুর সঙ্গেও কথা বলিস। এখানকার জন্য লোক জোগাড় ক'রে কিছু দেওয়াই চাই। আর,

টাকার ব্যবস্থাও করবে। তোমরা এমনভাবে প্রস্তুত থাকো, যা'তে অবস্থা যতই ঘোরালো হোক না কেন, কিছুতেই ব্যাহত হ'তে না হয়। আবার, দেশজোড়া যদি বিপদ আসে, তখন শত চেষ্টায়ও নিজেরা ভাল থাকা যাবে না। তাই, আত্মরক্ষার জন্যই সবাইকে সংহত ক'রে তোল। কন্‌ফারেন্সে যা'-যা' আলোচনা হয়েছে, সবগুলিকেই রূপ দেওয়া চাই। সময় বড় সঙ্গীন। এমন ক'রে বাঁধের পর বাঁধ দিয়ে-দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে যে, একটা বাঁধ ভাঙ্গলেও যেন বিপর্যস্ত হ'য়ে না পড়ি। ভবিষ্যৎকে এ'চে নিয়ে আগে থাকতে প্রস্তুত হওয়া লাগবে। নচেৎ, বিপদ এমন হুড়মুড় ক'রে ঘাড়ের উপর এসে পড়বে যে সামাল দেওয়া যাবে না। আশ্রমের নিরাপত্তা-বিধান করাই চাই। এটা শুধু আত্মরক্ষার তাগিদে নয়। দেশের, দশের জন্য যদি কিছু করতে চাও, নিজেদের স্থিতিটা পাকা না হ'লে কিছুই করতে পারবে না।

ভজহরিদা—শুধু এই কাজ নিয়ে লেগে থাকলে অনেকখানি করা যায়, কিন্তু তা'তে তো আবার সংসার চলে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার সংসার যদি ঠিক রাখ, তবে দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়েও নিজের সংসার ঠিক থাকবে। কিন্তু suffer (কষ্ট) করা লাগবেই। আর তা' না ক'রে নিজের সংসার যদি ঠিক রাখতে চাও, তবে সে সংসারের তলা শূন্য হ'য়ে যাবে। একটা সোনার অট্টালিকা যদি কর, অথচ তার ভিত যদি ঠিক না কর, তাহ'লে তার অস্তিত্ব কতক্ষণ? নীচের মাটি স'রে গিয়ে তার সলিলসমাধি হ'য়ে যেতে পারে। তাই, আমি যা' কচ্ছি তা' যদি কর, তা'তে আশেপাশের সবাইকে নিয়ে অন্ততঃ প্রাণে বাঁচবে। দুধেভাতে থাক বা না থাক। পরিবেশকে বাদ দিয়ে একলা যদি কোনভাবে টিকে থাকতেও পার, যদিও তা' সম্ভব নয়, তাহ'লে তা'তে তোমার লাভ কী? তোমার আপন যারা, তারা যদি রক্ষা না পায়, তাহ'লে তোমার বাঁচাটাই যে হবে একটা দিগ্‌দারী। তাই আমি যা' বলি তাই কর, দেখবে, তোমার স্বার্থই পূরণ হবে।

এমন সময় দুর্গানাথদা (সান্যাল) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুর্গানাথদা, কেমন আছেন?

দুর্গানাথদা—ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি রোজ একটু ক'রে তিল-বাটা যদি ভাতের সাথে মেখে খান, ভাল হয়। আপনার চোখের দিক দিয়েও ভাল হয়, আর, শরীরটাও পুষ্ট হয়। তিলে প্রোটিনের মাত্রা শুনেছি খুব বেশী।

দুর্গানাথদা—রোজ বাটা একটা হাঙ্গামা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শরীর যা'তে ভাল থাকে তা' করতে যে হাঙ্গামা, তা'তে অভ্যস্ত হ'লে অসুখ-বিসুখের হাঙ্গামা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। রোগভোগের হাঙ্গামাটা কি নিতান্ত কম?

একটু পরে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার সেরেস্তার কাজ-কাম কেমন চলছে?

দুর্গানাথদা—মোটামুটি চলছে। আরও দুই-একজন ভাল লোক দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনিও দেখেন, আমিও দেখি। কাজ তো দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। আর, কাগজপত্র সব এমনভাবে ready (তৈরী) রাখবেন, যা'তে একটা অজান মুখ্যু মানুষও ঠিক পায়, জমিজমা আমার কোথায় কতখানি আছে, তার চৌহদ্দি কী, খাজনা কত, মালেক কে, খাজনা কত পর্য্যন্ত দেওয়া আছে, বর্গা যদি দেওয়া হ'য়ে থাকে, কাকে দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি। জমিগুলি মাপার ব্যবস্থা করাও ভাল। যে-সব জমির ব্যাপারে কোন dispute (দ্বন্দ্ব) আছে, সেগুলিও তাড়াতাড়ি ফয়শালা করা দরকার। রেকর্ডপত্র যাবতীয় যা'-কিছু সব একেবারে ঝকঝকে-তকতকে ক'রে রাখবেন।

দুর্গানাথদা—অনেক খাটা লাগবি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো! না খাটলি কি হয়? যাই করেন, তাই যদি নিখুঁত ও সুন্দর ভাবে করেন, তা'তে জীবনটাও নিখুঁত ও সুন্দর হ'য়ে উঠবে। সেইটেই সব চাইতে বড় লাভ। তাই খাটা ভাল।

পীযূষ ব'লে তপোবন বোর্ডিংয়ের একটি ছেলে এসে বললো—ঠাকুর! আমার ঘুম বড় বেশী। সন্ধ্যাবেলায় যখনই পড়তে বসি, ঘুম পায়, তাই পড়া আর হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাত্রে যদি যাত্রা বা থিয়েটার দেখতে যাস বা গল্প-গুজব করিস, তাহ'লেও কি ঘুম পায়?

পীযূষ—না। পড়তে গেলেই ঘুম আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে ঘুম যে তোর বেশী, তা' নয় কিন্তু। পড়াশুনোটা আর একটু ভাল লাগলে, ওতেও ঘুম পাবে না। আচ্ছা, পড়াশুনোর মধ্যে তোর কোন্ subject (বিষয়) সব চাইতে ভাল লাগে?

পীযূষ—অংকই আমার সব থেকে ভাল লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে সন্ধ্যাবেলায় অংক করবি। অংক যখন ভাল লাগে, তখন অংক করতে গিয়ে ঘুম না-ও পেতে পারে। অংক কষতে গিয়ে যদি ঘুম না পায়, তবে পরে অন্য যে subject (বিষয়) তোর কাছে ভাল লাগে, সেই subject (বিষয়) সন্ধ্যাবেলায় পড়িস। এইভাবে আস্তে-আস্তে অভ্যাস হ'য়ে যাবে। আর, যদি ঘুম আসার ভাব হয়, তখন উঠে একটু ঘুরে-ফিরে বেড়াবি, কিংবা কারও সঙ্গে গল্প-গুজব করবি। পরে আবার পড়তে বসবি। ঘুম যদি আসে, তবে বই বন্ধ করে রেখে কারও সঙ্গে পড়াশোনার বিষয় নিয়ে আলোচনা করাও ভাল। নিজের পড়া বন্ধ রেখে অন্য কোন ছেলেকে, তুই ভাল জানিস, এমনতর কোন বিষয় যদি বোঝাস, তাহ'লেও দেখবি, ঘুম না পাওয়ার কথা। এইভাবে

নানা এৎফাঁক ক'রে দেখবি—ঘুম কোথায় পালিয়ে যাবে। পড়তে গেলেই যে ঘুম পায়, তা' আর হবে না।

ছেলেটি প্রণাম ক'রে যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—অনেকেরই শরীর-মন এত দুর্ব্বল যে মাথার উপর একটু চাপ পড়লেই, তা' আর stand করতে (সইতে) পারে না। নিদ্রা, আলস্য, অনিচ্ছা ইত্যাদি এসে ঘিরে ধরে। এর পিছনে অনেক সময় জন্মগত কারণ থাকে। পিতা-মাতার ভিতর অনুরাগ ও লাগোয়াবুদ্ধির অভাব থাকে। তাই, সন্তানও হয় ক্ষীণমনা। বাধাকে বাধ্য ক'রে উদ্দেশ্য সাধনের পথে এগিয়ে যাবার মতো দৃঢ়তা থাকে না। Struggle (সংগ্রাম)-এর ভিতর পড়লে এরা জলেডোবা মানুষের মতো হয়। জীবনই হ'য়ে ওঠে দুর্ব্বহ, দুঃসহ। এমনি হয়তো ভাল মানুষ, কিন্তু করিৎকর্ম্মা হ'তে পারে না। খুব sympathetic ও psychological nurture (সহানুভূতি-পূর্ণ ও মনোবিজ্ঞান-সম্মত পোষণ) দিয়ে এদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। তাই, বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন সুনিয়ন্ত্রিত না হ'লে জাতীয় উন্নতি কঠিন কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুশিমনে তামাক খাচ্ছেন।

এমন সময় শৈলমা রাগতকণ্ঠে এসে বললেন—আমি ওদের বাড়ীতে আর থাকতে পারব না। (তিনি এক বাড়ীতে একটি রোগীর শুশ্রূষা করছিলেন)। যে পারে, সে যেয়ে করুকগে। আমার অতো সয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (গম্ভীর কণ্ঠে)—না পারিস চ'লে আয়! তোকে থাকতে কয় কে? ওদের ভাগ্যে যা' আছে তা' হবে। তুই কি মনে করিস, তুই ছাড়া আমার আর লোক নেই? আর, মনে করিস না, মানুষেরটা ক'রে তুই তাদের বা আমার খুব উপকার করছিস। এই করার সুযোগ যে পাচ্ছিস, সেই তোর পরম লাভ। এই সব বাদ দিয়ে নিজের খেয়ালে চ'লে দেখ্ না? তখন দেখতে পাবি মজা। মনে করিস না, আমার নিজের গরজে কাউকে কিছু করতে বলি। তুই করিস আর না করিস, আমার কিছু আটকাবে না। কিন্তু না ক'রে দেখিস—তোর অবস্থাটা কেমন হ'য়ে ওঠে! অহঙ্কার ভাল না, ওতে পতন অনিবার্য্য। পরম-পিতার রাজ্যে খুব বিনীত হ'য়ে থাকতে হয়। আমি শুধু তোমার কথা বলছি না—অনেকেরই ভাব দেখি—তারা যেন আমার জন্য কত কী করছে। কিন্তু তারা নিজেরা যে কতখানি রেহাই পেয়ে যাচ্ছে, পরমপিতা যে তাদের কতখানি দুর্ভোগ কাটিয়ে দিচ্ছেন, তা' আর তারা ভাবে না।

শৈলমা (কাঁদ-কাঁদ ভাবে)—ঠাকুর! আমার ভুল হয়েছে, আর আমি অমন কথা বলব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, তোর ভুল হবে কেন? তোকে ওখানে পাঠানই আমার ভুল হইছে। তুই আমার কথায় এত কষ্ট করতে যাবি কেন? আর, তুই আমার কথা

শুনে চলবি—এতখানি অভিমানও তো আমার থাকা ভাল নয়। তুই চ'লে আয় ওখান থেকে।

শৈলমা কাঁদতে লাগলেন।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি যা' করতে বলি, তা' করতে গিয়ে যে কষ্ট হয়, সে কষ্টটাকে যদি হাসিমুখে সইতে না পার, তা'তে যদি আমার উপর বিরক্তি, আক্রোশ বা অভিমান আসে, সে-কাজ বরং না করা ভাল। ঐ বিরক্তি বা আক্রোশে তোমার নিজেরই ক্ষতি। ইদানীং তুমি অল্পতেই অস্থির হ'য়ে ওঠ। আমার কোন অনুরোধ বা আবদার সওয়া-বওয়ার মতো ধৈর্য্য তোমার নাই। তাই, বর্ত্তমান অবস্থায় তোমার কিছু দিন বিশ্রাম নিয়ে দেখা ভাল। পরে যদি আগ্রহ হয়, নিজের থেকে গরজ বোধ কর, তখন ক'রো।

শৈলমা—আমার বিশ্রাম নিতে হবে না, আমি এখনই সেখানে যাচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে হাসতে-হাসতে বললেন—আমি মানুষকে তোয়াজ করি ব'লে তারা মনে করে যে প্রত্যেকে আমার কাছে অপরিহার্য্য। হ্যাঁ, একদিক দিয়ে অপরিহার্যই বটে, কারণ, প্রত্যেকের সুস্থ, স্বস্থ, সুদীর্ঘ জীবন আমার আত্ম-স্বার্থেরই সামিল। তাই তোষামোদ, বরামোদ ক'রেও চেষ্টা করি, যা'তে প্রত্যেকে সৎকাজে ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই এত বেকুব যে তারা মনে করে, তারাই আমাকে oblige (বাধিত) করছে। মুখে হয়তো বলে—ঠাকুরেরটা করতে পেরে আমি ধন্য, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে অন্য বোধ থাকে। ভাবে—ঠাকুরের জন্য আমি যথেষ্ট করছি। এই রকম অহঙ্কার থেকে বহু উপসর্গের সৃষ্টি হয়। ভাবে—সঙ্ঘ ও পরিবেশ আমার কাছে ঋণী। তার থেকে আসে প্রত্যাশা। প্রত্যাশার অপূরণে আসে অনুযোগ, অভিযোগ, অভিমান, দোষদর্শন ইত্যাদি। শেষ পর্য্যন্ত হয়তো টিকে থাকতে পারে না। থাকলেও গলদ জমতে থাকে, সাফ করতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে উঠবেন-উঠবেন করছেন, এমন সময় কিশোরীদা একখানা নূতন ধোলাই কাপড় প'রে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিশোরীদাকে দেখে খুশিতে মুখর হ'য়ে বললেন—কী-খবর ডাক্তার?

কিশোরীদা—একটি মা কাপড়খানা আমাকে দিছেন, তার একান্ত আগ্রহ এই কাপড়খানা পরতিই হবে। তাই প'রে আপনাকে প্রণাম করতে আসছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল! খুব ভাল! তোমাকে মানাইছেও বেশ। তোমার চুলদাড়ি কিছু-কিছু পাকিছে বটে, কিন্তু তোমার চেহারার দিকে চাইলে বয়স ঠিক পাওয়ার জো নেই। এখনও বেশ কাঁচা চল-চলে আছ। আর, বরাবর তাই থাক।

কিশোরীদা—আপনার আশীর্ব্বাদ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবেসে কেউ কাউকে কিছু দিচ্ছে শুনলে আমার খুব ভাল লাগে। একটা মানুষ অযাচিত প্রীতি-অবদান কতখানি পায়, তাই দেখে বোঝা যায়, তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব কতখানি। আমি ভাবি, সেবার ভিতর দিয়ে, যাজনের ভিতর দিয়ে তোমরা মানুষের এতখানি হ'য়ে ওঠ, যা'তে মানুষ তোমাদের দিতে আগ্রহশীল হ'য়ে ওঠে। আর, সে দেওয়াটা যেন এতখানি হয়, যার উপর দাঁড়িয়ে তোমরা নিজেরা তো চলতে পারই, বরং আরো দশজনকে প্রতিপালন করতে পার। এমন অবস্থা এনে ফেল যে, দীনতম সৎসঙ্গী পর্য্যন্ত নিজেকে দুর্ব্বল বা অসহায় ব'লে ভাববার অবকাশ না পায়—শুধু তাই নয়, কেউ যেন দীন-দরিদ্র থাকতে না পারে। আর, সৎসঙ্গী বলে বলছি—তার মানে এ নয় যে, অন্যদের তোমাদের দেখতে হবে না। সৎসঙ্গীদের নিয়ে এইভাবে যদি চলতে সুরু কর, তাদের পরিবেশকেও বাদ দিতে পারবে না।

১০ই শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৪৯ (ইং ২৬।৭।৪২)

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রাতে বাবলাতলায় একখানি বেঞ্চের উপর বসেছেন। আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার। সুন্দর রোদ উঠেছে। ভক্তবৃন্দ এসে সমবেত হয়েছেন। তাঁকে ঘিরে আনন্দের হাট বসেছে। ঘরোয়াভাবে নানারকম কথাবার্ত্তা হ'চ্ছে। অতি সাধারণ কথা, কিন্তু তা'ও যেন মধুমণ্ডিত, অপূর্ব্ব রসে ভরা। ক্ষিতীশদা (চৌধুরী) কাল রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরকে গম্ভীরা গান গেয়ে শুনিয়েছেন। সেই কথা উল্লেখ ক'রে বলছেন—ক্ষিতীশের চেহারা যেমন, গলাও তেমনি, একটা sweet masculine (মিষ্টি পৌরুষব্যঞ্জক) ভাব আছে। বামুনের ছেলে, এখন যদি এই কাজ নিয়ে লাগে, বেশ হয়।...........কি রে, বুকে বল-ভরসা পা'স তো, না ভয়-ভয় করে?

ক্ষিতীশদা—আমার যোগ্যতা কতটুকু তা' বুঝতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাজ না করলে তো যোগ্যতা বাড়ে না। ইচ্ছা ও আগ্রহ নিয়ে ঝাঁপ দিতে হয়। পিছটানের বালাই রাখতে নেই। যে-কোন অবস্থা আসে আসুক। আমি করবই—এমনতর পণ যদি থাকে, তাকে আর কেউ রুখতে পারে না।

এরপর মালদহের আমের সম্বন্ধে কথা উঠলো। আমের কলম কেমন ক'রে করা হয় সে-কথা শুনলেন। তারপর বললেন—কৃষি ও ফলফুলাদি সম্বন্ধে আমার অনেক রকম experiment (পরীক্ষা) ক'রে দেখতে ইচ্ছা করে। যাই করতে চাই, তা'তে মানুষ লাগে।

ক্ষিতীশদা—আমাদের মধ্যে তো অনেক লোক আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর Instinct (সহজাত সংস্কার)-ওয়ালা মানুষ লাগে, নইলে

সবাইকে দিয়ে সব কাজ হয় না। দীনবন্ধুদাকে (পাল) দেখিয়ে বললেন—ও যেমন ব্যবসা করে। ব্যবসা-সম্বন্ধে ওর একটা ঝোঁক আছে, তাই করে। আর, এর ভিতর-দিয়ে দু'পয়সা পায়ও। কিন্তু শুধু পয়সার লোভে যদি ব্যবসা করতে যেত, তাহ'লে কিন্তু পারত না। আবার, ওর যদি কখনও লোকসানও যায়, তাহ'লেই যে ও ব্যবসা ছেড়ে দেবে তা' কিন্তু নয়। কারণ, ও জানে, ব্যবসাই ওর পেশা। একবার ঠকে গেলেও আবার লাগবে, ভেবে বের করবে, আমার ত্রুটি কোথায় আর তার সংশোধনে লেগে যাবে। কোন বিষয়ে instinct (সহজাত সংস্কার) থাকলে এমনতর হয়। তা' না হ'লে ঝড়-ঝাপটায় টিকে থাকতে পারে না। তোমাকেও যে এই কাজের কথা বলছি, আমি বলায় তুমি পারবে না, যদি তোমার instinctive urge (সহজাত সংস্কারপ্রসূত আগ্রহ) তোমাকে ঘাড়ে ধ'রে এই কাজে প্রবৃত্ত না করে। সেইজন্য আমার কথায় কাজে নামার থেকে, নিজের আগ্রহে কাজে নামা ভাল। আমার কথায় নামলে পরে যদি দুঃখকষ্টের মধ্যে পড় তখন ভাববে, ঠাকুরের কথা শুনে এই কাজ করলাম, অথচ আজ আমার এত কষ্ট। কিন্তু নিজ আগ্রহে নামলে অমনতর অনুযোগ বা অভিযোগ থাকে না। ঠাকুরের সেবা করব অথচ গায়ে কাঁটার আঁচড়টি লাগবে না—এমনতর বুদ্ধি ভাল না। সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রলোভনেও ঠাকুরের কাজে নামা ভাল না। লাখ কষ্ট হ'লেও ঐ ছাড়া আমার আর কিছু ভাল লাগে না, এমন ভাব যার, তার পক্ষেই এ কাজ শোভা পায়।

চিত্তদা (বন্দ্যোপাধ্যায়)—মানুষ যে-যে পথে যাবে, তা' তো পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর্ম্মের ফলে মানুষের ঝোঁক সৃষ্টি হয়, ঝোঁক-অনুযায়ী সে আবার কর্ম্ম নির্ব্বাচন করে। কিন্তু কার খুশির জন্য সে কাজ করবে, সেটা নির্ভর করে তার ইচ্ছার উপর।

চিত্তদা—ইচ্ছাটা কিসের উপর নির্ভর করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রদ্ধার উপর।

চিত্তদা—শ্রদ্ধাটা কিসের উপর নির্ভর করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃতির উপর। প্রকৃতি মানে প্রকৃষ্ট করা। সেদিক দিয়ে মানুষের পূর্ব্ব কর্ম্ম তাকে অনেকখানি পরিচালিত করে, কিন্তু কর্ম্মের মোড় ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা মানুষের আছে, তাই তার ভরসা অনন্ত। বিল্বমঙ্গল যে-মন নিয়ে একদিন 'চিন্তামণি, চিন্তামণি' ক'রে পাগল হয়েছিল, ঝড়জলের মধ্যে মড়া ধ'রে নদী পার হয়েছিল, সাপের লেজ ধ'রে বাড়ীর দেওয়াল টপকিয়েছিল, নিজের দিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ ছিল না, সেই মন নিয়েই সে ভগবানের জন্য অধীর হ'য়ে উঠেছিল, চোখদুটো মেয়েছেলের প্রতি কামদৃষ্টিতে তাকায় ব'লে তা'ও সে নষ্ট ক'রে ফেলেছিল। অতোখানি আগ্রহ-আকূতির

ফলেই সে ভক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ করেছিল। ভগবানের সান্নিধ্য সে সর্ব্বদাই অনুভব করতে পারত। একদিন সে চিন্তামণির প্রতি আসক্ত ছিল ব'লে কিন্তু তার জীবনের চরিতার্থতা লাভে কোন অন্তরায় ঘটেনি। আর, চিন্তামণি বারাঙ্গনা ব'লে তার প্রতিও কিন্তু তার কোন ঘৃণার উদ্রেক হয়নি। চিন্তামণি পরে যখন বৃন্দাবনে দেখা করতে গেছে, কতখানি শ্রদ্ধার সঙ্গে সে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে! নাম শুনলেই বলে কিনা 'চিন্তামণি! আমার প্রেম-শিক্ষাদাত্রী!' বিল্বমঙ্গল moralist-এর (নীতিবাদীর) মতো চিন্তামণিকে ত্যাগ করলে কিন্তু চিন্তামণি সম্বন্ধে এই উক্তি করতে পারত না। চিন্তামণিই বলেছিল, 'তুমি আমার প্রতি যতখানি ভালবাসা উজাড় ক'রে দিয়েছ, ভগবানের জন্য যদি এইরকম দিতে পারতে, তাহ'লে তোমার জীবন সার্থক হ'তো। আমার এ হাড়মাসের খাঁচায় এতখানি ভালবাসা অর্পণ ক'রে তোমার লাভ কী হবে?' গিরিশ ঘোষের যে সুন্দর ভাব, ভাষা—তা' আমার মনে নেই, আমি আমার মতো ক'রে ভাবটা প্রকাশ করছি। যাহোক, ঐ কথায় বিল্বমঙ্গলের মন ঘুরে গেল। সে বেরিয়ে পড়ল ঈশ্বর-সন্ধানে। চিন্তামণির প্রতি তাই সে নিজের কৃতজ্ঞতার কথা ভুলতে পারেনি। আর, ঈশ্বর-প্রেমে মন তার এতই পবিত্র যে অপবিত্র ব'লে কিছু ভাবতে বা দেখতে সে ভুলে গিয়েছে। তাই, চিন্তামণিও আজ তার কাছে কত পুণ্য, কত পবিত্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর চিত্তদাকে কয়েকজনের কোষ্ঠী দেখতে বললেন।

একটি দাদা জিজ্ঞাসা করলেন—ঠাকুর! আপনি কি কোষ্ঠী মানেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর ভিতর কী মাল আছে বোঝার চেষ্টা করা ভাল। একটা শাস্ত্র এতদিন থেকে চ'লে আসছে, বাজে ব'লে উড়িয়ে দিয়ে লাভ কী? আর, এরও তো একটা scientific basis (বৈজ্ঞানিক ভিত্তি) আছে। সেইটে আয়ত্ত করতে চেষ্টা করা উচিত। না জেনে-শুনে কোন জিনিসকেই তাচ্ছিল্য করা উচিত নয়। কোন্ জায়গা থেকে কী সম্পদ্ পাওয়া যায়, তার ঠিক কী? তবে জ্যোতিষ যদি আমাদের নিশ্চেষ্ট ও অদৃষ্টবাদী ক'রে তোলে, আমি তার পক্ষপাতী নই। জ্ঞান, বিজ্ঞান, যেখানে যা'-কিছু আছে সবটাকে আমরা নেব সত্তাপোষণী ক'রে, সত্তাপোষণায় যদি ব্যাঘাত আনে, তাহ'লে মূল উদ্দেশ্যই তো ব্যাহত হ'লো। ভৃগুর কোষ্ঠীর কথা শুনিছি। যেমন মেলে, তা'তে ওকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভৃগুতে আবার গ্রহবৈগুণ্যের নানা প্রতিকার লেখা আছে। ঋষিদের সব সময় বুদ্ধি হ'লো—মানুষের সত্তাকে সবল করা, সমৃদ্ধ করা, নিরাপদ করা, সত্তাসম্বর্দ্ধনার প্রতিকূল যা' তাকে নিরোধ করা, নিয়ন্ত্রণ করা। এটা শুধু কথার কথা নয়। এটা যা'তে নেশার মতো পেয়ে বসে প্রত্যেককে, তার দিকে লক্ষ্য ছিল সমাজে। তাই, এদের বলতো অমৃতের পূজারী। আমি চিত্তকে কই, জ্যোতিষের চর্চা যদি কর, খুব ভাল ক'রে কর,

সংস্কৃত মূল বইগুলি জোগাড় ক'রে ভাল ক'রে পড়। Eastern (প্রাচ্য), western (পাশ্চাত্য) দুই মতে কোথায় কী আছে, তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজে দেখ। জিনিসগুলি যদি আমার কাছে ধর, আমার মাথায় যা' আসে আমি বলতে পারি। কৃষ্টি-কৃষ্টি কর, কৃষ্টির জাগরণ যদি চাও, তবে কোন দিকটাকেই ignore (উপেক্ষা) করলে চলবে না। সব দিক জাঁকিয়ে তোলা লাগবে সঙ্গতিশীল ক'রে। সব সময় মনে রাখবা, চারিদিক হ'তে অমর জীবন, বিন্দু-বিন্দু করি আহরণ, আপনার মাঝে আপনারে আমি পূর্ণ হেরিব কবে।'

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ শ্রীশদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—ক্রুসেড ব্যাপারটা কি, জানেন নাকি শ্রীশদা? না জানেন তো কেষ্টদার ওখান থেকে দেখে এসে কন তো!

শ্রীশদা একখানা বই দেখে এসে সংক্ষেপে বললেন—খ্রীষ্টানদের পবিত্র তীর্থস্থান জেরুজালেম ছিল মুসলমানদের অধীন। এটাকে উদ্ধার করবার জন্য পিটার দি হার্মিট নামক একটি লোক এক আন্দোলন সৃষ্টি করেন। তা'তে সাড়া দিয়ে ইউরোপের কয়েকজন খ্রীষ্টান রাজা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই সব যুদ্ধ ক্রুসেড নামে পরিচিত। ক্রুসেড মানে ধর্ম্মযুদ্ধ। মোট আটবার ক্রুসেড করা হয়েছিল। তার ফলে লক্ষ-লক্ষ লোকের প্রাণ ও অপরিমিত অর্থ নষ্ট হয়েছিল। কিন্তু সবই নিষ্ফল। জেরুজালেম শেষ পর্য্যন্ত মুসলমানদের হাতেই থেকে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর শচীনদাকে বললেন—বীরেনদাকে (ভট্টাচার্য্য) যে ওষুধটা তৈরী করতে কইছি, দেখে আয় তো সেটা হ'লো নাকি। যা, তাড়াতাড়ি যেয়ে খবর নিয়ে আয় গিয়ে। তবে, আমি তোকে পাঠাইছি, একথা বলার দরকার নেই। কথাচ্ছলে জা'নে আসবি।

শচীনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়)—আচ্ছা।

শচীনদা চ'লে যাবার পর বলছেন—মানুষকে ছোট-ছোট কাজের মধ্যে ফেলে training (শিক্ষা) দিতে হয়। আমি পাঠাইছি সে-কথা উল্লেখ না ক'রে জ্ঞাতব্য যা' তা' জেনে আসতে ওর একটু মাথা খেলান লাগবে। এইভাবে বুদ্ধির প্রয়োগ করতে-করতে বুদ্ধি বাড়ে। জ্যামিতিতে যেমন এক্সট্রা কষতে দেয়, আমিও অনেক সময় তেমনি কাজের সঙ্গে একটু এক্সট্রা জুড়ে দিই। একজন হয়তো বিশেষ কাজ নিয়ে কলকাতায় যাচ্ছে একদিনের জন্য, কালই ফিরতে হবে তাকে, তার মধ্যে ব'লে দিলাম, পারিস তো একটা ভাল পার্কার ফাউন্টেন পেন জোগাড় ক'রে নিয়ে আসিস,—best in the market (বাজারে সর্ব্বোত্তম)। যে কাজে যাচ্ছে সেই কাজ সেরে তার মধ্যে আবার টাকা জোগাড় ক'রে অল্প সময়ের মধ্যে দেখেশুনে একটা ভাল কলম আনতে তার অসুবিধা হবে জানি। আর, অসুবিধা হবে জেনেই বলি। কারণ, নানারকম অসুবিধাকে যে যত সুবিধায় সুশৃঙ্খল ক'রে বহুমুখী দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করতে

পারে, সে তত বেড়ে ওঠে। আর, ঐটেই আমার লাভ। অসুবিধার মধ্যে পড়লে বা অসুবিধার মধ্যে ফেললে, কে সেটাকে কেমনভাবে নেয়, তা'ও লক্ষ্য করি। অনেকে আছে, যত চাপের মধ্যে পড়ে, তত স্ফূর্ত্তি পায়। ওটা একটা রাজ-লক্ষণ। অনেকে প্রথমটা চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, কিন্তু করার বুদ্ধি থাকে ব'লে দায়িত্ব এড়াতে চায় না। ভেবে-চিন্তে মাথা ঠিক ক'রে নেয়। এরাও ভাল। অনেকে ঘাড় পাততে চায় না। কেবল অসুবিধার অজুহাত দেয়। তারা কিন্তু অনেক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।—সব চাইতে উপকৃত হয় তারা, যারা আমি না বলতেই আমার জন্য নানাপ্রকার দায়িত্ব নেয় মাথায়।...........কেউ সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, আলস্য ও প্রাচুর্য্যের মধ্যে দিন যদি কাটায়, আর, কেউ দুঃখের মধ্যে প'ড়ে প্রচণ্ড পরিশ্রম ও সার্থক সংগ্রামের মধ্য-দিয়ে যদি চলে, আমার মনে হয়, আখেরে লাভ হয় তার, যে নিরলসভাবে শ্রম ক'রে চলে। আরাম-আলস্যের দিকে নজর গিয়েছে কি মানুষ deteriorate করতে (অপকৃষ্ট হ'তে) সুরু করেছে। ভাগ্যবান সেই যে কঠোর শ্রমের মধ্যে আরাম খুঁজে পেয়েছে।

হরেনদা (ভদ্র) একটা বালতি নিয়ে এসেছেন। সেই বালতিটা ফুটো, জল পড়ে।

তাই, শ্রীশ্রীঠাকুর হরেনদাকে দেখে হেসে বলছেন—তোর মতো একটা তুখোড় মানুষকে দোকানদার যে ঠকায়ে দিতে পারল, এই কথা ভেবে আমার বড় লজ্জা হ'চ্ছে। তোকে নিয়ে আমার একটা অহংকার ছিল, কিন্তু তুইও যে এমন ডান-বাঁও-জ্ঞানশূন্য হ'য়ে যাবি, তা' আমি ভাবিনি।

হরেনদা—দোকানদারের উপর বিশ্বাস ক'রে আমি আর ভাল ক'রে জল দিয়ে দেখিনি। শালা, এই ফাঁকে আমাকে ঠকায়ে দিছে। যাক, বদলায়ে নিয়ে আসব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অযথা তাকে গালাগালি করছিস। তোর যে দেখে আনা উচিত ছিল, সে কথাটা ভাবিস না কেন? বিশ্বাস যদি থাকে দোকানদারের উপর, তাহ'লে এত শীঘ্র সে বিশ্বাস চটে কি ক'রে? সত্যিকার বিশ্বাস থাকলে বলতিস—দোকানদার বুঝতে পারেনি যে বালতিটা ফুটো, সেও ভাল ক'রে দেখে দেয়নি। লোকটা ভাল। বিশ্বাস থাকার অজুহাতে আলস্যের সমর্থন করিস না।

হরেনদা লজ্জিতভাবে বললেন—আমারই দেখে আনা উচিত ছিল।

প্যারীদা আসার পর প্যারীদার (নন্দী) কাছে বড়দার খবর নিলেন। পরে বললেন—দে তো দেখি!

প্যারীদা তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের পা-দুখানি সযত্নে টিপে দিলেন।

উপস্থিত সবাই মনে করছেন—প্যারীদা কত ভাগ্যবান, নিরন্তর ঐ শ্রী-অঙ্গের সেবা নিয়ে আছেন।

গ্রামের একজন মুসলমান এসে বললো—তার গরুটার খুব পেট খারাপ, চেহারা কঙ্কালসার হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই রাধারমণের কাছে যা', যেয়ে সব খুলে ক'গা, হয়তো কোন ওষুধ বাতলে দিতি পারে। ওকে সঙ্গে নিয়ে গরুটাকে দেখায়ে আনা ভাল। আর, তুই লেখাপড়া জানিস?

উক্ত ভাই—জানি একটু-একটু। বাংলা বই-টই পড়তি পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লি তোকে বরং আমি একখানা পশু-চিকিৎসার বই আনায়ে দেব। বইখানা ঘরে রাখিস, মাঝে-মাঝে পড়িস, আর তোর বা আশেপাশের কারও বাড়ীতে গরু, বাছুর, মোষ, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদির অসুখ করলে দেখে ওষুধ দিস।............এই প্যারী, আমাকে একখানা বই আনায়ে দিস তো।

প্যারীদা—আচ্ছা। (লোকটি চ'লে গেল।)

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের যে কত কী জানা লাগে, কত কী করা লাগে, কত কী ব্যবস্থা রাখা লাগে, তার কোন ইতি নেই। আমি তো দেখি, দায়িত্ব ও কাজ দিন-দিন বাড়তেই থাকে। এগুলি এড়িয়ে গেলে নিজেরই বা সুবিধা কী, অপরেরই বা সুবিধা কী? হ্যাঁ, তবে গীতার ঐ কথা স্মরণ রাখতে হবে—

"ঈশ্বরের প্রীতি আর আরাধনা তরে।/যে সকল কর্ম্ম নরে অনুষ্ঠান করে।
তাহা বিনা অন্য কর্ম্মে বন্ধন নিশ্চয়।/ঈশ্বরের তরে কর্ম্ম কর ধনঞ্জয়॥"

কাজ করতে হবে তাঁর জন্য। আর, সে-কাজের কোন লেখাজোখা নেই, আদি-অন্ত নেই। একটা পিঁপড়ের ব্যথাকেও তখন তুমি নিজের ব্যথা ব'লে বোধ করবা এবং তার প্রতিকার না করতে পারলে অস্থির হ'য়ে উঠবা। কারণ, সত্তারূপে তিনি সবার মধ্যে আছেন।

কাশীদা (দাসশর্ম্মা)—মানুষের সামর্থ্য কতটুকু?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না ক'রে ভাবতে বসলে বিরাট মনে হয়। চলার পথে সজাগ থেকে যখনকার যেটা তখনই সেটা ক'রে গেলে দেখবা অজস্র করতে পার তুমি। অনুসন্ধিৎসু সেবাবুদ্ধি ও কর্ম্মঠ অভ্যাস থাকলে না-পারা যায় কী? আবার, মানুষ তো একা নয়, সে তার পরিবেশ নিয়ে। নিজে যেটা না পারে, পরিবেশের সাহায্য নিয়ে সেটা করতে পারে। আমি ব'সে থেকে যদি পারি, তবে, তোরা তো আমার থেকে কত সবল, সচল, তোরা ঢের বেশী পারবি। প্রত্যেকের সঙ্গে এমন ব্যবহার করবি যে, সে যেন তোকে কিছুতে ভুলতে না পারে। বাইরে যাবি, মানুষ যেন তোকে পেয়ে মনে করে, 'রসগোল্লা পাইছি।'

কাশীদা—এই বোধটা তাদের মধ্যে জাগান যাবে কি ক'রে

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যত ইষ্টপ্রাণ, দরদী হবা, ততই মানুষ তোমার কাছ থেকে সত্তার খোরাক পাবে। তোমার চাউনি, চলন, হাব, ভাব, ভঙ্গী মানুষের অন্তরকে উচ্ছ্বসিত ক'রে তুলবে। তুমি যদি কথাও না বল, তোমার very presence (উপস্থিতি) magic wand (যাদুদণ্ড)-এর মতো কাজ করবে। তোমার personality (ব্যক্তিত্ব)-ই তখন ঐ রূপ নেবে। Disintegrated

personality (খণ্ডিত ব্যক্তিত্ব) হ'লে মানুষের উপর এই প্রভাব হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহজভাবে কথাগুলি বলছেন, কিন্তু একটা অকাট্য প্রত্যয় ও প্রেরণার দ্যোতনা অনুস্যূত হ'য়ে আছে তার মধ্যে, যা' শুনে মানুষ স্বতঃই নিষ্প্রশ্ন হয়ে ওঠে।

মাতৃমন্দিরের দোতলার কার্ণিশে ব'সে দুটি কপোত-কপোতী ঠোঁট ঘ'সে পরস্পরকে আদর করছে। শ্রীশ্রীঠাকুর দূর থেকে পরম স্নেহভরে সেই দৃশ্য দেখছেন। দেখতে-দেখতে বললেন—প্রকৃতিকে যতই পাঠ করা যায়, ততই দেখা যায়, একটি জিনিসই জগৎকে চালাচ্ছে, আর, সেটি হ'লো ভালবাসা। এই ভালবাসাটুকু কেড়ে নাও প্রত্যেকের অন্তর থেকে, তাহ'লে দেখবে, সব বাওরা হ'য়ে যাবে, বেহেড হ'য়ে যাবে।

ফণীদা (মুখোপাধ্যায়)—ভালবাসার থেকে দ্বেষ-হিংসাই তো দুনিয়ায় বেশী দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবাসার বিকাশ যেখানে ব্যাহত হয়, সেখানেই ওগুলি দেখা দেয়। ধর, তুমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জ্জন কর, নিজে সাদামাঠা ভাবে থাক, আর, তোমার ছেলে যদি তোমার উপর দাঁড়িয়ে বেশ স্বচ্ছন্দে চলে, তাহ'লে কি তোমার ঐ ছেলের উপর হিংসা বা ঈর্ষ্যা হয়? বরং মনে হয়, পারলে আরো ভাল রাখতাম ওকে। ওকে ভালবাস ব'লে ওর জন্য তোমার কষ্টটাও কষ্ট ব'লে মনে হয় না। কিন্তু যখন দেখ, তোমার মনিব মটরগাড়ী চ'ড়ে বেড়াচ্ছে, হয়তো তোমার একখানা সাইকেলও জুটছে না, তখন কিন্তু তুমি ক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠ। ভাব, আমরা এত খাটি, কিন্তু আমাদের উপযুক্তভাবে দেওয়া হয় না। আর, উনি বেশ দিব্যি আরামে গাড়ী চ'ড়ে বেড়ান। মনিবের উপর তেমন ভালবাসা থাকলে, নিজের দুঃখ যাই থাক, তার সুখে সুখীই হ'তে—যেমন হও ছেলের সুখে। নিজের দুঃখদুর্দ্দশা সত্ত্বেও যারা অপরের সুখে সুখী হয়, ঈর্ষ্যা যাদের চরিত্রের আনাচে-কানাচেও নেই, বুঝতে হবে তারা মহৎ মানুষ। তাদের দুঃখ যে নিরসনের পথে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঈর্ষ্যা থাকা ভাল নয় বটে, তবে অসৎ-নিরোধী পরাক্রম না থাকলে কিন্তু সর্ব্বনাশ।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে উঠে বাড়ীর ভিতর শ্রীশ্রীবড়মার কাছে গেলেন। উঠবার সময় সকলের দিকে চেয়ে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'আমি এইবার উঠি!' তাঁর অনুমতি চাওয়ার ভঙ্গী দেখে সকলেরই অন্তর অভিভূত হ'য়ে উঠলো। থতমত খেয়ে অনেকে একযোগে ব'লে উঠলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ! আজ্ঞে হ্যাঁ!" অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় শ্রীশ্রীঠাকুর হেঁটে চলেছেন, আজানুলম্বিত বাহুদুটি তাঁর ঈষৎ দোল খাচ্ছে, একটা আনন্দের ছন্দ আন্দোলিত হ'য়ে উঠছে তাঁর প্রতি পদক্ষেপে। পেছন থেকে সবাই সেই গতিপথ লক্ষ্য ক'রে মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। একজন একটা ছাতা নিয়ে এগিয়ে গেলেন সঙ্গে।

ফলেই সে ভক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ করেছিল। ভগবানের সান্নিধ্য সে সর্ব্বদাই অনুভব করতে পারত। একদিন সে চিন্তামণির প্রতি আসক্ত ছিল ব'লে কিন্তু তার জীবনের চরিতার্থতা লাভে কোন অন্তরায় ঘটেনি। আর, চিন্তামণি বারাঙ্গনা ব'লে তার প্রতিও কিন্তু তার কোন ঘৃণার উদ্রেক হয়নি। চিন্তামণি পরে যখন বৃন্দাবনে দেখা করতে গেছে, কতখানি শ্রদ্ধার সঙ্গে সে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে! নাম শুনলেই বলে কিনা 'চিন্তামণি! আমার প্রেম-শিক্ষাদাত্রী!' বিল্বমঙ্গল moralist-এর (নীতিবাদীর) মতো চিন্তামণিকে ত্যাগ করলে কিন্তু চিন্তামণি সম্বন্ধে এই উক্তি করতে পারত না। চিন্তামণিই বলেছিল, 'তুমি আমার প্রতি যতখানি ভালবাসা উজাড় ক'রে দিয়েছ, ভগবানের জন্য যদি এইরকম দিতে পারতে, তাহ'লে তোমার জীবন সার্থক হ'তো। আমার এ হাড়মাসের খাঁচায় এতখানি ভালবাসা অর্পণ ক'রে তোমার লাভ কী হবে?' গিরিশ ঘোষের যে সুন্দর ভাব, ভাষা—তা' আমার মনে নেই, আমি আমার মতো ক'রে ভাবটা প্রকাশ করছি। যাহোক, ঐ কথায় বিল্বমঙ্গলের মন ঘুরে গেল। সে বেরিয়ে পড়ল ঈশ্বর-সন্ধানে। চিন্তামণির প্রতি তাই সে নিজের কৃতজ্ঞতার কথা ভুলতে পারেনি। আর, ঈশ্বর-প্রেমে মন তার এতই পবিত্র যে অপবিত্র ব'লে কিছু ভাবতে বা দেখতে সে ভুলে গিয়েছে। তাই, চিন্তামণিও আজ তার কাছে কত পুণ্য, কত পবিত্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর চিত্তদাকে কয়েকজনের কোষ্ঠী দেখতে বললেন।

একটি দাদা জিজ্ঞাসা করলেন—ঠাকুর! আপনি কি কোষ্ঠী মানেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর ভিতর কী মাল আছে বোঝার চেষ্টা করা ভাল। একটা শাস্ত্র এতদিন থেকে চ'লে আসছে, বাজে ব'লে উড়িয়ে দিয়ে লাভ কী? আর, এরও তো একটা scientific basis (বৈজ্ঞানিক ভিত্তি) আছে। সেইটে আয়ত্ত করতে চেষ্টা করা উচিত। না জেনে-শুনে কোন জিনিসকেই তাচ্ছিল্য করা উচিত নয়। কোন্ জায়গা থেকে কী সম্পদ্ পাওয়া যায়, তার ঠিক কী? তবে জ্যোতিষ যদি আমাদের নিশ্চেষ্ট ও অদৃষ্টবাদী ক'রে তোলে, আমি তার পক্ষপাতী নই। জ্ঞান, বিজ্ঞান, যেখানে যা'-কিছু আছে সবটাকে আমরা নেব সত্তাপোষণী ক'রে, সত্তাপোষণায় যদি ব্যাঘাত আনে, তাহ'লে মূল উদ্দেশ্যই তো ব্যাহত হ'লো। ভৃগুর কোষ্ঠীর কথা শুনিছি। যেমন মেলে, তা'তে ওকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভৃগুতে আবার গ্রহবৈগুণ্যের নানা প্রতিকার লেখা আছে। ঋষিদের সব সময় বুদ্ধি হ'লো—মানুষের সত্তাকে সবল করা, সমৃদ্ধ করা, নিরাপদ করা, সত্তাসম্বর্দ্ধনার প্রতিকূল যা' তাকে নিরোধ করা, নিয়ন্ত্রণ করা। এটা শুধু কথার কথা নয়। এটা যা'তে নেশার মতো পেয়ে বসে প্রত্যেককে, তার দিকে লক্ষ্য ছিল সমাজে। তাই, এদের বলতো অমৃতের পূজারী। আমি চিত্তকে কই, জ্যোতিষের চর্চ্চা যদি কর, খুব ভাল ক'রে কর,

ঠিক পাচ্ছে না, সমস্যার সমাধান কোথায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাইতো আপনাকে কই, আপনি সবটা ধরিয়ে দিয়ে একখানা বই লেখেন। যে বই হবে অকাট্য। মানুষ যে angle (দৃষ্টিকোণ) থেকেই দেখুক না কেন, নির্ঘাত আপনাদের সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হবে। আর, আমি কোন্ কথা কোন্ ভাবে ব্যবহার করেছি সেটা ধরিয়ে দিয়ে একটা glossary (নির্ঘণ্ট) লিখে ফেলেন। তাহ'লে আমার 'পরে cruel twisting-এর (নিষ্ঠুর মোচড়-কাটার) উপায় থাকে না, আর আমিও প্রাণপণ সবটা ঠিক ক'রে দিয়ে যেতে পারি। আমি থাকতে-থাকতে না করলে, পরে হয়তো বলবে, কেষ্টদা লিখেছে।

আর একটা কাজ আপনারা করবেন। কর্ম্মীদের এমনভাবে training (শিক্ষা) দেবেন, যা'তে তারা প্রত্যেককে প্রত্যেক রকম ব্যাপারে বাস্তবভাবে সেবা-সাহায্য করতে পারে। কৃষক, শিল্পী, শিক্ষক, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, ইঞ্জিনিয়ার, সাহিত্যিক, রাজা, প্রজা, জমিদার, অভিভাবক, ছাত্র, মুটে, মজুর, গৃহিণী, কুমারী—যে যাই হোক, প্রত্যেককেই যেন তারা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে progressive (উন্নতিমুখর) ও profitable (লাভের অধিকারী) ক'রে তুলতে পারে। নিয়ত ওদের নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবেন এবং কার্য্যকরী অভিজ্ঞতা যা'তে জন্মে তেমনতর কাজের মধ্যে ফেলবেন। প্রত্যেকটা ঋত্বিকের experience (অভিজ্ঞতা) ও personality (ব্যক্তিত্ব) এমনতর হওয়া চাই যে, তারা যেখানেই যাক, সেখানেই যেন নানাবিধ সমস্যাওয়ালা লোকের ভিড় জ'মে যায়, এবং প্রত্যেকেই যেন বাস্তব সমাধান পেয়ে তৃপ্ত হ'তে পারে। ঋত্বিকের কাজ হ'লো বামনাই কাজ, ব্রাহ্মণ হ'লো লোকশিক্ষক। আপনার ঋত্বিক্‌রা যদি চৌকষ লোকশিক্ষক হ'য়ে না ওঠে, শুধু কানে মন্ত্র দিয়ে দক্ষিণা কুড়োয়ে বেড়ালে লাভ কারও কিছু হবে না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আকাশের দিকে চেয়ে তারা দেখছেন। মা'ঝে-মাঝে কেষ্টদার কাছে জিজ্ঞাসা করছেন, 'এটা কী? ওটা কী?' কেষ্টদা তার জবাব দিচ্ছেন।

ওদিকে অতিথিশালায় সৎসঙ্গ হ'চ্ছে। শৈলেনদা গাইছেন—'সুন্দর অপরূপ প্রিয়তম'............। তাঁর পিছনে অন্য সকলেও ঐ পদ গেয়ে চলেছেন। একটা বিপুল আনন্দের উচ্ছ্বাস সমবেত কলকণ্ঠ ভেসে আসছে। শ্রীশ্রীঠাকুর একবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে গায়?'

শরৎদা বললেন—শৈলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—আপনাদের এখানে উৎসব লা'গেই আছে।

কেষ্টদা বললেন—হ্যাঁ।